বাংলা শব্দের পৌরাণিক উৎস
[ব্যবহারিক পৌরাণিক অভিধান]

ড. মোহাম্মদ আমীন

উৎসর্গ

ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী
বন্ধুবরেষু

লেখকের কথা

রামায়ণ-মহাভারতসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে ব্যবহৃত যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় বর্তমানে বহুল-প্রচলিত এবং পৌরাণিক যে ঘটনাবলি থেকে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বাগভঙ্গি বা বাগধারা প্রচলন হয়েছে সেগুলোর উৎস-বিবরণ গ্রন্থটির মূল-প্রতিপাদ্য। শুধু ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনি থেকে নয়, পৃথিবীর নানা জাতি ও ভাষার পৌরাণিক কাহিনি থেকেও অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় বর্তমানে প্রচলিত আছে। সেসব শব্দের উৎসের বর্ণনাও এ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে।

শব্দগুলো সংগ্রহে নানা গ্রন্থের সাহায্য ছাড়াও শুবাচ (শুদ্ধ বানানচর্চা) গ্রুপের সদস্যবর্গের দেওয়া বিভিন্ন পোস্ট অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে। গ্রামবাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন লোককাহিনি থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যাঁদের পুস্তক এবং পোস্ট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাঁদের প্রতি রইল গভীর কৃতজ্ঞতা।

শুধু শব্দের ব্যুৎপত্তি নয়, শব্দের কাহিনি-উৎস জানার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার বিবর্তনের একটি ধারণাও গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

বিনয়াবনত

ড. মোহাম্মদ আমীন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
• অ থেকে অহিনকুল

দ্বিতীয় অধ্যায়
• আঁতাত থেকে অ্যালবাম

তৃতীয় অধ্যায়
• ইঁদুর দৌড় থেকে ঈশ্বর

চতুর্থ অধ্যায়
• উচ্চাভিলাষ থেকে ঋষি

পঞ্চম অধ্যায়
• একচ্ছত্র থেকে ঔষধি

ষষ্ঠ অধ্যায়
• কংস মামার আদর থেকে ক্ষণ

সপ্তম অধ্যায়
• খই ফোটা থেকে খোশামোদ

অষ্টম অধ্যায়
• গঙ্গার অনার্য নাম গাঙ থেকে গ্রহের দৃষ্টি

নবম অধ্যায়
• ঘটি-বাঙাল থেকে ঘোল খাওয়া

দশম অধ্যায়
• চক্ষুলজ্জা থেকে চোল

একাদশ অধ্যায়
• ছত্রভঙ্গ থেকে ছেঁদো

দ্বাদশ অধ্যায়
• জগন্নাথ থেকে ঝটিকা-সফর

ত্রয়োদশ অধ্যায়
• টানাপড়েন থেকে ঢেলে সাজা

চতুর্দশ অধ্যায়
• তখত তাউস থেকে থ হয়ে গেলাম

পঞ্চদশ অধ্যায়
• দক্ষ থেকে দ্বিগু

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

• ধনঞ্জয় থেকে ধুরন্ধর

সপ্তদশ অধ্যায়

• নখদর্পণ থেকে ন্যাকা

অষ্টাদশ অধ্যায়

• পঞ্চকন্যা থেকে প্লুতো

ঊনবিংশ অধ্যায়

• ফতুর থেকে ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব

বিংশ অধ্যায়

• বকধার্মিক থেকে ব্রহ্মর্ষি

একবিংশ অধ্যায়

• ভণিতা থেকে ভূপাতিত

দ্বাবিংশ অধ্যায়

• মগের মুল্লুক থেকে ম্যাগাজিন

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

• যজুর্বেদ থেকে যোজন

চতুর্বিংশ অধ্যায়

• রবিশস্য থেকে রৌরব

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

• লক্ষ্মী থেকে ল্যাংবোট

ষড়বিংশ অধ্যায়

• শনি থেকে ষোলোকলা

সপ্তবিংশ অধ্যায়

• সই থেকে স্বর্ণযুগ

অষ্টবিংশ অধ্যায়

• হঠকারিতা থেকে হ্যাংলা

সহায়ক গ্রন্থ

প্রথম অধ্যায়

অ

অ

'অ' বর্ণের কয়েকটি অর্থ আছে। অ অর্থ অস্তিত্বের আধার, অস্তিত্বকে যে ধরে রাখে, বহন করে বা রক্ষা করে। আবার 'অ' বর্ণ দিয়ে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, বায়, বৈশ্বানর প্রভৃতিও বোঝায়। এটি নঞ-অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন—ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ; এরূপ অলোভ, অহিংসা, অসৎ, অনিচ্ছা ইত্যাদি প্রকাশেও বর্ণটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। স্বীকৃতি বোঝাতেও এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—আমি কিন্তু সব কাজ শেষ করে এসেছি। বাবু বললেন অ তাই বুঝি! মঅ-কে বহন করে তাকে বলে অব। প্রকৃতপক্ষে 'অ' হচ্ছে আধারের একক। এখান থেকে গণনার শুরু।

অকবজ

'অকবজ' শব্দটি বাংলা ভাষায় অনায়ত্ত ও অনধিকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল শব্দ ছিল 'কবজ'। শব্দটির শুরুতে যুক্ত হয়েছে বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ 'অ'। এ হরফটি 'না-বোধক' অর্থ প্রকাশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—অনিয়ম, অশুভ ইত্যাদি। যথাক্রমে নিয়ম ও শুভ শব্দদ্বয়ের পূর্বে 'অ' যুক্ত হয়ে শব্দটিকে হ্যাঁ-বোধক থেকে না-বোধকে রূপান্তরিত করেছে। ঠিক তেমনি 'কবজ' শব্দের অর্থ আয়ত্ত করা, গ্রহণ করা, অধিকারভুক্ত করা। শব্দটির শুরুতে 'অ' যুক্ত হওয়ার পর সংগতকারণে এটি না-বোধক শব্দে পরিণত হয়েছে।

অকালকুষ্মাণ্ড

অকালকুষ্মাণ্ড শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'অকালজাত কুষ্মাণ্ড বা অকালজাত কুমড়া'। বিশেষ্য মনে হলেও, শব্দটি বিশেষ ধরনের বিশেষণ। বাংলায় এমন বিশেষণের সংখ্যা কম নয়। এবার শব্দটির ব্যুৎপত্তি জেনে নেওয়া যাক। পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী ও ধর্মের মিলনে যুধিষ্ঠির, বায়ুর সঙ্গে মিলনে ভীম, ইন্দ্রের সঙ্গে মিলনে অর্জুন এবং পাণ্ডুর দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্ম নিলে পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গর্ভবতী গান্ধারী প্রচণ্ড ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। গর্ভধারণের দুই বছর পার হলেও গান্ধারীর কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছিল না। এ অবস্থায় তিনি রাগে ও ক্ষোভে নিজেই নিজের গর্ভপাত ঘটিয়ে ফেলেন। গর্ভপাতের ফলে কুমড়া বা কুষ্মাণ্ড আকৃতির একটি মাংসপিণ্ড অকালে নির্গত হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, গান্ধারী অকালে একটা কুষ্মাণ্ড প্রসব করেছেন। এ অকালকুষ্মাণ্ড থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য দায়ী দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখসহ কুলবিনাশী শতপুত্রের জন্ম হয়। বস্তুত মহাভারতের এ কাহিনির অনুষঙ্গে বাংলা শব্দসম্ভারে অকালকুষ্মাণ্ড শব্দের প্রবেশ। যার অর্থ—কাণ্ডজ্ঞানহীন, অপদার্থ, অদক্ষ, অনিষ্টকারী বা মূর্খ। মহাভারতের অকালকুষ্মাণ্ডের ন্যায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অকালকুষ্মাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড তেমন মারাত্মক না-হলেও কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য কোনো আধুনিক অকালকুষ্মাণ্ড যেকোনো সময় নিজের বা অন্যের বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে।

অকালবোধন

'অকালবোধন' শব্দের আভিধানিক অর্থ—অসময়ে কাজ আরম্ভ করা। সংস্কৃত 'অকাল' ও সংস্কৃত 'বোধন' শব্দের মিলনে অকালবোধন শব্দের উৎপত্তি। অকাল শব্দের অর্থ অসময়ে, নির্ধারিত সময়ের বাইরে এবং বোধন শব্দের অর্থ জাগানো। শব্দটির রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অ-কাল {√কল (গণনা করা) + অ (ঘঞ), করণবাচ্য} + বোধন {√বুধ (জানা) + অন, ভাববাচ্য}। অকালে বোধন = অকালবোধন। এটি সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে অসময়ে আরাধ্য দেবতার নিদ্রাভঙ্গ বা আহ্বান করা বা অসময়ে জাগরণ। হিন্দু পৌরাণিক

কাহিনি মতে—রাবণকে বধ করার উপযুক্ত শক্তি লাভের জন্য রামচন্দ্র অকালে তথা শরৎকালের আশ্বিন মাসে দেবী দুর্গার বোধন বা নিদ্রাভঙ্গ করেছিলেন। এই নিদ্রাভঙ্গ থেকে 'অকালবোধন' বাগধারাটির উৎপত্তি। এ নিদ্রাভঙ্গের কারণে বাংলাদেশে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, দুর্গাপূজার আদি সময় হিসাবে বসন্তকাল নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অকালবোধনের কারণে বাংলাদেশসহ অনেক স্থানে এটি শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয়।

অকুণ্ঠ

'অকুণ্ঠ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—অকাতর, অসঙ্কুচিত, অব্যাহত, অপ্রতিহত, নিঃশঙ্ক প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত এ শব্দটি বাংলায় অনেক পরিবর্তন ও অর্থসম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় অকুণ্ঠ শব্দের অর্থ তীক্ষ্ণ বা ধারালো। অর্থাৎ যা ভোঁতা নয়, যাতে মরিচা পড়েনি; যা সহজে অন্যকে কর্তন করতে পারে, খণ্ডিত করতে পারে—তা-ই অকুণ্ঠ। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় অকুণ্ঠ শব্দের অর্থ—অকাতর, অসঙ্কুচিত, অব্যাহত, অপ্রতিহত, নিঃশঙ্ক প্রভৃতি। এমন অর্থ পরিবর্তনের কারণ কী? যা ধারালো ও তীক্ষ্ণ তা অকাতরে বা নির্ভীকচিত্তে অন্যকে কর্তন করতে পারে। সংস্কৃত অকুণ্ঠ শব্দের এ যোগ্যতাকে বাংলা বিচক্ষণতার সঙ্গে 'অকুণ্ঠ' অর্থে ধারণ করে নিয়েছে। সংস্কৃত 'অকুণ্ঠ' বসে যন্ত্রপাতির আগে কিন্তু বাংলা 'অকুণ্ঠ' বসে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, সোহাগ, আদর, ভালোবাসা, সমর্থন প্রভৃতি শব্দের আগে। এসব শব্দের আগে ভোঁতা বা মরচে-পড়া কোনো বিশেষণ উপযুক্ত নয়। প্রেম-ভালোবাসা ও আদর-সোহাগ তীক্ষ্ণ না-হলে কি চলে! 'নাপিত অকুণ্ঠ ক্ষুর দিয়ে পরম আদরে শিশুটির চুল ছেঁটে দিল'—এমন কথা বাংলায় কেউ বলে না। সংস্কৃত ভাষায় বলে। বাঙালিরা বলতে পারেন, 'বিরোধী দল অকুণ্ঠচিত্তে সরকারি দলকে সমর্থন দিল।' সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য এ বাক্যটি কেউ বলবে না। কারণ সংস্কৃত 'অকুণ্ঠ' আর বাংলা 'অকুণ্ঠ' প্রায়োগিক দিক থেকে ভিন্ন। তবে এ পরিবর্তনের কারণ আছে। বাঙালিদের ভালোবাসা-দাতাদের হুজুগে চরিত্রের মতোই বিস্ময়কর। প্রকাণ্ড ভালোবাসার প্রবল টান দুদিন পরই ক্ষুরের মতো তীব্র ব্যথায় কাটতে থাকে।

অক্ষয়বট

'অক্ষয়বট' শব্দের আভিধানিক অর্থ অক্ষয় পরমায়ু, প্রাচীন ব্যক্তি, অতি-বয়স্ক জ্ঞানী ব্যক্তি প্রভৃতি। ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত অক্ষয়বট হতে শব্দটির উৎপত্তি। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিম পাড়ে এবং ভৈরব মন্দিরের পাশে একটি বিশাল বটবৃক্ষ রয়েছে। এটি ভক্তদের কাছে অক্ষয়বট নামে পরিচিত। ভারতীয় পুরাণ মতে, গয় ছিলেন একজন ধার্মিক রাজা। তাঁর পিতার নাম ছিল অমূর্তরয়। তিনি যজ্ঞ-আহুতির অবশিষ্টাংশ আহার করে শতবর্ষ উপাসনা করেন। এতে ভারতবর্ষের তিন জন দেবতার মধ্যে অগ্রগণ্য অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর প্রার্থনামতে তাঁকে বেদ অধ্যয়ন করার অধিকার দেন। অগ্নির বরে ইনি পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। এরপর তিনি বিশাল এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। এই যজ্ঞকালে একটি বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়। এই চিরজীবী বটবৃক্ষটি অক্ষয়বট নামে পরিচিত। মূলত এ কাহিনি থেকে বাংলা শব্দ 'অক্ষয়বট'-এর উৎপত্তি। বাংলায় এখন 'অক্ষয়বট' বলতে কোনো বটবৃক্ষ বোঝায় না। দীর্ঘজীবী, প্রাচীন ব্যক্তি প্রভৃতি বোঝায়।

অক্ষৌহিণী (অক্ষ + উহিনী)

পুরাণ মতে পদাতিক, অশ্ব, হস্তী ও রথ মিলিয়ে ২১৮৭০০ সৈন্যে এক অক্ষৌহিণী। ১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ এই সংখ্যক চতুরঙ্গ সেনাদলকে ১ অক্ষৌহিণী বলে।

অগস্ত্য যাত্রা

শব্দটির অর্থ—চিরকালের জন্য প্রস্থান, জন্মের মতো বিদায়। মহাভারতের অন্যতম চরিত্র অগস্ত্য মুনি, তার শিষ্য বিন্ধ্য পর্বত ও সূর্যদেব 'অগস্ত্য যাত্রা' বাগভঙ্গিটির উৎস-কাহিনির সঙ্গে জড়িত। সূর্যদেব তাঁর যাত্রাপথে উদয়াস্তকালে নিত্য সুমেরু পর্বত প্রদক্ষিণ করেন। একদিন বিন্ধ্য পর্বতের বাসনা হলো, সূর্যদেব তাঁকেও ওইভাবে প্রদক্ষিণ করুক। সূর্য তা মানলেন না। সূর্যের আচরণে বিন্ধ্য পর্বত প্রচণ্ড রেগে যান। তিনি স্বীয় দেহ বর্ধিত করে সূর্যের গতিপথ আটকে দেন। বিপর্যয়ে পড়ে যায় পৃথিবী। দেবতা, মানুষ, গাছপালা সবাই সঙ্কটে নিপতিত হয়। বিন্ধ্যের এ সর্বনাশা কাণ্ডে সন্ত্রস্ত দেবতারা বিন্ধ্যগুরু অগস্ত্য মুনির শরণাপন্ন হন। অগস্ত্য মুনি ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হন। বিন্ধ্য গুরুকে প্রণাম করার জন্য ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে রাখেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যকে বললেন "আমি যাচ্ছি, যতক্ষণ ফিরে না-আসি ততক্ষণ তুমি যে অবস্থায় আছ, সে অবস্থায় থাকবে।" শিষ্যকে নির্দেশ দিয়ে অগস্ত্য মুনি দক্ষিণাপথের দিকে যাত্রা করলেন। অগস্ত্য গেলেন তো গেলেন আর ফিরলেন না। সূর্যের গতিপথ মুক্ত হলো। মহাভারতের অগস্ত্য মুনির এ যাত্রা হতে 'অগস্ত্য যাত্রা' বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি।

অগ্নিকোণ

পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ। ওই কোণের দিকপাল অগ্নি, তাই এ দিকের নাম অগ্নিকোণ। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের তিন জন অগ্রগণ্য দেবের মধ্যে অগ্নি ছিলেন অন্যতম। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নি সম্পর্কে যতগুলো সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনো দেব সম্পর্কে তত সূক্ত নেই। অগ্নির ত্রিমূর্তি। যথা আকাশে সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি।

অগ্নিপরীক্ষা

'অগ্নিপরীক্ষা' শব্দের আভিধানিক অর্থ অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা, ভয়াবহ সমস্যা প্রভৃতি। তবে অগ্নিপরীক্ষা বাগভঙ্গির মূল অর্থ হলো আগুনে পুড়িয়ে বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। অনেক ধাতু আছে যা আগুনে পুড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয়, সেটি আসল নাকি নকল। বস্তুত এ পরীক্ষাই হলো অগ্নিপরীক্ষা। অনেক প্রাচীনকাল থেকে এটি প্রচলিত ছিল। তবে বাংলা ভাষায় 'অগ্নিপরীক্ষা' কথাটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্যবান কোনো ধাতুকে আগুনে দিয়ে যাচাই করার জন্য শব্দটির ব্যবহার বাংলায় নেই। মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত বিপদ-আপদ বা ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে মুক্ত হওয়ার কঠিন পরীক্ষা বোঝাতে অগ্নিপরীক্ষা শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ভারতে কোনো নারীর সতীত্ব বা পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হলে তাকে আগুনে পোড়ানো হতো। তাদের বিশ্বাস ছিল—স্ত্রীলোকটি পবিত্র হলে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। বস্তুত এটি ছিল সম্পূর্ণ কুসংস্কার, তবে কুসংস্কার হলেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এর প্রচলন ছিল। রামায়ণ মহাকাব্যে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতার অগ্নিপরীক্ষা এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে অপহরণ করে রাবণপুরীতে নিয়ে যায়। দীর্ঘদিন রাবণপুরীতে অবস্থান করতে বাধ্য হওয়ায় সীতার চরিত্র সম্পর্কে রামচন্দ্র ও প্রজাগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সীতা অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন। অগ্নি তাকে যথামর্যাদায় অক্ষতভাবে ফিরিয়ে দেয়।

অগ্নিপুরাণ

প্রথমে অগ্নিদেবতাগণের মুখ হতে নির্গত বলে এর নাম অগ্নিপুরাণ। মহামুনি বশিষ্ঠকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য অগ্নিদেবের মুখনিঃসৃত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অষ্টম পুরাণ 'অগ্নিপুরাণ' নামে পরিচিত। এ গ্রন্থে ১৫,৪০০টি শ্লোক রয়েছে।

অগ্ন্যুৎপাত

‘অগ্ন্যুৎপাত’ (অগ্নি + উৎপাত) শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত লাভা বা জ্বলন্ত পদার্থের ভূমিতে পতন। অর্থ দেখে বোঝা যায়, কেবল আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হয়। তবে এর মূল অর্থ শুধু এটাতে সীমাবদ্ধ ছিল না। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো আগুনের উৎপাত। যেখানে আগুনের উৎপাত সেখানে অগ্ন্যুৎপাত। একসময় অগ্ন্যুৎপাত বলতে বোঝাত আকাশের অগ্নি থেকে সৃষ্ট উৎপাত। এ অর্থে বজ্রপাত, বিজলি-চমক, উল্কা, ধূমকেতু প্রভৃতি অগ্ন্যুৎপাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এখন অগ্ন্যুৎপাত বলতে এর কোনোটাই বোঝায় না। শব্দটির মূল অর্থ ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়ে গিয়েছে।

অগ্রসর

অগ্রসর = অনগ ও সরণ—অর্থাৎ যার পরে আর গমন নেই। মূলত অগ (রহে যাতে) অর্থ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যে আগে আগে সরে বা যে আগে আগে যায় সেটিই অগ্রসর। এগোনো অর্থে শব্দটি বহুল প্রচলিত। ইংরেজি ‘aggressor’ শব্দটি ‘অগ্রসর’ শব্দের সহোদর বলে মনে হয়। পার্থক্য কেবল এই যে, ‘অগ্রসর’-এর দর্শক থাকে ‘অগ্রসর’-এর পেছনে; অন্যদিকে ‘aggressor’-এর দর্শক থাকে ‘aggressor’-এর সামনে। ‘আগ্রাসন’ ও ‘aggression’ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

অঙ্ক

√অঙ্ক্ + অ (অচ)— ণ; অঙ্ক + অ (অচ)—ক। এর অর্থ অস্তিত্বের রহস্যরূপ কৃত যাতে, যার দ্বারা (কোনো সত্তাকে) অন করে রাখা হয়, লক্ষণ, চিহ্ন, দাগ, কলঙ্ক, রেখা, আঁক, মান, আঁকড়া, বক্রভাব, বাঁক ও mathematics প্রভৃতি অর্থে অঙ্ক শব্দ ব্যবহৃত হয়। ‘কোনো সত্তাকে বা অস্তিত্বকে অন করে রাখে’ বলে চিহ্ন, দাগ, রেখা, নাটকের অঙ্ক, আঁক এবং ছোটদের যে কোলে রাখা হয়—এসব কিছুকে অঙ্ক বলা হয়। নাটকের এক একটি অধ্যায় নাটকের বিষয়-কে কোলে রাখার মতো অন করে রাখে বলে তাদের নাটকের অঙ্ক বলা হয়। অঙ্কন বা অঙ্কিত শব্দ থেকে অঙ্ক (mathematics) শব্দের উৎপত্তি। অঙ্কিত বলতে এমন কিছু বোঝায়, যা অঙ্কন করা হয়েছে বা আঁকা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ‘অঙ্ক-অন’ করা মানে দাগ দিয়ে চলা; আর তাতে হিসাব বা গণনাও হয়ে যায়। তাই অঙ্কন থেকে অঙ্ক। নিরক্ষর মানুষরা একসময় এক এক ক্ষেপ মাল এনে ফেলতেন, আর দেয়ালে দাগ দিতেন। এতে তাঁদের কাজের অঙ্ক কষাও হয়ে যেত। সেকালে এভাবে আঁকার মাধ্যমে গণনার উদ্ভব হয়েছিল বলে mathematics-কে অঙ্ক বলা হয়।

অঙ্গ

শব্দের আভিধানিক অর্থ—শরীর। যা কোনো কিছুর সঙ্গে যুক্ত তা-ই অঙ্গ। ভারতীয় পুরাণের বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র ‘অঙ্গ’। তাঁর অধিকৃত রাজ্যসমূহ অঙ্গদেশ বা অঙ্গজ নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ অঙ্গ-এর সঙ্গে যা যুক্ত ছিল সেটিই অঙ্গজ।

অজাতশত্রু

বাংলা ভাষায় ‘অজাতশত্রু’ শব্দের আভিধানিক অর্থ যার কোনো শত্রু জন্মায়নি। ভারতীয় পুরাণ থেকে শব্দটির উৎপত্তি। উপনিষদে ‘অজাতশত্রু’ নামের এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল বারানসি। মহর্ষিগণ তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিতে আসেন, কিন্তু রাজার ব্রহ্মজ্ঞান দেখে মহর্ষিগণই শেষ পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়েন। ব্রহ্মজ্ঞানে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ঋদ্ধ। তাঁর কোনো শত্রু ছিল না। তাই বাংলায় শত্রুহীন কোনো লোক বোঝাতে বলা হয় অজাতশত্রু।

অঞ্চল

অঞ্চ + অল। অস্তিত্বের চ-অন (আঁচ) যে পর্যন্ত গিয়ে নিজ পরিধিতে লয় প্রাপ্ত হয়। অথবা যা প্রান্ত-প্রাপ্ত হয়। আঁচল, দেশ, প্রদেশ, ভূভাগ, বস্ত্রান্ত, এলাকা প্রভৃতি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রেখা বা অস্তিত্ব যে পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে সে পর্যন্ত তার বৃত্তের শেষ সীমা। একজন স্ত্রীলোকের অস্তিত্বের শেষ সীমা হলো তার আঁচল, যেখানে ধরতে পারলে তার 'অঞ্চল' বা বস্ত্রান্তে টান পড়ে। একজন রাজা বা ভূস্বামীর অস্তিত্বেও শেষ সীমা হলো তার রাজ্যের প্রান্তসীমা। সেখানে হাত দিলে রাজার অঞ্চলে হাত পড়ে, তার অস্তিত্ব ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ অঞ্চল বলতে বোঝায় বাংলাদেশিদের স্বাধীন অস্তিত্ব যে পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রে একটি সক্রিয় অস্তিত্ব রয়েছে, তার সক্রিয়তার এলাকা যে পর্যন্ত বিস্তৃত সে পর্যন্ত তার অঞ্চল। গ্রামাঞ্চল, বনাঞ্চল, শহরাঞ্চল, অঞ্চলপ্রধান, নগরাঞ্চল প্রভৃতি শব্দগুলো মূলত 'অঞ্চল' শব্দেরই শুদ্ধ-অশুদ্ধ প্রয়োগ।

অঞ্জলি

শব্দটির আভিধানিক অর্থ করপুট, যুক্তকর, হাতজোড় করে নৈবেদ্য প্রদান প্রভৃতি। একসময় গ্লাস বা পাত্রাদির এত প্রচলন ছিল না। নদী বা পুকুরের পানি বিশুদ্ধ ছিল। তখন অধিকাংশ মানুষ নদী বা পুকুর হতে বা বালতির পানি দুই হাত জড়ো করে তুলে পান করতেন। এভাবে পানি পান করার সময় দুই হাতের পাঞ্জা সামান্য বেঁকে গিয়ে একটা বিশেষ আধারের আকৃতি ধারণ করে। মূলত এ আকৃতিটাই হচ্ছে অঞ্জলি। অঞ্জলি সাধু ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ। এর চলিত রূপ হচ্ছে 'আঁজলা'। অঞ্জলির ব্যবহার শুধু হাত জড়ো করে জলপানে নয়। এটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রূপকার্থে বহুল ব্যবহৃত একটি মাধুর্যময় শব্দ। যেমন—শ্রদ্ধাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, বর্ণাঞ্জলি প্রভৃতি। অঞ্জলি শব্দটি মূলত প্রায়োগিক ভাবনার চেয়েও আলঙ্করিক অর্থে অধিক ব্যবহৃত হয়।

অতিকায়

শব্দটির আভিধানিক অর্থ—বিশাল, প্রচণ্ড, বিকট প্রভৃতি। ভারতীয় পুরাণ হতে বাংলায় 'অতিকায়' শব্দটির আগমন ঘটে। রাবণের পুত্রগণের মধ্যে একজন ছিলেন পর্বতের মতো বিশাল আকারের। বিশাল দেহ ছিল বলে তাঁকে 'অতিকায়' নামে অভিহিত করা হয়।

অতিথি

যার অত গতি (ক্ষণকালের জন্য) থেমে গেছে—সে-ই অতিথি। যার তিথি নেই; যার স্থিতি নেই; যে যায়, থাকে না; অনিত্যাবস্থান হেতু যার তিথি বা দিন নেই/আবেশিক, অভ্যাগত, গৃহাগত, আগন্তুক/একরাত্র পরগৃহবাসী ব্রাহ্মণ। মিতাক্ষরা মতে পথিক, শ্রোত্রিয় ও বেদপারগ—এই তিন অতিথি। রামচন্দ্রের পৌত্র ও কুশের পুত্র। অতিথি শব্দটি এখনও 'আমন্ত্রিত-অভ্যাগত' অর্থে বহুল প্রচলিত। সম্ভবত তিথি অর্থে সেকালের গোষ্ঠীর বা যৌথপরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে (যারা স্থিতি করে) এবং অতিথি অর্থে (যারা স্থিতি করে না) এমন সমাজের পরিদর্শক গোষ্ঠীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে বোঝাত। অত্রি (পরিদর্শক) প্রজাপ্রতির কালে, তখনও রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি, অথচ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছোটখাটো বিভাজন ঘটে গেছে, তখন গৃহকর্তার দায়িত্ব ছিল অতিথি সৎকার। আর অতিথির দায়িত্ব ছিল ঘুরে ঘুরে পরবর্তী উৎপাদন কর্মযজ্ঞ কীভাবে চালাতে হবে, প্রত্যেকটি যৌথপরিবার বা গোষ্ঠীকে তার পরমার্শ দেওয়া। এঁরা এক বাড়িতে তে-রাত্তিরের বেশি কাটাতেন না। আচারটি বহু পরেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুদিন ধরে কম-বেশি প্রচলিত ছিল।

অথর্ববেদ

এটি চতুর্থ বেদ নামে পরিচিত। কথিত হয়, ব্রহ্মার উত্তর দিকের, মতান্তরে পূর্ব দিকের, মুখ হতে অথর্ববেদ প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকে এটাকে বেদ বলে গণ্য করেন না। মনুসংহিতা ও অমরকোষে ঋক, সাম ও যজুঃ—এ

তিন বেদের উল্লেখ আছে। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে অথর্ববেদকে চতুর্থ বেদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থবেদ প্রধানত নয় ভাগে বিভক্ত। তবে এখন শৌনশাখা ছাড়া আর কোনো ভাগ পাওয়া যায় না। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের নাম গো-পথব্রাহ্মণ। এতে ৭৩০টি সূক্ত ও ২০টি খণ্ড রয়েছে। যার কিয়দংশ গদ্যে ও কিয়দংশ পদ্যে রচিত।

অধিগ্রহণ ও হুকুম-দখল

আইন বিজ্ঞানে Acquisition Avi Requisition দুটি আলাদা শব্দ। Requisition অর্থ হুকুমদখল এবং Acquisition মানে অধিগ্রহণ। Requisition-এর ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বল্প সময়ের হুকুমে যানবাহন বা স্থাপনা সাময়িক দখলে নেওয়া হয়। Acquisition-এর ক্ষেত্রে স্থায়ী অধিকারসহ ভূমির মালিকানা গ্রহণ করা হয়। 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭'-এ Acquisition কার্যক্রমকে সর্বত্র 'অধিগ্রহণ' বলা হয়েছে। অন্যদিকে 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২'-তে অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলকে আলাদা কার্যক্রম হিসেবে দেখানো হয়েছে, সুতরাং শব্দদ্বয় পরস্পর বিনিময়যোগ্য বা সমার্থক নয়। কিন্তু জেলাপ্রশাসকের কার্যালয় বা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে Land Acquisition Officer-কে 'ভূমি হুকুমদখল কর্মকর্তা' এবং Land Acquisition শাখাকে 'ভূমি হুকুমদখল শাখা' লেখা হয়। বিষয়টি বিভ্রান্তিকর। আসলে শব্দ দুটি হবে 'ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা' এবং 'ভূমি অধিগ্রহণ শাখা'। শব্দভাণ্ডার বিবেচনায় বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা, এজন্য শব্দচয়ন ও ব্যবহারেও সতর্কতা একটু বেশি প্রয়োজন।

অনঙ্গ

'অনঙ্গ' শব্দের অর্থ অঙ্গহীন। এ শব্দের উৎপত্তির সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের অন্যতম চরিত্র কন্দর্পের একটি কাহিনি জড়িত। কথিত হয়, পুরাকালে দেবতারা বারবার অসুরদের কাছে পরাজিত হচ্ছিলেন। তারকাসুরের কাছে পরাজিত হয়ে দেবতারা সাহায্যের জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা জানালেন যে, ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ঔরসে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে সে-ই হবে দেবগণের সেনাপতি এবং তিনিই কেবল তারকাসুরকে শাস্তি দিতে সক্ষম হবেন। এ কথা শুনে কন্দর্প হিমালয়ে গিয়ে পুষ্পধনুতে আকর্ণ টঙ্কার লাগিয়ে কন্দর্প বাণ নিক্ষেপ করেন। পুষ্পবাণের আঘাতে মহাদেবের ধ্যান ভেঙে যায়। ধ্যানভঙ্গ করার কারণে মহাদেব প্রচণ্ড ক্রোধে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন। তাঁর ক্রোধাগ্নিতে কন্দর্প ভস্মীভূত হয়ে যান। সে হতে কন্দর্প অঙ্গহীন বা অনঙ্গ নামে পরিচিত।

অনর্গল

অবিরাম, অনবরত। অনর্গল শব্দের অর্থ অর্গলহীন। যার কোনো অর্গল নেই সেটিই অনর্গল। অর্গল শব্দের অর্থ হলো দরজার হুক বা হুড়কা। হুক বা হুড়কা দরজার অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্র। হুড়কা না-লাগালে দরজার উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে যায়। হুড়কা দরজার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এ জন্য অর্গলের আলঙ্করিক অর্থ প্রতিবন্ধক, অন্তরায়, বাধা প্রভৃতি। অনর্গল হলো অর্গলের বিপরীত। সুতরাং অনর্গলের অর্থ হয়—অবারিত, প্রতিবন্ধকতাহীন, অন্তরায়বিহীন। দরজায় হুক না-থাকলে যে কেউ, যে কোনো কিছু কোনোরূপ বাধা ব্যতিরেকে অবারিতভাবে যাওয়া-আসা করতে পারে। মুখে যদি অর্গল না থাকে তা হলে যেকোনো কথা অবিরাম গতিতে বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। দরজার অর্গল না-লাগালে যেমন সবার বাহির-প্রবেশ অবারিত ও অবিরাম হয়ে যায় তেমনি মুখে অর্গল না-থাকলেও তেমনটি ঘটে। এ ধারণার সূত্র ধরে ঘরের দরজার অর্গল বাংলা বাগভঙ্গিতে উঠে এসেছে।

অনসূয়া

যার অসূয়া নেই তিনিই অনসূয়া। ভারতীয় পুরাণ হতে অনসূয়া শব্দের উৎপত্তি। পৌরাণিক কাহিনি মতে, দক্ষ-

প্রজাপতি ও প্রসূতির এক কন্যার নাম ছিল অনসূয়া। তিনি ছিলেন মহর্ষি অত্রির স্ত্রী। তিনি সম্পূর্ণ অসূয়াশূন্য ছিলেন বলে তাঁর নাম হয় অনসূয়া। বাংলা ভাষায় 'অনসূয়া' শব্দটি 'অসূয়া-হীন' অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

অনামিকা

কনিষ্ঠ বা কড়ে আঙুলের পাশের আঙুলটির নাম 'অনামিকা'। অনামিকা মানে যার নাম নেই। অনামিকা নিয়ে বাংলা ভাষায় বহু গান ও কবিতা রচিত হয়েছে। অনামিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—এ আঙুলে আংটি পরা হয়। তাই অনামিকা বিশ্বব্যাপী হৃদ্যিক সম্পর্ক, গভীর প্রেমানুভূতি, প্রবল আবেগ ও মুগ্ধকর রোমাঞ্চের পরিচিহ্ন হিসেবে বিবেচিত। তবে অনামিকা নামের ব্যুৎপত্তি খুব ভয়ানক। কথিত হয়, মহাভারতের অন্যতম চরিত্র মহাদেব শিব একদিন ভীষণ রাগান্বিত হয়ে চতুর্মুণ্ডু ব্রহ্মার একটি মুণ্ডু ঘাড় থেকে খসিয়ে ফেলেন। ভয়ানক এ কাজটি করতে তিনি কোনো অস্ত্র ব্যবহার করেননি। শুধু নিজের অনামিকা দিয়ে মুণ্ডুটি ভূপাতিত করেছিলেন। ক্রোধ তিরোহিত হবার পর মহাদেব অনুতপ্ত হন। তিনি অনুশোচনায় অস্থির হয়ে নিজের আঙুলকে অভিশাপ দিয়ে বললেন 'আজ থেকে তুই নাম গ্রহণের যোগ্যতা হারালি।' এর পর থেকে আঙুলটির নাম হয়ে যায় অনামিকা। আসলেই অনামিকা অভিশপ্ত আঙুল। প্রেমিক বা প্রেমিকার এ আংটি দুজন মানুষকে চিরদিনের জন্য পরস্পর পরস্পরের নিকট অসহনীয় দাসত্বে অনিবার্য করে তোলে।

অনুগীতা

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জানান, তিনি নিজের বুদ্ধিলোপের কারণে গীতার উপদেশসমূহ ভুলে গিয়েছেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আবার গীতার উপদেশবাণীসমূহ শোনাবার অনুরোধ করেন। অর্জুনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ জানান, তিনি গীতার বাণী প্রচার করার সময় যোগযুক্ত হয়ে যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তা পুনরায় বলা সম্ভব নয়। তৎপরিবর্তে তিনি এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ধর্মাত্মা কশ্যপকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা অর্জুনকে বলার আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সে সব বিবিধ উপাখ্যান প্রসঙ্গে সবিস্তারে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিধৃত করেছেন সেটি অনুগীতা নামে পরিচিত।

অনুগ্রহ

কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' অনুযায়ী অনুগ্রহ শব্দের বিশ্লেষণ হচ্ছে অনু + গ্রহ্ + অ (অপ্); যাহাতে অল্প গ্রহণ আছে। এর আভিধানিক অর্থ—প্রসাদ, কৃপা, আনুকূল্য, দরিদ্র্যাদিপোষণ, পালন, পোষণ, রক্ষণ ইত্যাদি এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ kindness. অল্প (অনু/অণু) গ্রহণ থেকে অনুগ্রহ শব্দের উৎপত্তি। ভারতের মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতায় চাষের জমি ছিল মন্দিরের। চাষি জমি চাষ করে মন্দিরের পাওনা ধান-চাল নিয়ে মন্দিরে পৌঁছলে এবং অনাবৃষ্টি ইত্যাদির কথা বললে, পুরোহিত অনেক সময় পাওনা পুরো বস্তা ধান-চাল না-নিয়ে, প্রতি বস্তা থেকে দু-এক মুঠো গ্রহণ করে বলতেন 'নিয়ে যা, বউছেলেমেয়ে নিয়ে ভালো করে চাষ-বাস কর।' তখন চাষিরা বলত মন্দির অনু (অণু) গ্রহণ করেছে বা অল্প গ্রহণ করেছে। এ অনু/অল্প গ্রহণ বাগভঙ্গি থেকে অনুগ্রহ শব্দের উৎপত্তি।

অন্তরীক্ষ

'অন্তরীক্ষ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পৃথিবী। ভারতীয় পুরাণ মতে ভুবর্লোক, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে অন্তরীক্ষ বলে। গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষদের বাসস্থান ছিল। যযাতি স্বর্গ হতে পতিত হয়ে এ স্থানে অবস্থান করতেন।

অন্ধ্রদেশ
ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একটি বিখ্যাত রাজ্য। বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ ও হায়দ্রাবাদের দক্ষিণাংশ নিয়ে এটি গঠিত ছিল। অন্ধ্রদেশ ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত বহু ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু।

অন্ন
'অন্ন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ভাত, খাদ্য প্রভৃতি। অন্ন বলতে যেকোনো খাদ্য বোঝালেও বাংলা ভাষায় অন্ন বলতে সাধারণত ভাত বোঝায়। সংস্কৃত অন্ন শব্দের অর্থ—সব রকমের আহার্য দ্রব্যাদি, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় অন্ন চার প্রকার। যথা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। এ অর্থে যেকোনো প্রকার খাদ্যই সংস্কৃতে ভাত। কিন্তু বাংলায় ভাত বলতে শুধু অন্ন বোঝায়। এর কারণ অযৌক্তিক নয়। ভাত ভক্ষণের সময় সাধারণ ভাতের সঙ্গে সকল প্রকার খাদ্য ও ব্যঞ্জন উদরস্থ করা হয়। তাই সংস্কৃত 'অন্ন' বাংলায় এসে শুধু 'ভাত' হয়ে গিয়েছে। বাঙালিরা ভাত খাওয়ার সময় প্রায় সকল প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করে।

অন্নচিন্তা চমৎকারা, কাতরে কবিতা কুতঃ
এটি মহাকবি কালিদাসের একটি উক্তি। এককালে অন্নচিন্তাই ছিল মানুষের মুখ্য ভাবনা। অন্ন পেলে মানুষ আর তেমন কিছু চিন্তা করত না। অবশ্য আধুনিক মানুষ শুধু অন্ন পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে না। আধুনিকতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক মানুষের উদরের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। যাই হোক, অন্নচিন্তা এমনই চমৎকার, অনিবার্য ও ঐকান্তিক যে, তাতে কাতর ব্যক্তি যতই বিদ্বান হোন না কেন, তাঁর কোনো গুণেরই বিকাশ ঘটে না। ক্ষুধা সমস্ত জ্ঞান, চঞ্চলতা ও প্রজ্ঞাকে সুপ্ত করে রাখে। জ্ঞান, মেধা ও চিন্তা যতই গভীর হোক না, তা সবসময় অন্ন দ্বারা উৎসরিত এবং অন্নময় নিশ্চয়তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এ চিরন্তন বোধ থেকে বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি।
মহাকবি কালিদাসের ঘরে একদিন অন্ন ছিল না। ওই দিন রাজসভায় বিশাল এক আসর বসেছিল। রাজসভার প্রতিটি আসরে প্রজ্ঞা আর জ্ঞান-গরিমার অনবদ্য প্রকাশের কারণে কালিদাসই হয়ে উঠেছিলেন রাজ্যের সেরা জ্ঞানী। কিন্তু রাজা দেখলেন, সেদিনের বিশাল আসরে কালিদাস বিমর্ষ, কিছুই পারছেন না। অন্য দিনের চেয়ে তাঁকে অবিশ্বাস্য রকমের উদাসীন ও বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে। তাঁকে বিমর্ষ, হতাশ ও মনমরা দেখাচ্ছিল। রাজা এর কারণ জানতে চাইলে কালিদাস বিষণ্ন বদনে বলেছিলেন অন্নচিন্তা চমৎকারা, কাতরে কবিতা কুতঃ। সোজা বাংলায় অন্নচিন্তা আমার কাব্যপ্রতিভাকে কাত করে দিয়েছে।

অপত্য
'অপত্য' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পুত্র-কন্যা, সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির অর্থ যদ্দবারা বংশ পতিত বা লোপ হয় না। তা হলে এখন প্রশ্ন আসে কার দ্বারা বংশ পতিত বা লোপ হয় না। যদি কেউ সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যান তা হলে বংশ লোপ বা পতিত হয় না। আবার কেউ যদি সন্তান-সন্ততি না-রেখে মারা যান তা হলে তার আর বংশবৃদ্ধির সুযোগ থাকে না, ফলে বংশ লোপ পায় বা পতিত হয়। তাই বাংলায় অপত্য বলতে পুত্র-কন্যা বা সন্তান-সন্ততিকে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অপত্য শব্দটির এখন একক বা স্বাধীন ব্যবহার তেমন দেখা যায় না। শব্দটি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চমৎকার অর্থ প্রকাশে প্রয়োগ করা হয়। যেমন—অপত্যস্নেহ, অপত্যনির্বিশেষে, অপত্যভালবাসা প্রভৃতি।

অপরূপ
'অপরূপ' শব্দের আদি অর্থ কদাকার। 'অপ' একটি উপসর্গ। এটি উপসর্গরূপে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নঞর্থক দিকে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। যেমন—অপগমন, অপকর্ষ, অপমান, অপঘাত, অপকৃষ্ট, অপরূপ, অপযান ইত্যাদি। অপরূপ একটি বিশেষণ। অভিধানে এর অর্থ দেওয়া আছে অপূর্ব, অতুলনীয়

রূপবিশিষ্ট; আশ্চর্য, কিম্ভূত; কদাকার, কুরূপ; বেয়াড়া। সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় 'অপরূপ' শব্দটি 'অপূর্ব' অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি কদাকার/বেতাল/বেয়াড়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন— বউটা ভালা আছে, হইলে কিতা হইবো অপরূপ জামাইটার যন্ত্রণায় ঘরো শান্তি নাই। 'অপ' আসলে এক অপয়া উপসর্গ। অপকর্ম, অপচেষ্টা, অপপ্রচার, অপচিকীর্ষা, অপবাদ, অপভাষা, অপজাত প্রভৃতি এর অপয়ার স্বাক্ষর বহন করে।

'অপরূপ' শব্দের অর্থ জানার আগে 'অলঙ্কার' শব্দের অর্থ জানা দরকার। অলঙ্কার = অলম+/কৃ+অ(ঘঞ); যে করণ (কাজ করা) অলম (নিষিদ্ধ); নিষেধ সত্ত্বেও যা করা হয়েছে। অলম শব্দের অর্থ 'করিও না'। অহঙ্কার, অলঙ্কার, সত্যঙ্কার—'কার' যুক্ত এই তিনটি শব্দই যৌথসমাজের উদ্বৃত্ত সম্পদকে ব্যক্তিগত করার প্রাচীন চেষ্টার নিদর্শন। প্রজাপতিতন্ত্রের পূর্বে উদ্বৃত্ত জমানো নিষিদ্ধ ছিল, ফেলে দেওয়া হতো আবর্জনারূপে, আর যে আবর্জনা নিক্ষেপ-স্থানে যেত তাকে নিন্দা করা হতো 'কিরাত' বলে। কারণ সামাজিক উৎপাদনের 'অবশেষ' থেকে সমাজদেহে পুঁজ জমতে পারে। এই উদ্বৃত্ত তাই ছিল 'ভূষা' পদবাচ্য, যা খাদ্যাদির ছোবড়ার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হতো। 'ভূষা' কথাটি একালেও খুব ভালো কথা নয়। গহনাদি তাই 'ভূষা' পদবাচ্য হয়ে যায়। পরে সমাজে সম্পদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হলে, অলঙ্কারের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। যদিও ভারতসমাজে 'অহঙ্কার'-এর মর্যাদাতে মন প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং নিন্দিতই রয়ে গেছে। আর 'সত্যঙ্কার' গেছে হারিয়ে। আবার 'অল' মানেই 'নিবারণ' ও 'ভূষণ'। ভূষণের দ্বারা নিজেকে গোপন করেই তো শত্রুনিবারণ করা যায়। নইলে 'অল' শব্দের আরেকটি অর্থ কেন 'শত্রুনিবারক' হতে যাবে।

কলিম খান-রবি চক্রবর্ত্তী রচিত 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' গ্রন্থেও এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অপরূপ = অপকৃষ্ট রূপ যাহার। 'অপ' শব্দটি নিন্দাসূচক, সবাই জানেন। অথচ রূপের আগে 'অপ' থাকা সত্ত্বেও 'অপরূপ' কথাটি একালে 'অতি সুন্দর' অর্থে প্রচলিত রয়েছে। এটা হলো কীভাবে? 'অলঙ্কার' শব্দটি থেকে জানা যায়, গহনাদি এককালে নিষিদ্ধ ছিল। শারীরিক সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে প্রদর্শনও সেকালে মন্দ কাজ মনে করা হতো। বঙ্গীয় শব্দকোষে উল্লেখ আছে, 'বাচস্পত্যে' 'আশ্চর্যরূপ' অর্থে সংস্কৃত 'অপরূপ' ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ 'আশ্চর্য' শব্দের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, কারও কারও আশামূলক আচরণ (সবাই মিলে চাষ করার ফলে যে ফলগুলো ফলেছে, তার মধ্যে যে-লতায় ওই বড় ফলটি ফলেছে, তাতে আমি জল ঢালতাম, অতএব ভাগের সময় আমি যেন ওই ফলটি পাই—এইরূপ আশামূলক আচরণ) দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত, সে রকম নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে (অপকৃষ্ট করে) অন্যদের দেখিয়ে আকর্ষণ করার মধ্যেও লোকে সেকালে 'আশামূলক আচরণ' দেখেছিল। সে জন্য রূপসজ্জা অপকর্ম বলে নিন্দিত হয়েছিল। পরে সেটাই সমাজে গ্রহণীয় হয়ে গৌরবজনক হয়ে যায়, যেমন হয়েছে 'অলঙ্কার'-এর ক্ষেত্রে। তাই অপরূপ শব্দের শব্দগত অর্থ 'মন্দ-রূপ' হলেও সমাজ-ইতিহাসের বিচারে প্রাচীনকালে তা মন্দই ছিল। পরবর্তীকালে সমাজ ব্যক্তিমালিকানার দিকে যত অগ্রসর হতে থাকে, শব্দটির অর্থ ক্রমশ 'অতি সুন্দর রূপ' হয়ে যায়।

অপ্সরা

'অপ্সরা' শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বর্গবেশ্যা, সুরসুন্দরী প্রভৃতি। ভারতীয় পুরাণ মতে সংস্কৃত অপ (জল) হতে এরা উৎপন্ন হয়েছিল। তাই এদের নাম অপ্সরা। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র হতে অনেক কিছুর সঙ্গে অসংখ্য পরিচারিকা উঠে আসে। দেব-দানব কেউ ওদের গ্রহণ না-করায় এরা সাধারণ স্ত্রীরূপে গণ্য হয়। মনুসংহিতা মতে এরা সপ্তমনু দ্বারা সৃষ্ট এবং সংখ্যায় ৬০ কোটি। কামদেব অপ্সরাদের অধিপতি ছিলেন। অপ্সরাগণ গান, নৃত্য, বাদ্য, ছলাকলা প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। দেবতারা এদের নানা কাজে নিযুক্ত করতেন। কোনো মুনি বা ঋষি কঠোর তপস্যাবলে দেবতাদের চেয়েও যাতে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন—এ ভয়ে দেবতারা কখনো কখনো মুনি-ঋষিদের প্রলুব্ধ করে তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য অপ্সরা পাঠাতেন। বিশ্বামিত্রের

তপস্যা ভঙ্গের জন্য মেনকাকে পাঠানো হয়েছিল। যার ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়।

অপাঙক্তেয়

পঙক্তির সঙ্গে নেতিবাচক অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অপাঙক্তেয় শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ অনুপযুক্ত বা অসমকক্ষ। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো একই পঙক্তিতে বা একই সারিতে বসার অনুপযুক্ত। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে সমবেত মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের পঙক্তিতে বা সারিতে নিম্নশ্রেণির মানুষদের বসতে বা খেতে দেওয়া হতো না। তাই তাদের বলা হতো অপাঙক্তেয় বা পঙক্তিতে বসার অনুপযুক্ত। তখন অপাঙক্তেয় বলতে একঘরে, পতিত, ঘৃণিত, নিন্দিত ও অবজ্ঞেয় ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হতো। এখন অযোগ্য, অনুপযুক্ত কিংবা অসমকক্ষ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অপেক্ষা

'অপেক্ষা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা, দেরি, বিলম্ব প্রভৃতি। শব্দটি বহুমুখী দ্যোতনার অধিকারী। প্রতীক্ষা, দেরি, ভরসা, আশা, প্রত্যাশা প্রভৃতি অর্থেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত হতে বাংলায় শব্দটি এসেছে। তবে সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ—আকাঙ্ক্ষা, আশা, ইচ্ছা প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় 'অপেক্ষা' অর্থ প্রতীক্ষা, কোনো কিছু প্রত্যাশায় প্রহর গোনা প্রভৃতি।

অপেক্ষা শব্দটি wait করা অর্থে এবং তুলনার্থক 'হতে, থেকে, চেয়ে' প্রভৃতি অর্থে প্রচলিত। 'ঈক্ষ্' শব্দের অর্থ হলো গতিশীল কোনো বস্তু বা বিষয় (= ঈ)-কে দর্শন করা বা দেখা। কিন্তু দেখার জন্য যে সময়, অর্থ, নিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যয় করা হয় অথচ যাকে দেখার জন্য এত কিছু তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, এ রকম ঈক্ষা-কে বলে অপ-ঈক্ষা বা অপেক্ষা বা খারাপ ঈক্ষা। বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার অনিশ্চিত আগমনের জন্য 'প্রতীক্ষা' বা wait করতে বাধ্য হতে হলে তখন বোঝা যায় আসলে অপেক্ষা নামক কাজটি কতখানি অপ। কারণ তাতে ঈক্ষিত উপস্থিত নেই, অথচ ঈক্ষণের বাকি সমস্ত উপাদানগুলো ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এমন ঘটনা বিরল নয় যেখানে অপেক্ষাকারী অপেক্ষা করার চেয়ে আত্মহত্যাকে শ্রেয় ভেবেছে। এ অপ-ঈক্ষা বা অপেক্ষা ক্রমে একদিন কীভাবে যেন তুলনামূলক হয়ে গেল। আবুল অপেক্ষায় (তুলনায়) বাবুল শ্রেষ্ঠ, এজন্য যে, আবুলের যখন দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন যে-বাবুলকে পাওয়া যাচ্ছে সে-ই ভালো। এভাবে অপেক্ষা শব্দটি ক্রমে তুলনাত্মক হয়ে যায়। কিন্তু সে তুলনা কেমন করে 'হতে, থেকে, চেয়ে' হয়ে গেল! আবুল অপেক্ষা (হতে, থেকে) বাবুল শ্রেষ্ঠ, আবুলের চেয়ে বাবুল শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল?

অবতার

দেবতারা সময়ে সময়ে বিভিন্ন কারণে মনুষ্য-মূর্তি ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছেন বলে বর্ণিত আছে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা শূকর, কূর্ম ও মৎস্য অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবী-সৃষ্টি ও রক্ষা করেছেন। পৃথিবীর রক্ষক হিসাবে বিষ্ণু অনেকবার অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণের যুগেই বিষ্ণু দশ অবতারে পূর্ণ প্রকাশ হন। এ দশ অবতারের নাম মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি।

অবশ

যা বশে থাকে না, নিয়ন্ত্রণে থাকে না তা-ই অবশ। তবে বাংলায় শব্দটি ব্যাকরণগত অর্থের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। অবশ শব্দের প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ অসাড়/বিকল। এর মূল অর্থ—যা নিজের বশে নেই। অর্থাৎ যা নিজের বশীভূত নয় সেটাই অবশ। অবশ বলতে অবাধ্য বোঝায় আবার স্বাধীনও বোঝায়। শরীর অবশ হয়, মনও অবশ হয়। শরীর-মন অবশ হওয়া মানে নিজের বশে বা নিয়ন্ত্রণে না-থাকা।

অভিমত

অভিমত শব্দের আভিধানিক অর্থ—মতামত, অভিপ্রায়, মন্তব্য প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় 'অভিমত' শব্দের মূল অর্থ— সম্মত, ইষ্ট, অনুমোদিত প্রভৃতি। সাধারণত কোনো বিষয়ের ওপর আলোচনার পর সম্মতি বা অনুমোদন আসে। সংস্কৃতে 'অভিমত' শব্দটি কোনো বিষয় আলোচনার পর অনুমোদন বা সম্মতি প্রদান অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাংলা ভাষায় আলোচনার আগে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পর্যালোচনার জন্য অভিমত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং বাংলার 'অভিমত' সংস্কৃত 'অভিমত' শব্দের চেয়ে কার্যগত বিবেচনায় কিছুটা ভিন্ন হলেও অন্তর্নিহিত অর্থ প্রায় অভিন্ন।

অভিমান

অভিমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আত্মীয়স্বজন কিংবা যেকোনো প্রিয়জনের অবজ্ঞা বা অবহেলাজনিত মনোবেদনা। আপনজন যত ঘনিষ্ঠ হয় মনোবেদনা তত অধিক ও তত জটিল হয়। সংগতকারণে মনোবেদনার প্রতিক্রিয়াও তত বেশি হয়। অতি ঘনিষ্ঠ ও গভীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামান্য কারণেও মনোবেদনা প্রবল হয়ে উঠতে পারে। এ মনোবেদনার কারণে অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। তবে 'অভিমান' শব্দের আদি অর্থ এমন ছিল না। শব্দটির আদি অর্থ হলো—নিজের প্রতি মান, এমন ভাব। এ ভাব বা চেতনা থেকে শব্দের মূল অর্থ হয়ে দাঁড়ায় আত্মসম্মান, গৌরব, মান, অহঙ্কার প্রভৃতি। কোনো মানুষের মনে যখন এরূপ বোধের কারণে বঞ্চনার ভাব জাগে এবং বঞ্চনাটা যখন আসে প্রিয়জন হতে তখন হৃদয়-মন সত্যিকার অভিমানে ফুঁসে ওঠে। হিন্দি ভাষাতেও 'অভিমান' আছে এবং বাংলার মতো একই অর্থ বহন করে।

অভিসম্পাত

এর আভিধানিক অর্থ অভিশাপ, শাপ, বদদোয়া প্রভৃতি। পুরাণ যুগে অভিসম্পাতে পরিমাণ ও কারণ ছিল যেমন ঘন তেমনি মজার ও বিস্ময়কর। অভিসম্পাত সংস্কৃত হতে আগত একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির অর্থ যুদ্ধ, যুদ্ধের জন্য পরস্পর আগুয়ান, যুদ্ধের জন্য পরস্পর মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদি। তবে বাংলায় এসে শব্দটি মূল অর্থ হারিয়ে অন্য অর্থ ধারণ করেছে। অন্য অর্থ ধারণ করলেও সংস্কৃত 'অভিসম্পাত' এর অর্থের সঙ্গে বাংলা 'অভিসম্পাত' এর দারুণ মিল রয়েছে। যুদ্ধ বা যুদ্ধের জন্য পরস্পর মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই। অভিশাপ মানে অশান্তির জন্য প্রার্থনা; যে অভিশাপ দেয়, সে যাকে অভিশাপ দেয় তার চরম ক্ষতি কামনা করে। যুদ্ধও এমন, পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করা বা ক্ষতিগ্রস্ত করাই যুদ্ধের কাজ। যা অভিসম্পাতের অনুরূপ।

অভ্যর্থনা

'অভ্যর্থনা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সমাদরে আহ্বান ও গ্রহণ। এটি সংস্কৃত হতে বাংলায় এসেছে। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির অর্থ ছিল প্রার্থনা করা, চাওয়া, আবেদন করা প্রভৃতি। তবে বাংলায় এসে শব্দটি তার অর্থ পরিবর্তন করে সমাদরে আহ্বান বা সম্মানের সঙ্গে আহ্বান প্রভৃতি অর্থ ধারণ করেছে। কেন এমন হলো বা এমন হওয়ার কোনো কারণ আছে কি না দেখা যাক। প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান, অর্থশালী কিংবা বিভিন্ন কারণে মর্যাদাবান ব্যক্তিদের কাছে সংস্কৃত ভাষায় অভ্যর্থনা তথা প্রার্থনা করা হতো কিংবা কিছু চাওয়া হতো। যার বা যাদের নিকট থেকে কিছু চাওয়া হতো তাকে বা তাদেরকে সাদরে ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হতো, এটাই ছিল রেওয়াজ। সমাদর না করলে দেবেনই-বা কেন। যত বেশি সমাদর, তত বেশি প্রার্থনা পূরণ।

সংস্কৃতের এ কার্যটি বাংলায় এসে প্রার্থনা বা আবেদনের পরিবর্তে 'সমাদরে আহ্বান' কথায় পরিণত হয়। বাংলায়

যাকে অভ্যর্থনা করা হয় তার কাছ থেকে অভ্যর্থনা-প্রদানকারীদের কিছু না কিছু চাওয়ার থাকে। তাই সংস্কৃত অভ্যর্থনা বাংলায় এসে অর্থকে পরিবর্তন করে কার্যকরণগত ও উদ্দেশ্যগত উভয় দিককে একাকার করে দিয়েছে। এখন অভ্যর্থনার আড়ালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু পাওয়ার থাকে।

অভ্যুত্থান

'অভ্যুত্থান' বাংলা ভাষায় পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত একটি রাজনীতিক শব্দ। মূলত রাষ্ট্রীয় রাজনীতিক ক্ষমতাবদলের ধরন বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অভ্যুত্থান শব্দের মূল ও আদি অর্থ কাউকে সম্মান প্রদানের জন্য আসন থেকে ওঠা বা উন্নত, উদ্গত হওয়া, অভ্যুত্থিত হওয়া প্রভৃতি। তবে শব্দটি এখন তার মূল অর্থ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। এখন অভ্যুত্থান বলতে জোরপূর্বক কাউকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। বাংলার বর্তমান 'অভ্যুত্থান' কাউকে সম্মান জানাবার জন্য আসন থেকে উঠে দাঁড়ানো নয়, বরং নিজে সম্মানিত হওয়ার জন্য, ক্ষমতাবান হওয়ার জন্য অন্যকে আসন থেকে জোরপূর্বক তুলে দিয়ে নিজেই সে আসনে আসীন হওয়া।

অমরকণ্টক

বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বদিকের একটি বিখ্যাত সমতলভূমি। এটি হিন্দুদের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। হিন্দুদের বিশ্বাস এ তীর্থস্থানে গেলে পুণ্য অর্জিত হয়। দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভের জন্য অমরকণ্টকে গমনের কোনো বিকল্প নেই।

অমরাবতী

'অমরাবতী' ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একটি বিখ্যাত স্থান। ইন্দ্রের আলয় ও রাজধানী ছিল অমরাবতী। নগরটি বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেন। এটি ছিল সুমেরু পর্বতের উপর অবস্থিত দেবতাদের বাসভূমি। এখানে শোক, তাপ, জরা, মৃত্যু কিছু নেই। তাই এর নাম অমরাবতী। স্বর্গগঙ্গা নামে পরিচিত অলকানন্দা এ নগরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

অমৃত

'অমৃত' শব্দটি শুনলে জেগে থাকার মধ্যেও একধরনের স্বপ্নিল অনুভূতিতে মনটা ভরে ওঠে। 'অমৃত' ভারতীয় পুরাণের একটি অতি উত্তম, পবিত্র ও বহুবিধ গুণধারী একটি মহামূল্যবান পানীয়। সুধা, পীযূষ ও জীবন-বারি, যা দেবতাগণ পান করে অমর হয়েছেন। হোমের সময় যে সব জিনিস অর্পণ করা হতো তাদের নাম ছিল অমৃত। সোমরসকে অমৃত বলা হতো। অমৃতের নির্ঝর ও পীযূষ নামে এ সোমরস খ্যাত ছিল। মহাভারত মতে, সমুদ্র মন্থনের ফলে এ অমৃত উৎপন্ন হয়েছিল।

অযোনিসম্ভবা

অযোনি হতে সম্ভব অর্থাৎ যোনি ব্যতীত সৃষ্ট যে বা যারা, সে বা তারাই অযোনিসম্ভবা। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্রেষ্টিযজ্ঞকালে যজ্ঞীয় অগ্নি হতে দ্রৌপদীর জন্ম হয়েছিল। তাই দ্রৌপদীকে অযোনিসম্ভবা বলা হয়।

অরণ্য

'অরণ্য' শব্দের অর্থ গভীর বন, জঙ্গল, কানন। অরণ্যের মতো 'অরণ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিও রহস্যময়। 'অরমমান' শব্দ থেকে অরণ্য শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতে অনেকে গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরতেন না। তাঁরা চিরকুমার-ব্রহ্মচারী হয়ে সংসার ও নারীসঙ্গ বর্জন করে অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন করতেন। অনেকে অধ্যাত্মসাধনার জন্য বনে বসবাস করতেন। তাদের 'অরমমান' বলা হতো। সাধারণ্যে অরমমানগণ 'অরণ' নামে পরিচিত ছিল। মূলত এ অরণ শব্দ থেকে অরণ্য শব্দের উৎপত্তি।

অরণ্যে রোদন

এটি একটি জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত বাগধারা। অরণ্যে রোদন বাগভঙ্গির অর্থ নিষ্ফল আবেদন। অরণ্য শব্দের অর্থ—গভীর বন। রোদন বলতে এখানে কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আবেদন বা আকুতি বোঝানো হয়েছে। তৎকালে গভীর বন ছিল প্রকৃত অর্থে জনশূন্য। জনশূন্য বনে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য ক্রন্দন করলেও কেউ শোনার বা সাড়া দেওয়ার থাকত না। ফলে সকল প্রত্যাশা, আবেদন, আকুতি, ক্রন্দন বা আবেদন নিষ্ফল হয়ে যেত। এ ধারণা থেকে বাগধারাটির উৎপত্তি।

অরুণ

অরুণ শব্দের আভিধানিক অর্থ সূর্য। শব্দটির উৎপত্তির সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের একটি কাহিনির সংস্রব রয়েছে। বিনতার প্রসূত ডিম দীর্ঘদিনেও বিদীর্ণ হচ্ছিল না। অথচ সপত্নী কদ্রুর সন্তানগণ দিন দিন বেড়ে উঠছিল দেখে বিনতা ক্ষুব্ধ হয়ে অকালে তাঁর ডিম্ব বিদীর্ণ করে ফেলেন। এ ডিম্ব হতে ঊরুহীন অবস্থায় এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম রাখা হয় অরুণ। ঊরুহীন ছিল বলে তিনি অন্ধরু বা ঊরুহীন নামে খ্যাতি পান। অরুণ সূর্যের সারথিরূপে সপ্ত অশ্বযুক্ত রথ চালনা করতেন। সূর্যের সারথি হিসাবে অরুণ শব্দটি বাংলায় 'সূর্য' অর্থ প্রকাশে ব্যবহার করা হয়।

অর্ধচন্দ্র

'অর্ধ ও চন্দ্র' মিলে অর্ধচন্দ্র। এর ব্যাকরণগত অর্থ হয় চাঁদের অর্ধাংশ। কিন্তু 'অর্ধচন্দ্র' বলতে চাঁদের অর্ধাংশ বোঝায় না। বহুল প্রচলিত এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ—গলাধাক্কা। গলাধাক্কা বিভিন্নভাবে দেওয়া যায়। কিন্তু মানুষ সাধারণত হাত দিয়ে গলাধাক্কা দেয়। তা হলে গলাধাক্কার সঙ্গে অর্ধেক চন্দ্র এলো কীভাবে? অর্ধচন্দ্র শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হলো অর্ধেক চাঁদ, বা অর্ধ-উদিত চাঁদ। কাউকে গলাধাক্কা দিতে হলে হাতের আকৃতিকে যেভাবে সাজাতে হয় তা অনেকটা অর্ধচন্দ্রের ন্যায় অর্ধবৃত্তাকার। হাতকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি করে গলাধাক্কা দেওয়ার প্রচলিত কার্য থেকে 'অর্ধচন্দ্র' শব্দটির অর্থ হয়ে যায় গলাধাক্কা। বাঙালি কীভাবে আকাশের অর্ধচন্দ্রকে নিজের হাতের সঙ্গে রূপায়ণ করে অন্যকে ধাক্কা দেওয়ার কাজে মিলিয়ে দিয়েছে।

অর্পণা

হিমালয়ের স্ত্রী মেনকা হতে অর্পণার জন্ম। অর্পণা শিবকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য কঠোর তপস্যায় রত হলে তার জননী মেনকা স্নেহার্দ্রস্বরে বললেন 'উ-মা'। অর্থাৎ—হে পার্বতী, তপস্যা কর না। সে হতে অর্পণার অন্য নাম হয় উমা। তপস্যার সময় উমা অনাহারে থাকতেন, এমনকি গলিত পত্রও ভক্ষণ করতেন না। এ জন্য তাঁর আর এক নাম অর্পণা। পরবর্তীকালে শিবের সঙ্গে অর্পণার বিয়ে হয়েছিল।

অলক্ষ্মী

'অলক্ষ্মী' শব্দটির অর্থ দুর্ভাগিনী বা দুর্ভাগ্য-আনয়নকারী নারী। হতভাগ্য নারীদের প্রতি গালি বা কটাক্ষ প্রকাশেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়। দারিদ্র্য ও শ্রীহীন বোঝাতে বলা হয় 'অলক্ষ্মীর দশা'। কোনো ব্যক্তি বা সংসারে দুর্ভাগ্য কাউকে বারবার বিপর্যস্ত করলে বলা হয় 'অলক্ষ্মী লেগেছে'। ভারতীয় পুরাণে ভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী এবং দুর্ভাগ্যের দেবী অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মী হচ্ছে ভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর বড় বোন। সমুদ্র মন্থনকালে তিনি লক্ষ্মীর সঙ্গে উঠে এসেছিলেন। তাঁর মূর্তি নিকষ কালো, পরিধেয় বস্ত্রও ছিল ঘোর কালো। লোহার অলঙ্কারে আচ্ছন্ন অলক্ষ্মীর সর্বাঙ্গে ছিল কাঁকরের রেণু এবং হাতে ছিল ঝাঁটা। গর্দভ ছিল তাঁর বাহন। ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করা ও মানুষের মধ্যে দুর্ভাগ্য ঢেলে দেওয়া ছিল তাঁর কাজ। সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হলেও কেউ তাঁকে গ্রহণ করেনি। অনেক পরে দুঃসহ নামের এক মহাতপা মুনি অলক্ষ্মীকে বিয়ে করেন।

দুঃসহ মুনি নিজেও অন্যদের নিকট দুঃসহ ছিলেন। তবু তিনি অলক্ষমীর যাতনা সহ্য করতে না-পেরে তাঁকে (অলক্ষ্মীকে) পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর স্বামী পরিত্যাক্তা অলক্ষ্মী মর্ত্যে তাঁর বাসস্থান কোথায় হবে তা দেবতাগণের কাছে জানতে চান। দেবতারা বললেন, যেখানে সর্বদা কলহবিবাদ সেখানে তুমি বাস করবে, যে ব্যক্তি কপটচারী, দুর্ভাগা, কদাচারী, মিথ্যুক, অন্যের অনিষ্টকারী, তুমি তাকে অবলম্বন করতে পারবে। তবে যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্য কলহ লেগে থাকে, চেপে আছে প্রবল অবিশ্বাস—সে ঘরে তুমি মহানন্দে বাস করতে পারবে। এরপর বাসস্থান খুঁজে পেতে তার আর কোনো অসুবিধা হয়নি। অলক্ষ্মী দেখতে পায় মর্ত্যে তার মতো অবারিত বাসস্থান আর কোনো দেবতার নেই। পৌরাণিক এ দুঃসহ নারী চরিত্র থেকে বাংলা বাগভঙ্গি 'অলক্ষ্মী'র উৎপত্তি। তবে বাংলা বাগভঙ্গির অলক্ষ্মী' পুরাণের মতো এত ভয়ঙ্কর নয়। অনেক সময় 'অলক্ষ্মী' শব্দটি প্রিয়জনদের প্রতি আদুরে গালি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

অলিগলি

'অলিগলি' শব্দটির অর্থ ছোট ছোট পথ, সংকীর্ণ পথ, গলিঘুঁজি, গুপ্তপথ ইত্যাদি। সাধারণভাবে শহরের সংকীর্ণ বা সরুপথ বা গলিঘুঁজিসমূহ অলিগলি নামে পরিচিত। গ্রামে গলিপথ শব্দটি প্রায় অপরিচিত, কারণ গ্রামে গলিপথ নেই। শহরে গলিপথ দেখা যায়। যত বড় শহর তত বেশি গলিপথ। 'অলি' ও 'গলি' এ দুটো শব্দের সমন্বয়ে অলিগলি শব্দটি গঠিত হয়েছে। বাংলায় 'অলি' শব্দের অর্থ ফুল, কোকিল, কাক, বৃশ্চিক প্রভৃতি। তবে অলিগলির 'অলি' কিন্তু বাংলা 'অলি' নয়। এটি ইংরেজি শব্দ। গলি শব্দটি গুজরাটি। ইংরেজি 'অলি' ও গুজরাটি 'গলি' মিলে হয়েছে বাংলা 'অলিগলি'। মূলত ইংরেজি অলি (Alley) শব্দের অর্থ অপেক্ষাকৃত ছোট পথ এবং গুজরাটি গলি শব্দের অর্থও প্রায় অভিন্ন। তবে ইংরেজি অলি গুজরাটি গলির চেয়ে কিছু প্রশস্ত। এ অলিগলি মিলে বাংলায় হয়েছে অলিগলি, যা অনেকাংশে গুজরাটি 'গলি' অর্থকে ধারণ করেছে।

অল্প

বাংলা ভাষায় 'অল্প' একটি বহুল প্রচলিত ও বহুমাত্রিক অর্থদ্যোতক শব্দ। ঈষৎ, কিঞ্চিৎ, পরিমিতবিষয়ক, অকিঞ্চিৎকর, লঘু, সামান্য, পরিমিত, less বা কম অর্থ বোঝাতে; সীমায়িত বস্তু বা ব্যাপার, যার বৃদ্ধি বা বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ আছে, বারণ করা আছে, তাই অল্প অর্থাৎ ঈষৎ কম—প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে 'অল্প' শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। বহু কারখানায় মালিকের ইচ্ছেমতো উৎপাদন করার অধিকার নেই। কত উৎপাদন করা হবে তা সরকার বলে দেয় অথবা সরকারের নিকট থেকে অনুমতি নিতে হয়। ফলে তাদের উৎপাদন অল্প; একালের ভাষায় sanctioned, বা সীমিত পরিমাণ। এ রকম বিষয়কে পূর্বে 'অল্প' বলা হতো, পরে তা প্রাসঙ্গিক বিষয় ছাড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। স্মর্তব্য, অল্প কিন্তু কম নয়, কম-এর চেয়ে বেশি। বঙ্গীয় শব্দার্থকোষে কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী অল্প শব্দের বিবর্তন ও আন্তর্জাতিকতার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে, 'alp = অনতি-উচ্চ পর্বত বা অল্প-পর্বত। হিমালয়ের তুলনায় সুইজারল্যান্ডের পাহাড় অনতি-উচ্চ বা অল্প সেজন্যই ল্যাটিন ভাষায় তাকে alpes এবং ইংরেজি ভাষায় alps বলা হয়েছে। হতে পারে প্রাচীনকালে হিমালয়-দ্রষ্টা ভারতের কেউ সুইজারল্যান্ডে গিয়ে পর্বতটিকে ঐ নাম দিয়েছে অথবা সুইজারল্যান্ডের কেউ ভারতে এসে হিমালয় দেখে ফিরে যাবার পর পর্বতটিকে ঐ নাম দিয়ে থাকবে।'

অশ্বত্থামা

১. অশ্ব, স্থা = স্থিতি। ২. অশ্বের ন্যায় স্থাম (শৌর্যাদি) যাঁর; ৩. কৃপী-গর্ভজাত দ্রোণপুত্র। ইনি জন্মমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় রব করেছিলেন এবং তাঁর বল দিগ্বিদিক ব্যাপ্ত করেছিল। এ জন্য তাঁর নাম অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামা কুরুপক্ষীয় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর প্রধান কীর্তি—অভিমন্যুবধ, রাত্রিতে সুপ্ত পাণ্ডবশিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নাদির

বিনাশ, ব্যাসাশ্রমে পাণ্ডববধার্থ ব্রহ্মশির অস্ত্র ত্যাগ, সে-অস্ত্রে পাণ্ডবের নিকট প্রাণপ্রতিদান। ভারতীয় পুরাণ মতে, অশ্বত্থামা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের মতো হ্রেষা রব করেছিলেন। তাই তিনি অশ্বত্থামা নামে অভিহিত হন।

অশ্বমেধ

প্রাচীন ভারতের অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ কঠিন এক যজ্ঞ। শ্রেষ্ঠ রাজাগণ পুত্রলাভ বা রাজচক্রবর্তী হয়ে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ যজ্ঞ সম্পন্ন করতেন। নিরানব্বইটি যজ্ঞ করার পর অতি সুলক্ষণযুক্ত অতি দুর্লভ ক্ষমতা ও মোহনীয় দেহাবয়বের অধিকারী প্রচণ্ড বেগবান এবং সুগন্ধযুক্ত অশ্বের কপালে জয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হতো। ওই অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাজা সসৈন্যে অশ্বের অনুগামী হতেন। এ অশ্ব বছরকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করত। অশ্বের অগ্রগতি কোনো রাজা রোধ করতে এলে প্রমাণ হতো যে, তিনি অশ্বাধিকারীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন না। তখন যুদ্ধের মাধ্যমে উভয়ের শক্তি পরীক্ষা হতো। ভিন্ন রাজ্যে অশ্ব প্রবেশ করলে সে রাজ্যের রাজাকে যুদ্ধ করতে হতো অথবা অশ্বাধিকারীর বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হতো। এভাবে অশ্বের অধিকারী রাজা অন্য সব রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারলে মহাসম্মানসূচক 'রাজচক্রবর্তী' উপাধি লাভ করতেন। এক বছর পর অশ্ব দেশে ফেরত আসার পর শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞের আয়োজন শুরু করা হতো। যূপবদ্ধ অশ্বটিকে শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণগণ বধ করতেন। রাতে রাজপত্নীবর্গ অশ্বের মৃতদেহ রক্ষা করতেন। অশ্বের বক্ষঃস্থলের চর্বি আগুনে দগ্ধ করে যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা ধূম আঘ্রাণ করতেন। অশ্বদেহের অন্যান্য অংশ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে হোম করা হতো। যজ্ঞ শেষে ব্রাহ্মণদের নানা দক্ষিণা এবং নিমন্ত্রিত নৃপতি ও অন্যান্য অতিথিগণকে যথাযোগ্য উপহার দিয়ে বিদায় করা হতো। হিন্দুধর্মে বিশ্বাস—এ যজ্ঞের ফলে যজ্ঞকারী সর্বপ্রকার পাপ ক্ষয়, স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করেন। শত অশ্বমেধযজ্ঞকারী রাজা ইন্দ্রত্ব লাভ করতেন। এজন্য ইন্দ্রের আর এক নাম শতক্রতু। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির উভয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন।

অশ্বিনী

একটি নক্ষত্রের নাম হলেও ভারতীয় পুরাণ মতে ইনি দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের স্ত্রী। এ নক্ষত্রের আকৃতি অশ্বের মস্তকের মতো। এ জন্য এর নাম অশ্বিনী। এ নক্ষত্র আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতে অবস্থান করে বলে, এ মাসের নাম আশ্বিন। চন্দ্রের সাতশ' জন স্ত্রীর মধ্যে অশ্বিনী প্রথম।

অষ্টধাতু

শব্দটির অর্থ—আট ধাতু বা আটটি ধাতুর মিশ্রণ। এই আট ধাতু হলো সোনা, রুপা, তামা, পিতল, কাঁসা, রাং, সিসা ও লোহা। এ আট ধাতুর মিশ্রণকে বলা হয় অষ্টধাতু। এদেশে একসময় অষ্টধাতুর মাদুলির বহুল প্রচলন ছিল। রাস্তাঘাটে, হাটে-বাজারে সর্বত্র অষ্টধাতুর মাদুলি বিক্রি হতো। সাধারণ জনগণের বিশ্বাস ছিল, এ মাদুলি দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তি দিতে সহায়ক একটি অলৌকিক বস্তু। তাই এর বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। এখন অবশ্য বিজ্ঞান ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রসারের কারণে অষ্টধাতুর মাদুলির সে জনপ্রিয়তা আর নেই। তবে এখনও শহরে, গ্রামে, ট্রেনে, বাসস্টেশনে, ফুটপাতে অষ্টধাতুর মাদুলি বিক্রি হতে দেখা যায়। বিক্রিও হয় ভালো।

অষ্টম খষ্ট মিটিয়ে তবে নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার

বাগভঙ্গিটির আভিধানিক অর্থ—সবচেয়ে জরুরি ও প্রয়োজনীয় কাজটা আগে সম্পাদন করা উচিত। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের অষ্টম আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে না-পারলে জমিদারি নিলামে উঠত। এ ভয়ঙ্কর আইন হতে প্রবাদটির জন্ম। প্রথমে গুরু দায় হতে উদ্ধারের ব্যবস্থা করা উচিত, তারপর অন্য কাজ। যে কাজ অতি

জরুরি সেটি সম্পন্ন করার পর অন্য কাজে হাত দেওয়া উচিত। নইলে আম ও ছালা দুটোই চলে যেতে পারে। অষ্টম আইন অনুসারে খাজনা দেওয়াই সর্বাপেক্ষা জরুরি। নইলে জমিদারি চলে যেতে পারে। নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের কাজ খাজনা দেওয়ার পর করলেও চলে। কিন্তু কেউ যদি নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করতে গিয়ে খাজনা পরিশোধ করতে ভুলে যায় তা হলে তার জমিদারি আর কোষ্ঠী সবটাই শেষ হয়ে যায়।

অষ্টাবক্র

অষ্টাবক্র বলতে আভিধানিকভাবে তাকে বোঝায়—যার শরীরের গঠন আঁকাবাঁকা, বেয়াড়া ছাঁদের, উদ্ভট দৈহিক গড়নের অধিকারী। ভারতীয় পুরাণের বিখ্যাত মহর্ষি ও সংহিতাকার অষ্টাবক্রের নাম হতে বাংলা এ বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। মহর্ষি উদ্দালকের কাহোড় নামের এক শিষ্য ছিল। তিনি কাহোড়ের সঙ্গে নিজ কন্যা সুমতির (অন্য নাম সুজাতা) বিয়ে দেন। গর্ভবতী হওয়ার পর গর্ভস্থ বালক শ্রুতি দ্বারা সর্ববেদজ্ঞ হয়ে ওঠেন। গর্ভস্থ শিশু একদিন পিতা কাহোড়ের বেদপাঠ অশুদ্ধ বলায় কাহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে অভিশাপ দেন যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে যার স্বভাব এত বক্র, ভূমিষ্ঠ হলে তার দেহের অষ্ট স্থান বক্র হবে। অভিশাপমতে গর্ভস্থ শিশু অষ্টবক্রে বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়।

অসুর

বেদের প্রাচীন বর্ণনা মতে 'অসুর' অর্থ দেবতা। পারসিক আবেস্তায় যাদের বলা হয় 'আহুর'। দেবতা হিসাবে ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণকে অসুর বলা হতো। পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে এর অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। যারা দেবতার সঙ্গে বিরোধ করে, যারা সমুদ্রমন্থনে উত্থিত অমৃত পাননি—তারাই অসুর অভিহিত হয়। ঋগ্বেদের শেষে এবং অথর্ববেদে যারা দেবতা-বিরোধী এবং যাদের সুধা নেই—তারা অসুর হিসাবে চিহ্নিত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতির নিঃশ্বাস একবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস হতে অসুরদের সৃষ্টি। বিষ্ণুপুরাণ মতে ব্রহ্মার জঙ্ঘা হতে অসুরদের সৃষ্টি হয়েছিল। অসুরদের তিনটি ইন্দ্র হচ্ছে হিরণ্যকশিপু, বলি ও প্রহ্লাদ। যে সব অসুর দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হতেন তাঁরা পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে নানাপ্রকার বিপদ সৃষ্টি করতেন। দৈত্য, দানব এবং কশ্যপের বংশধরগণ এ শ্রেণির অসুর। ভারতীয় পুরাণ মতে, অসুর রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতীক। তাঁরা পূজা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ধ্বংস করতেন।

অস্ত্রশস্ত্র

এটি একটি বহুবচনাত্মক শব্দ। এর অর্থ—সমুদয় অস্ত্র, নানাবিধ অস্ত্র, সব রকমের অস্ত্র। অস্ত্র ও শস্ত্র দুটো আলাদা শব্দ। শব্দ-দুটোর মিলনে অস্ত্রশস্ত্র শব্দটির উৎপত্তি। অস্ত্র শব্দের অর্থ হলো এমন একটি যন্ত্র যা হাতে ধরে রেখে আঘাত করতে হয়। যেমন—তরবারি, গদা, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র। দ্বিতীয় শব্দটিও এককালে স্বাধীন শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। যেমন—শস্ত্রপাণ, তবে এখন শব্দটির স্বাধীন কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি অস্ত্র শব্দের পরে বসে অস্ত্রকে বহুবচনে পরিণত করেছে। অস্ত্র শব্দের অর্থ হাত দিয়ে আঘাতযোগ্য অস্ত্র হলেও তার সঙ্গে শস্ত্র শব্দ যুক্ত হওয়ায় তার অর্থ হয়েছে—সব ধরনের অস্ত্র।

অহংকার

'অহংকার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—গর্ব, বড়াই, অহমিকা, হামবড়ামি। সংস্কৃত এ শব্দটির সঙ্গে অহংকার, অহমিকা, অহমহমিকা প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ সমার্থক। মূলত সংস্কৃত 'অহমহমিকা' শব্দ হতে অহমিকা শব্দের উৎপত্তি। অহমহমিকা শব্দের অর্থ দুজনের মধ্যে পরস্পর আমিই বড়, আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই উত্তম—এমন হামবড়া ভাব ও অযৌক্তিক দাবি। সর্বক্ষণ নিজেকে বড় ভাবা এবং অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করাই হচ্ছে

অহংকার। যার মনে এমন বোধ ও চেতনা থাকে সে অহংকারী। অহংকার সর্বক্ষণ একজন মানুষকে আত্মশ্রেষ্ঠত্বে বিভোর রাখে বলে সে কখনো শান্তি পায় না। অহংকার নিয়ে বাংলা ভাষায় অনেক চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী কবিতা রয়েছে। 'কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে, ভাই বলে যদি ডাকো গলা দেব টিপে'; আনারস কাঁঠালকে বলে তুমি বড় খসখসে; ছালুনি বলে সুঁই, তোমার মাথায় ছ্যাঁদা। এগুলো সব অহংকারীর স্বভাব-প্রকাশক উক্তি।

অহিনকুল

শব্দটির অর্থ—চিরশত্রুতা, চিরস্থায়ী শত্রুতা। অহি শব্দের অর্থ সাপ, নকুল শব্দের অর্থ বেজি। প্রাণিকুলে সাপ ও বেজি পরস্পর চিরশত্রু। প্রাণিকুলের মতো মানুষের মাঝেও পরস্পর শত্রুতা বোঝানোর জন্য অহিনকুল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাপ ও বেজির মধ্যে শত্রুতা মেনে নেওয়া যায়, কারণ তারা প্রাণিকুলের ভিন্ন দুটি জাত। কিন্তু প্রাণিকুলের অভিন্ন জাত হয়েও মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতা মেনে নেওয়া যায় না। হয়তো এজন্যই পশুর ওপরে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আ

আঁতাত

'আঁতাত' শব্দের অর্থ—গোপন কর্মে সহযোগিতার সম্পর্ক, পরস্পর বন্ধুত্ব, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদ্ভাব প্রভৃতি। তবে ইদানীং শব্দটি বিরোধীপক্ষের সঙ্গে অন্য কোনো পক্ষের গোপন-সম্পর্ক বোঝাতে নেতিবাচক অর্থে অধিক ব্যবহার হতে দেখা যা। যেমন—সরকার জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত করেছে। বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত আঁতাত শব্দটি কিন্তু বাংলা নয়, ফরাসি। ফরাসি (Entente) শব্দের অর্থ এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সদ্ভাব ও সহযোগিতামূলক অবস্থান। এর উচ্চারণও অনেকটা বাংলা 'আঁতাত' শব্দের ন্যায়। মেহমান হিসেবে ফরাসি হতে এলেও আঁতাত এখন ঘরজামাইয়ের ন্যায় বাংলায় স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছে। বাংলায় শব্দটি কিন্তু গোপন কর্মে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রকাশে রাজনীতিক ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত। এখন তো রাজনীতির মাঠে আঁতাত ছাড়া কোনো বক্তৃতাই হয় না। সরকারের বা বিরোধী দলের কোনো নেতিবাচক দিক তুলে ধরতে এ শব্দটির বিকল্প খুব কমই আছে।

আক্কেল গুড়ুম

'আক্কেল গুড়ুম' বাগভঙ্গির আভিধানিক অর্থ—কিংকর্তব্যবিমূঢ়, জ্ঞান লোপ পাওয়া প্রভৃতি। কামান থেকে গোলা যেমন হঠাৎ গুড়ুম শব্দে উড়ে যায় তেমনি বিপাকে পড়লে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধিও কামানের গোলার মতো গুড়ুম শব্দে মাথা থেকে উড়ে যায়। তবে এ গুড়ুম সবাই শুনতে পায় না। যার মাথা থেকে উড়ে যায় সে বুঝতে পারে—কী হয়েছে, কী না-হয়েছে। এরূপ অবস্থাটাই মানুষের 'আক্কেল গুড়ুম' অবস্থা। মানুষের 'আক্কেল গুড়ুম' অবস্থা সব সময় হয় না। এটি তখনই হয় যখন মানুষ কোনো বিশেষ কথা বা সংবাদ শোনার জন্য বা বিশেষ কিছু দেখার জন্য মোটেও প্রস্তুত থাকে না অথচ সেটিই শুনতে হয়।

আক্ষেপ

'আক্ষেপ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—অনুতাপ, অনুশোচনা, বিলাপ, খেদ, অনুতপ্ত হওয়া ইত্যাদি। 'আক্ষেপ' সংস্কৃত হতে আগত বাংলা ভাষার একটি শব্দাতিথি। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ—ভর্ৎসনা, তিরস্কার, নিন্দা, দোষদ্ঘাটন, বদনাম প্রভৃতি। বিহ্বলতা, ব্যাকুলতা, অতি আবেগ প্রভৃতিও আক্ষেপ শব্দের প্রতিশব্দ। সংস্কৃত হতে বাংলায় আসার পর শব্দটি অন্যান্য অনেক শব্দের ন্যায় নিজের পরিচয় কিছুটা বিসর্জন দিয়ে বসেছে। ঠিক শ্বশুরবাড়ির বউয়ের মতো। মানুষ শুধু অন্যের সমালোচনা করে না, অনেক সময় নিজের সমালোচনাতেও অধীর হয়ে ওঠে। অবশ্য এমন সমালোচনা হয় নিজে নিজে, অন্তরের ভেতর নিজস্ব জগতে। কোনো কারণে মানুষ যদি কোনো ভুল বা ক্ষতিকর কিছু করে বসে বা কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায় তখন মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। তার ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় হয়ে যায় হতবিহ্বল। এ অবস্থায় মানুষ নিজে নিজেকে ধিক্কার দেয়। কেন এ কাজটা করল, কেন এমন ঘটল; হয়তো এ কাজটা না-করলে এমন ঘটত না—প্রভৃতি প্রশ্ন তার মনে অনুতপ্ত-আবেগের জোয়ার তুলে দেয়। এ অনুতাপই মূলত 'আক্ষেপ'। এ বিবেচনায় সংস্কৃত 'আক্ষেপ' আর বাংলা আক্ষেপের পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

আখড়া

শব্দটির অর্থ গান-বাজনা শেখার স্থানবিশেষ, মল্লবিদ্যা প্রশিক্ষণের স্থান, আড্ডা, বাউলদের আশ্রম ইত্যাদি। সংস্কৃত 'অক্ষবাট' শব্দ থেকে আখড়া শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃতে অক্ষবাট শব্দের অর্থ—অক্ষ বা পাশাখেলার

আড্ডা। মূলত জুয়ার আড্ডাকে একসময় আখড়া বলা হতো। কারণ পণ রেখেই সেকালে পাশাখেলা হতো। সংস্কৃত অক্ষবাট বাংলায় কিছুটা নাম পরিবর্তন করে আখড়া হয়ে আসার পর অর্থেরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আখড়া বলতে আর যাই বোঝানো হোক, জুয়ার আড্ডা বোঝায় না। অবশ্য আউল-বাউলদের আশ্রমকেও আখড়া বলা হয়। এখানে জুয়া চলে না, তবে গাঁজা চলে। 'শনির আখড়া' নামে পরিচিত ঢাকা শহরের জায়গাটি একসময় গান-বাজনা ও আউল-বাউলদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

আগ্নেয়

দেবসেনাপতি কার্তিকেয় অগ্নিসম্ভূত ছিলেন। তাই তিনি অগ্নিজ ও আগ্নেয় নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যদিকে, অগ্নিসম্ভূত অঙ্গিরারাও আগ্নেয় নামে অভিহিত হতেন।

আগ্নেয়াস্ত্র

অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্যকে ভরদ্বাজ একটি মহামূল্যবান ও অত্যন্ত কার্যকর একটি অস্ত্র দিয়েছিলেন। এ অস্ত্রটি আগ্নেয়াস্ত্র নামে পরিচিত। অবশ্য সে অস্ত্র দিয়ে অগ্নি নির্গত হতো না। অগ্নিবেশ্য এ অস্ত্র দ্রোণকে প্রদান করেছিলেন। তাই এর নাম আগ্নেয়াস্ত্র। পরবর্তীকালে দ্রোণের নিকট থেকে অর্জুন এ অস্ত্র লাভ করেন। ভারতীয় পুরাণে এ অস্ত্রটি ছিল শত্রুর বিপক্ষে অত্যন্ত কার্যকর। এ অস্ত্রের নামানুসারে বাংলায় আধুনিক অস্ত্রকে কার্যকারিতার সঙ্গে তুলনা করে আগ্নেয়াস্ত্র বলা হয়।

আটঘাট

তবলার আটঘাট থেকে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'আটঘাট' শব্দের উৎপত্তি। তবলার প্রতিটি ঘুঁটির ওপর চামড়ার যে দুটি ফিতা বা চ্যাপ্টা দড়ি থাকে তার মাঝের অংশকে ঘাট বলা হয়। তবলায় মোট ঘাট আটটি। তবলা বাজানোর পূর্বে ঘুঁটির উপর হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে ঘাটগুলো যত্নসহকারে খুব গভীরভাবে যাচাই করে বেঁধে নিতে হয়। নইলে তবলার আওয়াজ শুদ্ধ হয় না। তবলা বাজানোর আগে প্রয়োজনীয় এ সাংগীতিক প্রস্তুতি তবলা থেকে বেরিয়ে বাংলা ভাষায় ঢুকে পড়েছে। এখন 'আটঘাট' বলতে তবলার কথা কারও মনে হয় না। মনে কোনো কিছু সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে কিংবা সব বাধা দূর হয়েছে।

আড়ম্বর

'আড়ম্বর' শব্দের আভিধানিক অর্থ—জাঁকজমক, জমকালো, বাহুল্য, সমারোহ, আকর্ষণীয়, শানশওকত, আতিশয্য প্রভৃতি। তবে আড়ম্বর শব্দের মূল ও আদি অর্থ হচ্ছে—তূর্যধ্বনি, হাতির ডাক, রণবাদ্য, গর্জন, মেঘের ডাক প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় ব্যবহার-পরিক্রমায় শব্দটি ধীরে ধীরে আগের অর্থ হারিয়ে নতুন অর্থ ধারণ করেছে। যেকোনো বড় ও শানশওকতময় কাজে একসময় তূর্যধ্বনি, হাতির ডাক, রণবাদ্য প্রভৃতির ব্যাপক আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও বিস্তৃতির সঙ্গে এ বিষয়গুলোর ব্যাপকতার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। শুধু প্রাচীনকাল নয়, এখনও বিভিন্ন দেশে জাতীয় দিবস পালনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনকালে কিংবা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনে তোপধ্বনি করা হয়। অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাদ্যর আয়োজন থাকে। সে অর্থে আড়ম্বর শব্দের বাহ্যিক অর্থ পরিবর্তন হলেও অন্তর্নিহিত অর্থ একটুও ক্ষুণ্ন হয়নি।

আততায়ী

'আততায়ী' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—হননকারী, আক্রমণকারী, শত্রু। সংস্কৃত ভাষায় আততায়ী কে বা কারা তা সুনির্দিষ্ট করা আছে কিন্তু বাংলা ভাষায় আততায়ীর পরিচয় সুনির্দিষ্ট নেই। যে কেউ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'আততায়ী' শব্দের আততায়ী হতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় আততায়ী ছয় প্রকার। যথা গৃহে অগ্নিদাতা,

বিষপ্রয়োগকারী, প্রাণহরণকারী, ধনাপহারক, ভূমিদস্যু এবং স্ত্রী-অপরহণকারী। এছাড়াও সংস্কৃতে আরও একজন আততায়ীর কথা বলা হয়। সেটি হচ্ছে রাজা কিংবা ক্ষমতাবানের নিকট কুৎসাকারী। কিন্তু বাংলা ভাষায় আততায়ীর এরূপ কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা বা রূপ নির্ধারণ করা নেই। তবে অজ্ঞাত হত্যাকারী বোঝাতে শব্দটি পত্রপত্রিকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। বস্তুত বাংলা ভাষায় আততায়ী শব্দটি কেবল প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে আক্রমণকারী বা আঘাতকারীর পরিচয় প্রকাশে ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃতের মতো বাকিগুলো বাংলায় 'আততায়ী' হিসাবে ব্যবহারের কোনো নজির নেই।

আত্মসাৎ

'আত্মসাৎ' একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। অসদুপায়ে ধনসম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া বা অন্যায়ভাবে কোনো সম্পত্তি নিজের আয়ত্ত বা হস্তগত করা প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 'আত্ম' ও 'সাৎ' শব্দ মিলে আত্মসাৎ। 'আত্ম' শব্দের অর্থ নিজ। আত্মসাৎ শব্দের আদি ও মূল অর্থ ছিল—নিজের অধীন, স্বায়ত্ত, স্বীয় আশ্রিত বা ভক্ত। মধ্যযুগেও শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে 'আত্মসাৎ' বলতে ভক্ত বা শিষ্য বোঝানো হয়েছে। চৈতন্যভাগবত কাব্যে কবি লিখেছেন শ্রীচৈতন্য ভক্তি ও প্রেম দিয়ে বহু দুর্জনকে আত্মসাৎ করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য এক প্রবল শত্রুকে বশীভূত করেন। সে প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন 'আত্মসাৎ করি তারে কৈল আলিঙ্গন'। কিন্তু এখন শব্দটি আগের সে শালীন ও ইতিবাচক অর্থ হারিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ ধারণ করেছে। এটাই ভাষা-স্রোতে আবর্তিত শব্দের ভাগ্য। শ্রীচৈতন্য হাজার হাজার লোককে আত্মসাৎ করেছেন। তৎকালে বাক্যটির অর্থ ছিল—শ্রীচৈতন্য লক্ষ লক্ষ লোককে নিজের ভক্তি, প্রেম ও দরদ দিয়ে নিজের ভক্ত করে নিয়েছেন। এখন বাক্যটির অর্থ হয়েছে—শ্রীচৈতন্য লক্ষ লক্ষ লোককে জোরপূর্বক অপহরণ করেছেন। দেখুন, শব্দের অর্থ কীভাবে বদলায় নদীর মতো, মনের মতো।

আদর্শ

'আদর্শ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—নমুনা, দৃষ্টান্ত, অনুকরণীয় বিষয় প্রভৃতি। যা অনুকরণযোগ্য, শ্রেষ্ঠ, সর্বজনীন হিসেবে উদাহরণ টানা যায়, অধিকাংশ লোকের গ্রহণযোগ্য, দৃষ্টান্ত ও নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করা যায় তা-ই আদর্শ। 'আদর্শ' শব্দের মূল অর্থ ছিল—আয়না, আরশি। সংস্কৃত আদর্শ তথা আয়না বা আরশি বাংলায় এসে দৃষ্টান্ত, শ্রেষ্ঠ বা অনুকরণযোগ্য হয়ে পড়েছে। আয়নায় নিজেকে দেখা যায়। মানুষ প্রকৃতপক্ষে নিজের চেয়ে কাউকে শ্রেষ্ঠ ভাবে না। নিজের অনেক দোষ ত্রুটি কিংবা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সে কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবে, নিজের কল্যাণ চায়, নিজেকে নিজের মধ্যে অনুকরণ করে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখতে চায়। আয়নায় সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে কেবল নিজেকে নিয়ে চিন্তায় মেতে ওঠে। ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিজেই নিজের আদর্শ। এ আদর্শ বিম্বিত হয় আরশিতে। তাই সংস্কৃত আয়না (আদর্শ) বাংলায় এসে দৃষ্টান্ত, নমুনা, অনুকরণীয় প্রভৃতি রূপ ধারণ করেছে।

আদায়-কাঁচকলায়

পরস্পর দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক প্রকাশের ক্ষেত্রে উপমাস্বরূপ 'আদায়-কাঁচকলায়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রমতে আদার গুণ হলো রেচন ও কাঁচকলার গুণ হলো ধারণ। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য হলে খেতে হয় আদা কিন্তু উদরাময় রোগে খেতে হয় কাঁচকলা। অধিকন্তু আদা যদি কাঁচকলার তরকারিতে পড়ে, তো কাঁচকলা আর সহজে সেদ্ধ হয় না। একটি অন্যটির বিপরীত কার্য করে। বস্তুত আদা ও কাঁচকলার পরস্পর বিপরীত এ গুণ হতে শব্দটির উৎপত্তি।

আদিপুরাণ
এটি প্রথম পুরাণ নামে পরিচিত। সাধারণ্যে এটি ব্রহ্মপুরাণ নামে সমধিক পরিচিত।

আধিব্যাধি
'আধিব্যাধি' শব্দটির অর্থ—রোগ-শোক, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, সাংঘাতিক বিমার প্রভৃতি। আধি ও ব্যাধি শব্দের সংযোগে 'আধিব্যাধি' শব্দটা গঠিত হয়েছে। ব্যাধি শব্দের পৃথক ব্যবহার বাংলা ভাষায় রয়েছে কিন্তু আধি শব্দের পৃথক ও স্বাধীন ব্যবহার এখন আর দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় ব্যাধির আগে আধি শব্দটি কোনো রকমে নিজের ঠাঁই এখনও অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। 'আধি' শব্দের মূল আভিধানিক অর্থ—মানসিক রোগ এবং 'ব্যাধি' শব্দের মূল ও আভিধানিক অর্থ শারীরিক রোগ। অতএব আধিব্যাধি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় মানসিক ও শারীরিক রোগ। এ অনুষঙ্গে 'আধিব্যাধি' শব্দ মানসিক ও শারীরিক কষ্টকে প্রকাশ করে। শুধু শারীরিক ও মানসিক অসুবিধা নয়, মানুষের বিপদসংকুল ও কষ্টকর বিষয় বোঝাতেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অবশ্য যেকোনো বিপদ ও কষ্টে মানুষের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকে না।

আনসার
'আনসার' আমাদের দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিবেদিত বাহিনী বিশেষের নাম। শব্দটি মূলত আরবি 'নাসির' শব্দের বহুবচন। নাসির অর্থ সাহায্যকারী। হিজরতের পর মুহাজিরদের সাহায্যকারী মদিনাবাসী সাহাবাগণ ইতিহাসে 'আনসার' নামে পরিচিত। আমাদের বাংলাদেশে 'আনসার' নামে পরিচিত বাহিনী নিরাপত্তা বাহিনীকে সহায়তা করে থাকে। তাই এ বাহিনীর নাম রাখা হয়েছে আনসার। শব্দটি পবিত্র কুরআনে অন্তত পাঁচ জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে।

আন্দোলন
'আন্দোলন' শব্দের আভিধানিক অর্থ—বিক্ষোভ, আলোড়ন, কোনো লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সম্মিলিত প্রচার বা উত্তেজনা সৃষ্টি, সহিংস দাবিদাওয়া উপস্থাপন প্রভৃতি। তবে বাংলায় এখন শব্দটি 'বিক্ষোভ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে সমধিক ব্যবহৃত। পঞ্চাশ বছর আগেও আন্দোলন শব্দের অর্থ ছিল দোলায়মান, কম্পন, পুনঃপুন, দোলিত, কম্পিত প্রভৃতি। পাতার আন্দোলন শত শত পুস্তকে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলসহ তৎকালীন কবি-সাহিত্যিকগণের লেখায় ব্যবহৃত আন্দোলন শব্দের দিকে তাকালে কেবল দোলায়মান, কম্পন, পুনঃপুন, দোলিত, কম্পিত প্রভৃতি অর্থই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হলে কেন এ পরিবর্তন? আন্দোলন হলে লতাপাতা বা সবুজ বনানীর মতো জনজীবনেও ভয় বা প্রত্যাশার কারণে কম্পনের সৃষ্টি হয়। হয়তো এজন্য শব্দটি তার প্রাচীন অর্থ বিসর্জন দিয়ে নতুন অর্থ ধারণ করেছে। ইদানীং শহরে, এমনকি অনেক গ্রামেও বনবনানী নেই বললেই চলে। হয়তো নিজেকে রক্ষার জন্য 'আন্দোলন' শব্দটি বনবনানীর কম্পমান দোলা ছেড়ে দিয়ে তপ্ত রাজনীতির আন্দোলনে শামিল হয়ে শহরবাসী হয়ে গিয়েছে।

আপামর/পামর থেকে আপামর
'পামর' থেকে 'আপামর'। 'আপামর' শব্দটি সর্বসাধারণ বোঝাতে ইদানীং হরদম ব্যবহার করা হচ্ছে। বহুল ব্যবহারের কারণে শব্দটা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর আসল অর্থ অনেকের অজানা। 'পামর' শব্দের অর্থ নরাধম, পাপী, মূর্খ, নীচ, নিষ্ঠুর, জঘন্য ইত্যাদি। এ 'পামর' শব্দ থেকে 'আপামর' শব্দের উদ্ভব। অতএব আপামর শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ সাধারণ জনগণ বা 'সর্বসাধারণ' নয়। কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থ যা-ই হোক, আপামর শব্দটি বর্তমানে সর্বসাধারণ প্রকাশে বহুল প্রচলিত একটি জনপ্রিয় শব্দ। এভাবে শব্দের, শব্দের অর্থের

রূপান্তর ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এমন দেখা যায়। আপামর শব্দের আসল কিংবা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী, তা এখন আর বিবেচনার সুযোগ নেই। 'আপামর' বলতে এখন আমরা 'সর্বসাধারণ'ই বুঝে থাকি।

আফ্রিদি

'আফ্রিদি' মোগল ও ব্রিটিশ শাসনের শেষ যুগে ভারত-আফগানিস্তান সীমান্তে বসবাসকারী যুদ্ধপ্রিয় একটি উগ্র উপজাতিবিশেষ। আবার আফ্রোদিতি, Aphrodite হচ্ছে গ্রিকদের প্রেমের দেবী। রোমানদের প্রেমের দেবী Venus. গ্রিকদের প্রেমের দেবী কীভাবে উপমহাদেশে এসে যুদ্ধপ্রিয় একটি জাতির নাম ধারণ করল? আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের সঙ্গে এ নামের সম্পর্ক আছে। যুদ্ধ আর প্রেম মূলত অভিন্ন সূত্রে গাঁথা একটি ভিন্ন প্রত্যয়। প্রেমের জন্য যুদ্ধ হয়, প্রেম ছাড়া কোনো যুদ্ধ কোনো কালে বিশ্বে সংঘটিত হয়নি। হোক-না তা নারীর জন্য, ভূমি, সম্পদ বা ধর্মের জন্য। ধর্মপ্রেমীরা ধর্মের জন্য, দেশপ্রেমীরা দেশের জন্য আর সম্পদপ্রেমীরা সম্পদের জন্য যুদ্ধ করে। গ্রিক পুরাণে নারী হেলেনের জন্য কী অঘটন ঘটেছিল তা কম-বেশি আমাদের জানা আছে। প্রতিনিয়ত যে যুদ্ধ, হানাহানি বা রক্তারক্তি হচ্ছে তার মূলে রয়েছে প্রেম। যেমন—দলপ্রেম, ভূমিপ্রেম, ক্ষমতাপ্রেম, নারীপ্রেম, পুরুষপ্রেম ইত্যাদি।

আবর্জনা

'আবর্জনা' শব্দের প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ—ময়লা, জঞ্জাল প্রভৃতি। সংস্কৃত 'আবর্জন' শব্দ হতে বাংলা 'আবর্জনা' শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ ছিল ত্যাগ করা, নত হওয়া, দান করা প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় এসে শব্দটি এসব সুখকর অর্থ হারিয়ে নোংরা, ময়লা, জঞ্জাল প্রভৃতি অর্থ ধারণ করেছে। এর কারণ রয়েছে। আবর্জনা ত্যাগ করতে হয়, ফেলে দিতে হয়, অতি সুচারুভাবে এর ব্যবস্থাপনা করতে হয়। দান করা, ত্যাগ করা যেমন মহৎ তেমনি নোংরা, জঞ্জাল প্রভৃতি বিচক্ষণতার সঙ্গে ত্যাগ করা আরও মহৎ। কেউ ধনসম্পদ ত্যাগ না-করলেও বাঁচতে পারে কিন্তু ময়লা এমন একটা জিনিস যা খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে ত্যাগ না-করলে মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই সংস্কৃত 'আবর্জন' বাংলায় অতিথি হয়ে পূর্বতন অর্থ হারালেও আরও চমৎকার অর্থে সম্পূরক ভাষ্যে 'আবর্জনা' নাম নিয়ে কাজের মতো কাজ করেছে।

আমজনতা

'আমজনতা' শব্দটিকে অনেকে রসিকতা করে বলেন 'ম্যাঙ্গো পিপল'। এখানে মূল শব্দটি হচ্ছে 'জনতা'। 'আম' হচ্ছে উপসর্গ। এটি বিদেশি উপসর্গ; আরও পরিষ্কার করে বললে আরবি উপসর্গ। 'জনতা' শব্দের আগে 'আম' উপসর্গ যুক্ত হয়ে যে অর্থ প্রকাশ করে তা হচ্ছে, সাধারণ জনতা। তেমনি আরও শব্দ—আমদরবার, আমমোক্তার। 'আম' বাংলায় উপসর্গ হলেও আরবিতে মূল শব্দ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। عام অর্থ সাধারণ। বহুবচনে 'আওয়াম', ইয়া প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এটি অর্থকে আরও সুনির্দিষ্ট করে দেয়। ইয়া 'আমি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো জাতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন—'সাউদিয়া' শব্দ দিয়ে একটি জাতি বোঝায়, এখানে 'সাউদ' শব্দের সঙ্গে 'ইয়া' যুক্ত হয়েছে। তেমনি ইয়েমেনি, আমরিকি, আওয়ামি প্রভৃতি আওয়ামকে আরও মজবুত করেছে।

আমদানি-রফতানি

পণ্যাদি বিদেশ থেকে আনা এবং স্বদেশ থেকে বিদেশে প্রেরণ অর্থে আমদানি-রফতানি বাগভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়। আমদানি ও রফতানি শব্দ দুটো মিলিত হয়ে আমদানি-রফতানি শব্দ গঠিত হয়েছে। এটি একটি দ্বন্দ্বসমাসজাত পদ। তবে আমদানি ও রফতানি দুটোই ফারসি শব্দ। আমাদান থেকে আমাদানি। ফারসি 'আমাদানি' শব্দ বাংলায় এসে হয়েছে 'আমদানি'। 'আমাদান' শব্দের অর্থ আসা এবং 'আমাদানি' শব্দের অর্থ

আসার যোগ্য। রাফতান থেকে রাফতানি। ফারসি 'রাফতানি' শব্দ বাংলায় এসে হয়েছে 'রফতানি'। রাফতান শব্দের অর্থ যাওয়া এবং রাফতানি শব্দের অর্থ যাওয়ার যোগ্য। ফারসি শব্দ দুটোর অর্থ সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলায় যা আমদানি ফারসিতে তা 'ওয়ারেদাত' আবার বাংলায় যা রফতানি, ফারসিতে তা 'সাদেরাত'।

আমন্ত্রণ/নিমন্ত্রণ

আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ এই দুই শব্দের অর্থ বিষয়ে কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর বর্ণভিত্তিক-ক্রিয়াভিত্তিক অর্থকে আর একটু খোলসা করে সুস্পষ্টতা প্রদান করা যায়। আজকাল ইংরেজির প্রভাবে প্রতীকী প্রথায় 'আমন্ত্রণ' = Invitation এবং নিমন্ত্রণ = Invitation; অর্থাৎ দুটো বাংলা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ 'বর্ণভিত্তিক-ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি' অনুযায়ী এই শব্দ দুটোর অর্থভেদ ছিল। ইংরেজির প্রভাবে শব্দ দুটোর বাকি অর্থগুলো হারিয়ে শুধু Invitation (ভোজনার্থ আহ্বান)-এ পরিণত হয়েছে। আগে তা ছিল না। 'মন্ত্রণা' করার জন্য ডাকলে সে-ডাককে বলা হতো 'আমন্ত্রণ' এবং 'মন্ত্র' দেওয়ার জন্য ডাকলে, তাকে বলা হতো 'নিমন্ত্রণ'। 'আমন্ত্রণে' 'মন্ত্রের' আয়োজন ছিল, 'নিমন্ত্রণে' মন্ত্রের নিয়োজন ছিল। এ কালের মতো করে বললে বলতে হয়,—মন্ত্রী যখন জেলায় জেলায় বন্যা-পরিস্থিতি বিষয়ে 'মন্ত্রণা' করার জন্য জেলাপ্রশাসকদের ডেকে পাঠান, সেটি 'আমন্ত্রণ'। কিন্তু যখন বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপায় বা 'মন্ত্র' তিনি নিজেই ঠিক করে রেখেছেন, সেটি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জেলাপ্রশাসকদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যদি তিনি তাঁদের ডেকে পাঠান, সেটি 'নিমন্ত্রণ'। তবে এখন আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ শব্দের সে আদি অর্থ আর নেই।

নিমন্ত্রণ শব্দের আভিধানিক অর্থ—দাওয়াত, ভোজনের আহ্বান, কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আহ্বান বা আমন্ত্রণ। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর বঙ্গীয় শব্দার্থকোষেও উভয় শব্দের উৎস অভিন্ন ক্রিয়ামূল (মন) নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অভিধানে নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণ শব্দের অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। তবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনির্ধারিত কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন, যে দাওয়াতে বা যে আহ্বানে আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে ভূরিভোজের ব্যবস্থা থাকে তাকে নিমন্ত্রণ এবং যেখানে আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে সাধারণত ভোজের ব্যবস্থা থাকে না তাকে আমন্ত্রণ বলে। এ ব্যাখ্যা কিয়দংশ ঠিক হলেও পুরোপুরি ঠিক নয়। সাধারণত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে ছোটখাটো সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্যান্য বিশেষ উৎসবসমূহে অভ্যাগতদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে 'নিমন্ত্রণ' শব্দটির অধিক ব্যবহার দেখা যায়। এ সকল দাওয়াতে সাধারণত ভূরিভোজের ব্যবস্থা থাকে। অন্যদিকে বড় আকারের রাজনীতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াতের বেলায় 'আমন্ত্রণ' শব্দটির অধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে এখানেও অনেক সময় ভূরিভোজের ব্যবস্থা না হলেও হালকা ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে অনেক বড় আকারের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানসমূহেও ভূরিভোজের ব্যবস্থা থাকে। নিমন্ত্রণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অভ্যাগতরা সাধারণত বিভিন্ন রকমের উপহার সামগ্রী নিয়ে আসেন কিন্তু আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাধারণত উপহার আনার রেওয়াজ নেই। আনা হলেও তাতে ব্যক্তি-উদ্যোগের চেয়ে সমষ্টিগত বা আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ অধিক পরিলক্ষিত। নিমন্ত্রিত অতিথিদেরকে আমন্ত্রিত অতিথিও বলা যায়। আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে উপহার দেওয়া হয় অনেক সময়। যেমন—কোনো কোনো রাজনীতিক, রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়। প্রয়োগ (১) আলোচনা শেষ হওয়ার পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে চা-পানের আমন্ত্রণ জানালেন। (২) রশিদ সাহেবের মেয়ের বিয়েতে জামান সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হয়নি। (৩) শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

আমলা

সংস্কৃত আমলক > প্রাকৃত -আমলা > বাংলা -আমলা; এর অর্থ আমলকী গাছ, আমলকী, সরকারি কর্মচারী, মুহুরি, কেরানি প্রভৃতি। শব্দটি বর্তমানে bureaucrat অর্থে সমধিক প্রচলিত। অনেকে বলেন, 'আমলা' আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে, যার অর্থ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, কেরানি, মুহুরি ইত্যাদি। কিন্তু 'বেদ'-এ আমলা শব্দটি রয়েছে। প্রাচীন অভিধানসমূহে 'আমলা' অর্থ বানর ও 'বানর' অর্থে আমলা বলা আছে। সুতরাং বাংলায় ব্যবহৃত 'আমলা' আরবি শব্দ এটি ঠিক নয়। আসলে 'আমলা' অর্থ বানর। তবে আধুনিক অভিধানকারদের এটা পছন্দ হয়নি। তাই তাঁরা তাঁদের অভিধান থেকে হয় শব্দটি বাদ দিয়েছেন এবং শব্দটিকে আরব থেকে আমদানি দেখিয়ে জাতে তুলে এর বর্তমানে প্রচলিত অর্থটি দিয়েছেন। কারণ ইংরেজ আগমনের আগে আরবীয় যেকোনো বিষয় ছিল মর্যাদপূর্ণ।

এবার দেখা যাক, আমলা অর্থ কেন বানর এবং কেন আমলকী। প্রাচীনকালেও অধিকাংশ আমলা স্বভাবচরিত্র ও আচার-আচরণে বানরের মতো নির্লজ্জ, ধূর্ত, বেহায়া ও সংকীর্ণ মনের অধিকারী ছিল। বানরের ন্যায় আমলারাও ছিল অদূরদর্শী। পরিপক্ব বা পুষ্ট হওয়ার আগে ফসলের খেতে হানা দিত। যত খেত তার সহস্রগুণ বেশি নষ্ট করে দিত। ভালো মন্দ বিবেচনাবোধ ছিল না, শুধু নিজের চিন্তা করত; এ থেকে 'বানরের পিঠাভাগ' প্রবাদটির উৎপত্তি। বানরের ন্যায় আমলারাও ফল হওয়ার আগে মুকুলগুলো খেয়ে ধ্বংস করে দিত। অধিকন্তু কয়েক দিনের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়ে বাপের সম্পত্তি মনে করে বসত। যা থেকে 'বানরের বনভাগ' প্রবাদটির উৎপত্তি। আমলাদের স্বাদ আমলকীর ন্যায় তিক্ত কিন্তু চিবিয়ে রস বের করে নিয়ে খেতে পারলে শরীরের উপকার হয়। এ জন্য আমলাদের যত চাপে রাখা যায় দেশের ও জাতির তত কল্যাণ সাধিত হয়। তাই আমলা অর্থে আমলকীও বোঝায়। এর মানে আমলা থেকে উপকার পাওয়া যাবে যদি তাদের প্রচণ্ড শাসনে ও চাপে রাখা হয়। তাদের কোনো স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। তা হলে বানরের ন্যায় আচরণ করবে। 'আমলা-কেশ-তৈল' এর সঙ্গেও আমলার সম্পর্ক রয়েছে। আমলাকে পিষে এ তেল তৈরি করা হয়।

'আমার কথা ফুরালো/নটে গাছটি মুড়ালো'

এককালে দাদি-নানি, মহিলা মুরব্বি বা কাজের মহিলা (তৎকালে গৃহস্থ বাড়িতে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের একটা মর্যাদা ছিল, বর্তমানকালের মতো এত অবহেলা করা হতো না।) মাছ-মাংস, তরি-তরকারি বা শাকসবজি কুটতে কুটতে শিশুদের তাঁরা গল্প শোনাতেন; বা গল্প শুনিয়ে তাদের শান্ত রাখতে হতো। তরকারির মধ্যে সাধারণত শাকটি সবার শেষে কুটার জন্য নেওয়া হতো। সেকালে নটে শাক ছিল যেমন সহজলভ্য, তেমনি উপাদেয়। প্রায়বেলা প্রত্যেক সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে এ শাকটি রান্না করা হতো। এমন অনেক সময় ঘটত যে, তরকারি কুটা শেষ হয়েছে কিন্তু গল্পটি শেষ হয়নি বা একটি গল্প শেষ হলেও শিশুরা আরও একটি নতুন গল্প বলার জন্য বায়না ধরেছে অথবা তরকারি কুটা শেষ হওয়ার আগে গাল্পিকের গল্প বলার ইচ্ছা বা স্মৃতি আর সাড়া দিচ্ছে না। তখন বলা হতো, আমার শাক কুটা শেষ অর্থাৎ কাজ শেষ, তাই গল্পও শেষ। 'নটে গাছটি মুড়ালো' মানে নটে গাছ থেকে পাতা (শাক) নিয়ে গাছটিকে পাতাশূন্য (মুড়া) করে ফেলা; অর্থাৎ শাক কুটা শেষ হয়েছে। বস্তুত 'নটে গাছটি মুড়ালো' বাগভঙ্গিটি এখানে কার্যক্ষেত্র থেকে প্রতীকী অর্থে নিয়ে আসা হয়েছে। এর অর্থ—বসে বসে কাজের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের গল্প শুনানোর সুযোগ আর নেই। কারণ নটে শাক কুটাও শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আর গল্প শোনানোর কোনো সুযোগ নেই। তাকে অন্য কাজে যেতে হবে। এ প্রাচীন রেওয়াজ থেকে প্রবাদটি সৃষ্টি হয়েছে। এর আর একটি উৎসার্থ আছে। সেটি হলো তরকারি কুটা শেষ হয়েছে, মানে আমার ঝুড়িতে আর গল্প নেই বা আমার গল্প বলার ইচ্ছেও নেই এবং বাচ্চাদেরকেও আর গল্প শোনানো ঠিক হবে না। এখন পড়ার বা ঘুমানোর সময়। অতএব গল্প শেষ।

আয়তন

‘আয়তন’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—ক্ষেত্রমান, প্রস্থ, বিস্তার প্রভৃতি। কোনো বস্তু বা ভূমি কতটুকু পরিমাণ স্থান অধিকার করে আছে সেটিই ওই বস্তু বা স্থানের আয়তন। পৃথিবীর আয়তন কত তা আমরা জানি, বাংলাদেশের আয়তনও পরিমাপ করা আছে। এর মানে বাংলাদেশ যতটুক স্থানব্যাপী বিস্তৃত ততটুকু বাংলাদেশের আয়তন। আয়তন শব্দের মূল অর্থ ছিল দৈবস্থান, মন্দির, যজ্ঞগৃহ। এর থেকে গৌণার্থে শব্দটিকে গৃহ, বাস্তুভূমি, ভিটা প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এখন শব্দটি শুধু ক্ষেত্রমান, প্রস্থ বা বিস্তার প্রকাশে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তুভূমি, ভিটি, গৃহ প্রভৃতি আয়তনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। যেখানে বাস্তুভিটা বা গৃহ সেখানে আয়তন অনিবার্যভাবে এসে যায়। তাই সংস্কৃত ‘আয়তন’ বাংলায় এসে অর্থ পরিবর্তন করলেও মন বা হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অনুভূতির কোনো পরিবর্তন করেনি।

আয়ুর্বেদ

‘আয়ুর্বেদ’ অতি প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র। এটি অথর্ববেদের অন্তর্গত। কারণব্যূহ অনুসারে এটি ঋক্বেদের উপবেদ। এটাকে পঞ্চম বেদও বলা হয়। প্রজাপতি চার বেদ হতে স্বতন্ত্র পঞ্চম বেদ নামে অভিহিত ‘আয়ুর্বেদ’ রচনা করেন। পরবর্তীকালে এটি আরও পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়। শল্য, শলাকা, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র—এ আটভাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিভক্ত। এটাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিগ্রন্থসমূহের অন্যতম বলা হয়। একসময় আয়ুর্বেদশাস্ত্রই ছিল চিকিৎসার মূল ভিত্তি।

আরণ্যক

বেদের উপসংহার ভাগ ব্রাহ্মণ। এ ব্রাহ্মণের উপসংহার ভাগ হচ্ছে ‘আরণ্যক’। ব্রহ্মচর্য গ্রহণকালে অরণ্যাশ্রমে বাস করাকালীন গুরুর নিকট হতে যে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ হয় তা এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অরণ্যে বসে গ্রন্থটি রাচনা করা হয়েছিল। তাই এর নাম ‘আরণ্যক’। আর এক বর্ণনা মতে, অরণ্যাশ্রমে এর উৎপত্তি বলে নাম হয় ‘আরণ্যক’। যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য যেমন ব্রাহ্মণখণ্ডের প্রয়োজন, তেমনি বানপ্রস্থাবলম্বীর জন্য আরণ্যকের প্রয়োজন।

আর্যাবর্ত

‘আর্যাবর্ত’ ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একটি বিশাল এলাকা। এ এলাকাকে ঘিরে পৌরাণিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। পূর্ব-সমুদ্র, পশ্চিম-সমুদ্র, হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বত—এ চার সীমার মধ্যবর্তী বিশাল ভূভাগ আর্যাবর্ত নামে পরিচিত।

আর্ষপ্রয়োগ

ঋষির উক্তিকে ‘আর্ষ’ বলা হয়। সুতরাং ‘আর্ষপ্রয়োগ’ অর্থ ঋষির উক্তির প্রয়োগ। ঋষি হচ্ছে কবি ও মহাদ্রষ্টা মুনি। পরমার্থ তত্ত্বে যিনি খুব ভালো জ্ঞান ও সম্যক দৃষ্টি রাখেন, তিনিই ঋষি। পুরাণ মতে, যা হতে বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি সম্যকরূপে নিরূপিত হয় তিনিই ঋষি। অনেক সময় পণ্ডিত ও খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকগণও ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ অনেক শব্দ তাঁদের সাহিত্যকর্মে বসিয়ে দেন। লেখকের আকাশচুম্বী খ্যাতির কারণে এগুলোকে অশুদ্ধ বা ভুল বলে বাতিল করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কালক্রমে বৈয়াকরণগণও অশুদ্ধ শব্দগুলোকে মেনে নেন এবং নাম দেন ‘আর্ষপ্রয়োগ’।

‘পূজারিণী’, ‘অশ্রুজল’, ‘সঞ্চয়িতা’ প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অশুদ্ধ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। তাই এগুলো আর্ষপ্রয়োগ। ‘কাবুলিওয়ালা’ শব্দটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট হলেও রবীন্দ্রনাথ এমন দুষ্টুমি করতে সঙ্কোচ করেননি। শরৎচন্দ্রের ‘অভাগী’ শব্দও অশুদ্ধ। শব্দগুলো আর্ষপ্রয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তবে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, প্রচলিত সব অশুদ্ধ শব্দ কিন্তু আর্ষপ্রয়োগ নয়। ঋষি বা খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত অশুদ্ধ শব্দ সাধারণ্যে বহুলভাবে প্রচলিত হলেই কেবল কোনো শব্দকে আর্ষপ্রয়োগ বলা যায়। অন্যথায় নয়।

আশকারা

'আশকারা' শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—আব্দার, প্রশ্রয় প্রভৃতি। এটি ফারসি থেকে বাংলায় এসেছে। ফারসি ভাষায় 'আশকার' শব্দের অর্থ গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ। বাংলায় আসার পরও শব্দটি তার ফারসি অর্থ অবিকৃত রেখে বেশ কিছুদিন চলছিল। রবীন্দ্রযুগেও 'আশকারা' শব্দের ব্যবহার গুপ্ত বিষয় প্রকাশ অর্থে বর্তমান ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হতে হতে প্রশ্রয় শব্দে এসে দাঁড়ায়। গুপ্ত বিষয় কে জানেন? যিনি কাছের লোক তিনি গুপ্ত বিষয় জানেন, যিনি কারও প্রিয় তার পক্ষে ওই ব্যক্তির গুপ্ত বিষয় জানা সম্ভব। যে যার যত কাছের, যত প্রিয় তার প্রশ্রয়টাও বেশি ঘটে। এ জন্য প্রিয়জনের কাছে কেউ গুপ্ত কথা প্রকাশ করে দিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। কারণ প্রকাশকারীর এমন বিশ্বাস থাকে যে, তার কথা গোপন থাকবে, তার কোনো শাস্তি হবে না। এভাবে প্রশ্রয়কারী বারবার একই ঘটনা ঘটাতে কুণ্ঠিত হন না। মূলত এ অনুষঙ্গে ফারসি আশকারা তথা গুপ্ত বিষয়ের প্রকাশ বাগভঙ্গিটা বাংলায় এসে 'প্রশ্রয়' হিসেবে মাথায় চড়ে বসে।

আশ্রম

ভারতীয় পুরাণে 'আশ্রম' শব্দটি বিভিন্ন স্থানে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রার চারটি অবস্থা। যথা ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য হচ্ছে ছাত্রাবস্থা, গুরুগৃহে বাস, গুরুসেবা, বেদাধ্যয়ন ও শিক্ষা। গার্হস্থ্য হচ্ছে গৃহী বা সংসারী হয়ে বিবাহিত অবস্থায় সংসারধর্ম পালন করা, পূজার্চনা, বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি। বানপ্রস্থ হচ্ছে পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংসারের কাজ সম্পন্ন করে বনগমন। সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ফলাহার, পূজার্চনা ও চিন্তায় অতিবাহিত করা। সন্ন্যাস হয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ ও ভিক্ষান্নে দিনাতিপাত করাও এ অবস্থায় করা হয়। সকল আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের হাতে জীবন সমর্পণ।

আশ্বাসঘাতকতা

'আশ্বাসঘাতকতা' একটি নতুন শব্দ। এর অর্থ বিশ্বাসঘাতক-এর অনুরূপ। যারা বিশ্বাসের ঘাতক তারা বিশ্বাসঘাতক, তেমনি যারা আশ্বাসের ঘাতক তারা আশ্বাসঘাতক। যিনি কোনো আশ্বাস দিয়ে সে আশ্বাস রাখেন না কিংবা আশ্বাসের উল্টো করেন তাকে আশ্বাসঘাতক বলা হয়। এরূপ কর্মকে বলা হয় আশ্বাসঘাতকতা।

আষাঢ়ে গল্প

বাংলা এ বাগভঙ্গিটি একটি বহুল প্রচলিত বাগধারা। এর আভিধানিক অর্থ—উদ্ভট কাহিনি, অবিশ্বাস্য গল্প, আজগুবি গল্প, কল্পকথা প্রভৃতি। আষাঢ়ে অর্থ আষাঢ় মাসের, সুতরাং 'আষাঢ়ে গল্প' অর্থ আষাঢ় মাসের গল্প। কিন্তু বাগধারার বাহ্যিক অর্থ আর অন্তর্নিহিত অর্থ এক নয়। আষাঢ় মাসে বাংলাদেশের প্রাচীন প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্ক অনুষঙ্গে বাগধারাটির উৎপত্তি। আষাঢ় মাসে প্রবল বর্ষণে চারদিক জলে থৈ থৈ করে। কোনো কাজকর্ম থাকে না বলে গ্রামবাংলার মানুষজন ঘরে বসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গালগল্পের আসরে মেতে উঠত। জীবনকাহিনি থেকে শুরু করে দৈত্যদানব, জিন-পরি-ভূত কারও গল্প বাদ যেত না। কেউ কেউ গল্প বানিয়ে নিজের জীবনের সত্য ঘটনা বলে চালিয়ে দিত। এখনও গ্রামবাংলায় আষাঢ় মাসে এমন দৃশ্য চোখে পড়ে। মূলত আষাঢ় মাসের এই গল্পগুজবের চিরায়ত অভ্যাস থেকে 'আষাঢ়ে গল্প' বাগধারাটির উৎপত্তি।

আসর

‘আসর’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—সভা, মজলিশ, বৈঠক ইত্যাদি। আরবি আশর শব্দ থেকে বাংলা আসর শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ দশ। মহরম মাসের ১০ তারিখ অর্থাৎ আশুরার উৎপত্তিও ‘আশর’ শব্দ থেকে। সংখ্যাবাচক এ শব্দটি আরবি হতে বাংলায় এসে নানা মিথস্ক্রিয়ার আবর্তে পড়ে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করে। কিন্তু কীভাবে এমনটি সম্ভব হলো? দশজনে মিলে আসর গরম করার কথা প্রায় শোনা যায়। যদিও দশজনে মিলে জমানো আসরের মধ্যে দশজন থাকতে হবে এমন কথা নেই। মূলত রূপক বা গৌরবার্থক অর্থে দশ সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়। আবার বলা হয়, দশে মিলে করি কাজ হারি-জিতি নাহি লাজ। এখানেও দশজন অনিবার্য নয়। মনে হয়, বাংলায় প্রাচীনকাল থেকে লোকমুখে উচ্চারিত এ সকল দশভিত্তিক মজলিশ-জমানো ব্যবহারিক-বাকভঙ্গি থেকে আরবি আশর (দশ) বাংলা আসর (মজলিশ, বৈঠক) হয়ে বাংলা ভাষায় ঠাঁই করে নিয়েছে।

অ্যালবাম

‘অ্যালবাম’ শব্দের উৎস-ভাষা কোনটি? কিছু না-ভেবে হুট করে বলে দিয়েছিলাম ইংরেজি। চাচার চোখমুখ দেখে ছোট ভাই বুঝে যায় আমার উত্তর ঠিক হয়নি। সে বলে দিল ফরাসি। কারও উত্তর ঠিক হয়নি। বহুদিন আগে উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াকালীন ঘটনা। অতঃপর চাচা বুঝিয়ে দিলেন। অ্যালবাম শব্দের উৎস-ভাষা ল্যাটিন। অবশ্য এটি এখন বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ। বাংলা ভাষা ‘অ্যালবাম’ শব্দটি ইংরেজি ভাষা থেকে এবং ইংরেজরা নিয়েছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। ল্যাটিন Albus শব্দ থেকে অ্যালবাম শব্দের উৎপত্তি। Albus শব্দের অর্থ সাদা। প্রাচীন রোমে প্রজাসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি শহরের কেন্দ্রস্থলে রাখা সাদা রঙের পাথরের ফলকে লিখে রাখা হতো। এ লিপি-ফলকের নাম ছিল অ্যালবাম। চাচা এখন নেই, বিগত প্রহর কিন্তু স্মৃতির অ্যালবামে অমর।

তৃতীয় অধ্যায়

ই ঈ
ই

ইঁদুর দৌড়

'ইঁদুর দৌড়' শব্দটি ইংরেজি rat-race শব্দের বাংলা অনুবাদ। rat-race শব্দটির জন্ম আমেরিকায়। এটি ছিল আমেরিকায় বহুল প্রচলিত একপ্রকার নাচ। এ নাচে অংশগ্রহণকারীরা ইঁদুরের মতো অস্থির ও চঞ্চলচিত্তে কোনোরূপ নিয়ম-নীতি ছাড়া ইচ্ছেমতো ছুটোছুটি করে নৃত্য করত। প্রকৃত অর্থে এখানে নাচের কোনো মুদ্রা ছিল না। যে যত অস্থিরচিত্তে বিশৃঙ্খলভাবে ইচ্ছেমতো দৌড়াদৌড়ি করত তাকে বলা হতো ভালো নৃত্যশিল্পী। বাংলায় শব্দটির অর্থ ও ব্যবহার দুটোরই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। বর্তমান তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে কোনোরূপ নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না-করে যেকোনো উপায়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চরম প্রতিযোগিতা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ভর্তি, চাকরি ও চারদিকে অভাবের যুগে লক্ষ্যবস্তু অর্জনের জন্য সকল বয়স ও শ্রেণির মানুষের যে তীব্র প্রতিযোগিতা তা আমেরিকার ইঁদুর-নাচের মতোই শৃঙ্খলাহীন।

ইংরেজ

'ইংরেজ' শব্দের বাংলা আভিধানিক অর্থ ইংল্যান্ডের অধিবাসী। তাদের ভাষায় ইংলিশ (English)। কিন্তু বাংলায় ইংলিশকে বলা হয় ইংরেজি। ইংরেজ কিংবা ইংরেজি কোনোটা ইংলিশ শব্দ নয়। ইংলিশ ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে বাঙালিরা অনেক শব্দ নিয়েছে কিন্তু তাদের জাতি ও ভাষার নামের ক্ষেত্রে তেমন হয়নি। উপমহাদেশে পর্তুগিজরা ইংরেজদের আগে এসেছিল। বস্তুত পর্তুগিজদের মাধ্যমে বাঙালিদের সঙ্গে ইংল্যান্ডবাসীর পরিচয় হয়। পর্তুগিজরা ইংল্যান্ডের নাগরিকদের Engrez ডাকত। পর্তুগিজদের ডাকা সে ইংরেজ শব্দটিই বাঙালিরা গ্রহণ করে। তাই বাঙালিদের কাছে ইংল্যান্ডবাসী ইংরেজ এবং তাদের ভাষা ইংরেজি।

ইতিহাস

১. ইতিহ + আস = ইতিহাস, ২. গত বা অতীত বিষয়ের যে স্থিতিশীল রূপ আমাদের অধিকারে এসেছে বা যা উপদেশ পরম্পরা রূপে আছে। ৩. উপদেশ পরম্পরার আধার, লোকক্রমাগত কথা, পূর্ববৃত্তান্ত, প্রাচীন কথা, পৌরাণিক বিষয় বা উপাখ্যান, পুরাবৃত্ত-উপনিবন্ধপ্রায় গ্রন্থ, পুরবৃত্ত, মহাভারতাদি বৃত্তান্ত, বিবরণ, history প্রভৃতি অর্থে প্রচলিত। 'ইত' শব্দের অর্থ গত। তার গতিশীলতাকে অর্থাৎ ইত ইত করে চলতে থাকলে, তাকে বলে ইতি। সে ইতি যখন একটা স্থিতিশীল রূপ নেয় তখন তা ইতিহ। অধিকন্তু যাতে ইতিহ থাকে তা-ই ঐতিহ্য।

ইন্তেকাল

বাংলা অভিধানে 'ইন্তেকাল' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে মৃত্যু। তবে এটি আরবি শব্দ। আরবি ভাষায় এর অর্থ স্থানান্তর, পরিবহণ প্রভৃতি। ভারতে মোগল রাজত্বের সময় জমিদারির মালিকানা পরিবর্তন, সম্পত্তির হাতবদল, রাজস্ব এক খাত থেকে অন্য খাতে দেখানোর বিষয়গুলোকে 'ইন্তেকাল' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হতো। এক জনের কাছ থেকে জমি কেনার পর নতুন মালিককে যে পুরনো মালিকের নাম খারিজ করিয়ে নিতে হয়—সে প্রক্রিয়াটাও 'ইন্তেকালি' করানো নামে পরিচিত ছিল। শব্দটি বাংলা ভাষায় আসার পর অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে এবং তা সম্পত্তি হস্তান্তরের পরিবর্তে আত্মার ইহলোক থেকে 'পরলোকে স্থানান্তর' অর্থে রূপ নেয়। এখন 'ইন্তেকাল' বললে কেউ সম্পত্তি হস্তান্তর বুঝবে না, ইহলোক হতে পরলোকে স্থানান্তর হয়েছে একটি লোক—এমনটিই বুঝবে।

ইন্দ্র

ইন্দ্র ঋক্বেদের প্রধান দেবতা। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান প্রথম। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও প্রচণ্ড শক্তিমান হিসেবে পরিচিত। কিন্তু পুরাণে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এ তিন শক্তির অধীন। অপর সকল দেবতার ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকারী ছিলেন বলে তিনি দেবরাজ নামে খ্যাত। তবে দেবরাজ হলেও তিনি স্বয়ম্ভূ ছিলেন না। তাঁর মায়ের নাম অদিতি। ইন্দ্রের পুত্রের নাম জয়ন্ত, বালী ও অর্জুন। কন্যার নাম জয়ন্তী। ইন্দ্রের নগরের নাম অমরাবতী, অশ্বের নাম উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তীর নাম ঐরাবত। তাঁর তরবারি ও ধনুর নাম ছিল যথাক্রমে পারন্ধ ও ইন্দ্রচাপ এবং অন্যান্য যে অস্ত্র তিনি ব্যবহার করতেন সেগুলোর নাম হচ্ছে বজ্র, হ্লাদিনী ও দম্ভোলী।

ইন্দ্রপ্রস্থ

'ইন্দ্রপ্রস্থ' দিল্লির নিকটবর্তী একটি উপশহর। প্রাচীনকালে এটি যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল বলে মনে করা হয়। এখানে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে এ নামের একটি নগর ছিল। কথিত হয় দেবতারা ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনা করেন। এ স্থানে প্রাচীনকাল থেকে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করতেন। সে জন্য এর নাম হয় ইন্দ্রপ্রস্থ।

ইভটিজিং

ইভটিজিং ইংরেজি শব্দ। এর অর্থ কোনো নারীকে স্বাভাবিক চলাফেরা বা কাজকর্ম করা অবস্থায় যৌন হয়রানি, বিরক্ত, অপমান বা অন্য কোনোভাবে সম্মানহানিকর বা এরূপ মনে করার মতো এমন কিছু করা। বাইবেল-মতে ইভ পৃথিবীর প্রথম নারী। ইভ নামের সঙ্গে ইংরেজি teasing ক্রিয়া যুক্ত হয়ে ইভটিজিং শব্দের উৎপত্তি। মূলত ভারত, পাকিস্তন ও বাংলাদেশে শব্দটির বহুল প্রচলন লক্ষ করা যায়। নেপালেও শব্দটির প্রচলন রয়েছে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো শব্দটি যৌন হয়রানিমূলক পদ হিসেবে প্রচারমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইভটিজিং শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও অন্তর্নিহিত অর্থ বিবেচনায় যথাপোযুক্ত নয়। তাই শব্দটি বর্ণিত অর্থে ব্যবহার না-করাই সমীচীন।

ইলশাগুঁড়ি

'ইলশাগুঁড়ি' শব্দের অর্থ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। শব্দটি ইলশেগুঁড়ি বানানে সমধিক প্রচলিত। ইলিশ মাছের সঙ্গে 'ইলশাগুঁড়ি' নামের বৃষ্টির গভীর সম্পর্ক। এ রকম বৃষ্টির সময় জেলেদের জালে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ে বলে প্রচলিত বিশ্বাস। এ বিশ্বাস থেকে 'ইলশাগুঁড়ি' শব্দটির উৎপত্তি। যে ধরনের বৃষ্টি হলে ইলিশ মাছ প্রচুর ধরা পড়ে সে ধরনের বৃষ্টিই হচ্ছে 'ইলশাগুঁড়ি' বা 'ইলশেগুঁড়ি'।

ইস্তফা

'ইস্তফা' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ কর্ম-পরিত্যাগ, সমাপ্তি, ত্যাগ প্রভৃতি। আরবি 'ইস্তিফা' শব্দ হতে বাংলা 'ইস্তফা' শব্দের উৎপত্তি। আরবি 'ইস্তিফা' শব্দের অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। কিন্তু বাংলায় এসে শব্দটি তার জন্মগত অর্থ পরিত্যাগ করে কর্ম-পরিত্যাগ বা সমাপ্তি ও ত্যাগ অর্থ ধারণ করেছে। মুসলিম আমলে বাঙালিদের কর্ম মধ্যপ্রাচ্য হতে আগত শাসক মুসলিমদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল ছিল। যত দিন তাদের সন্তুষ্ট রাখা যেত তত দিন কর্ম থাকত। এ সন্তুষ্টির অন্যতম নিয়ামক ছিল আনুগত্য ও বিনয়। যা অনেকটা দাসত্বের কাছাকাছি। ইংরেজি আমলেও এমনটি ছিল। কর্ম পেতে যেমন অনুনয়-বিনয় ও প্রার্থনার মাধ্যমে কর্মদাতাকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন ছিল তেমনি কর্ম চলে গেলেও অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা অত্যাবশ্যক ছিল। তাই আরবি 'ক্ষমা' বাংলায় এসে 'ইস্তফা' নামের মাধ্যমে 'পদত্যাগ' অর্থ ধারণ করেছে।

ঈ

ঈশ্বর

হিন্দুধর্মে পৌরাণিক বিশ্বাসমতে মহাদেব ঈশ্বর নামে পরিচিত। তিনি একাদশতনু বা একাদশরুদ্র নামেও পরিচিত। কারণ তিনি একাদশ বার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভিন্নমূর্তিরূপী তাঁর নামসমূহ হচ্ছে অজ, একপাদ, অহিব্রধণ, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর।

চতুর্থ অধ্যায়

উ ঊ ঋ
ঊ

উচ্চাভিলাষ

উচ্চ + অভিলাষ = উচ্চাভিলাষ। যার অর্থ উচ্চ আশা। এটি দিয়ে কারও ধন, পদ, মর্যাদা, ক্ষমতা, জনবল প্রভৃতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বোঝায়। অভিলাষ মানে ইচ্ছা, বাসনা। অন্যদিকে, স্বপ্ন + বিলাস = স্বপ্নবিলাস। যার অর্থ হচ্ছে স্বপ্নে বা কল্পনায় সুখভোগ করা। 'উচ্চাভিলাষ' শব্দে ইচ্ছা আর 'স্বপ্নবিলাস' শব্দে ভোগ দৃশ্যমান। স্বপ্নবিলাস হওয়া সহজ এবং সহজে তা করা যায়। কারণ স্বপ্ন দেখার কোনো শর্ত নেই। কিন্তু 'উচ্চ' তথা ধন/পদ/মর্যাদা/ক্ষমতা প্রভৃতি অর্জন না-করা পর্যন্ত তা উপভোগ করা সম্ভব নয়। স্বপ্ন যে কেউ দেখতে পারেন, তাই কারও স্বপ্নবিলাস থাকার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। তবে উচ্চকে নিয়ে বিলাস করতে হলে তাকে আগে উচ্চ হতে হবে। স্বপ্ন বাস্তব হতেও পারে না-ও পারে। তবে স্বপ্ন বাস্তব হয়ে গেলে তা আর অভিলাষ থাকে না, বিলাসে পরিণত হয়। তাই স্বপ্ন অভিলাষ নয়, 'বিলাস'। অন্যদিকে উচ্চ 'বিলাস' নয়, অভিলাষ।

উচ্চৈঃশ্রবা

দেবাসুরের সমুদ্রমন্থনকালে সমুদ্র হতে ধবধবে সাদা একটি অশ্ব উদ্ভূত হয়। এটি উচ্চৈঃশ্রবা নামে পরিচিত। এ অশ্ব অমৃত পান করত এবং অশ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এটির মালিক ছিলেন ইন্দ্র।

উজবুক

'উজবুক' শব্দটির অর্থ আহাম্মক, মূর্খ, বোকা, আনাড়ি, অশিক্ষিত ইত্যাদি। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে উজবেকিস্তান থেকে যে সকল ভাড়াটে সৈন্য এসেছিল তাদের নাম ছিল উজবক বা উজবেক। এ উজবক বা উজবেকরাই বাঙালিদের কাছে উজবুক হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বাঙালিদের মধ্যেও উজবুক দেখা দিতে শুরু করে। উজুবকদের দৈহিক শক্তির খ্যাতি ছিল প্রবল কিন্তু মানসিক উৎকর্ষে তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। সে থেকে মানসিক উৎকর্ষহীন ব্যক্তি বোঝাতে উজবুক শব্দটি চালু হয়ে যায়। এর অর্থ হয় দৈহিক শক্তিসর্বস্ব বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এবং তা থেকে 'উজবুক' শব্দটি ক্রমান্বয়ে বোকা বা আহাম্মক অর্থে এসে দাঁড়ায়। স্থানীয় লোকজন উজবেকিস্তানের সৈন্যদের বুদ্ধিহীনতাকে কোনো নির্বোধ লোকের উপমা প্রদানের জন্য 'উজবুক' নামে ব্যবহার শুরু করে। এভাবে উজবুক শব্দটি 'আহাম্মক বা বোকা লোক' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা অভিধানে স্থান করে নেয়।

উজ্জয়িনী

আধুনিক উজ্জয়িনী। এটি বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। প্রাচীন হিন্দু ভৌগোলিকেরা এখান থেকে সর্বপ্রকার ভৌগোলিক গণনা করতেন।

উঞ্ছবৃত্তি

'উঞ্ছবৃত্তি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হীনজীবিকা, ভিক্ষাবৃত্তি, হেয় জীবনোপায়। বস্তুত উঞ্ছের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাকে উঞ্ছবৃত্তি বলা হয়। উঞ্ছ শব্দের অর্থ হলো মাঠের শস্য কেটে নেওয়ার পর পরিত্যক্ত শস্যকণা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ। এ ধরনের কাজ দ্বারা যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁর বৃত্তিই উঞ্ছবৃত্তি। একসময় অনেকে এভাবে জীবনধারণ করতেন। এখনও গ্রামাঞ্চলে এমন জীবিকাধারীদের দেখা যায়। তবে এখন উঞ্ছবৃত্তি বলতে হীনজীবিকা, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতিও বোঝায়।

উৎকোচ

'উৎকোচ' সংস্কৃত শব্দ। বাংলা ভাষায় এর অর্থ—ঘুষ। অভিধানে উৎকোচ বলতে 'অবৈধ সহায়তার জন্য প্রদত্ত গোপন পারিতোষিক' বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 'উৎকোচ' অর্থ 'সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া'। সত্যি, উৎকোচ মানুষকে সৎপথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি

উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি বিষয়টি যথাক্রমে 'উৎসগত' ও 'কাঠামোগত' প্রত্যয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। উৎপত্তি শব্দের অর্থ—বি. উদ্ভব, জন্ম, সৃষ্টি, আবির্ভাব, অভ্যুদয়। উৎপত্তি [সংস্কৃত, উৎ + √পদ + তি]। 'ব্যুৎপত্তি' শব্দের অর্থ—বি. জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, বোধ, পারদর্শিতা, গভীর পাণ্ডিত্য। ব্যুৎপত্তি [সংস্কৃত, বি + উৎপত্তি]। বাক্যে প্রয়োগ ব্যাকরণশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি রয়েছে।

উৎস

'উৎস' শব্দের আভিধানিক অর্থ—উৎপত্তিস্থল, উদ্ভবস্থল, উৎপত্তিপ্রক্রিয়া প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় উৎস শব্দের অর্থ—যে স্থান ক্ষরিত বা ঝরে পড়া জলে ভিজে যায়। সে স্থানের জল প্রবাহিত হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। সংস্কৃতে উৎস শব্দটি প্রস্রবণ, ঝরনা, ফোয়ারা প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কোনো স্থানকে সিক্ত করতে হলে জল প্রয়োজন, সিক্ত স্থান হতে জলকে প্রবাহিত হতে হলে আরও অধিক জলের প্রয়োজন। এ জল আসে এমন একটি স্থান হতে যেখানে জলের উৎপত্তির অনুকূল উপাদান বা শর্ত রয়েছে। প্রস্রবণ, ঝরনা ও ফোয়ারার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা প্রয়োজন। জলের উৎপত্তিস্থল ছাড়া যেমন প্রবাহ, জলের সঞ্চয়, ঝরনা, প্রস্রবণ সম্ভব নয় তেমনি যেকোনো বিষয়ে উৎপত্তিস্থল বা উৎপত্তি-প্রক্রিয়া ছাড়া কোনো বিষয় বা ঘটনার পরিস্ফুটন অসম্ভব।

উৎসব

'উৎসব' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—অনুষ্ঠান, আনন্দানুষ্ঠান, পর্বানুষ্ঠান প্রভৃতি। সংস্কৃত হতে আগত শব্দটির মূল অর্থ ছিল যা সুখ বা আনন্দ প্রসব করে। এখন বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত উৎসবের সাযুজ্য বিশ্লেষণ করা যাক। বাংলায় উৎসব বলতে এমন একটি সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বোঝায় যা আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে পালন করা হয়। ঈদ, দুর্গাপূজা, রাষ্ট্রীয় দিবস, পারিবারিক অনুষ্ঠান, সামাজিক-পর্ব প্রভৃতি মানুষের মনে আনন্দ সঞ্চার করে। পর্ব বা অনুষ্ঠান অর্থ আনন্দ। বাংলায় উৎসব আনন্দ প্রসব করে বা আনন্দ দেয়। সুতরাং বলা যায় বাংলা 'উৎসব' শব্দের সংস্কৃত অর্থ প্রায় অভিন্ন রয়ে গেছে।

উৎসর্গ

'উৎসর্গ' শব্দের অর্থ—কোনো মহান উদ্দেশ্যে দান বা অর্পণ। কোনো ব্যক্তি বিশেষকে বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নিবেদন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে উৎসর্গ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের গ্রন্থ প্রায়শ কাউকে না কাউকে উৎসর্গ করে থাকেন। পূজারিগণ দেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন বা উৎসর্গ করে থাকেন। 'উৎসর্গ' সংস্কৃত হতে বাংলায় এসেছে। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ পূজায় বা যাগযজ্ঞে উপহার দেওয়া, দেবতার উদ্দেশে পশু বলি দেওয়া। পূজা একটি মহৎ কর্ম বলে স্বীকৃত। এ মহৎ কর্মে যা নিবেদন করা হয় তা সদুদ্দেশ্যে অর্পণ। তাই 'উৎসর্গ' শব্দটি মহান কোনো কাজে বা উদ্দেশ্যে দান বা অর্পণ অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় 'উৎসর্গ' শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। যেকোনো দান, পরিহার, পরিত্যাগ প্রভৃতি অর্থেও উৎসর্গ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সে অর্থে মলত্যাগও উৎসর্গ। অবশ্য মলত্যাগের মতো মহান উৎসর্গ আর হতে পারে না। কারণ এর ত্যাগ মানুষের

স্বাভাবিক, সুন্দর পুণ্যময় জীবনের অন্যতম নিয়ামক।

উত্তম-মধ্যম

'উত্তম-মধ্যম' শব্দটির অর্থ লাঞ্ছনাসহ প্রহার, বিস্তর পিটুনি, প্রচণ্ড প্রহার প্রভৃতি। বস্তুত এ সকল অর্থ প্রকাশে বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়। উত্তম ও মধ্যম শব্দের মিলনে উত্তম-মধ্যম। উত্তম শব্দের অর্থ ভালো, অত্যন্ত এবং মধ্যম শব্দের অর্থ মাঝারি। সুতরাং উত্তম-মধ্যম শব্দের অর্থ হয় 'অত্যন্ত ও মাঝারি'। কিন্তু 'উত্তম-মধ্যম' বাগধারার প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ 'অত্যন্ত ও মাঝারি' নয়। অন্যান্য বাগধারার ন্যায় এটি তার বাহ্যিক অর্থ বিসর্জন দিয়ে নতুন একটি অর্থ ধারণ করেছে। সেটি হচ্ছে লাঞ্ছনাসহ প্রহার। কাউকে শুধু প্রহার করলে সেটি উত্তম-মধ্যম বলা যাবে না। উত্তম-মধ্যম বাগধারার প্রকৃত অর্থের পরিস্ফুটন ঘটাতে হলে প্রহারের সঙ্গে অপমান থাকাও প্রয়োজন। (১) শিক্ষক ছাত্রটিকে দুষ্টুমি করার জন্য প্রহার করলেন; (২) শিক্ষক ছাত্রটিকে দুষ্টুমির জন্য উত্তম-মধ্যম দিলেন। এখানে প্রথম বাক্য প্রকাশ করছে শিক্ষক ছাত্রটিকে শুধু পিটুনি দিয়েছেন কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে প্রকাশ করছে শিক্ষক ছাত্রটিকে শুধু মারেননি, অপমানও করেছেন। হতে পারে সে অপমান কান ধরে দাঁড়িয়ে রাখা বা অন্য কিছু। তবে প্রচণ্ড প্রহার, বিস্তর পিটুনি অর্থেও 'উত্তম-মধ্যম' শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এর কারণ আছে। প্রচণ্ড পিটুনি দিলে কাপড়চোপড় ওলট-পালটসহ বিভিন্নভাবে অপমান এমনিতে চলে আসে।

উত্ত্যক্ত

'উত্ত্যক্ত' একটি ভয়ানক শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ উদগ্রভাবে বিরক্ত বা অপমানকর বিরক্ত। ত্যক্ত শব্দের অর্থ পরিত্যক্ত, জ্বালাতন, বিরক্ত প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় উত্ত্যক্ত শব্দের অর্থ দূরে নিক্ষিপ্ত করা বা পরিত্যক্ত। যাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় তাকে উত্ত্যক্ত করা হয়েছে বলা যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় উত্ত্যক্ত অর্থ এ হিসাবে—উত্ত্যক্ত অর্থ পরিত্যক্ত নয়, দূরে নিক্ষেপও নয়; বরং উদগ্র বা প্রচণ্ডতা বা অপমানজনকভাবে ত্যক্ত করা বা জ্বালাতন করা। বাংলা ভাষায় উত্ত্যক্ত শব্দটি এখন শিশু বা নারীকে জ্বালাতন করার বিষয় প্রকাশে খুব বেশি ব্যবহার হয়। নারীর দিকে চোখ তুলে তাকালেও ওই নারী উত্ত্যক্ত হতে পারে এমনকি না-তাকালেও নারী যদি বলে—সে অপমানবোধ করেছে। তা হলে খবর আছে। আসলে যে ব্যবহার অন্যের মনে বিরক্ত, জ্বালা, ক্ষোভ, অপমান সঞ্চার করে তা উত্ত্যক্ত। সংস্কৃতে কাউকে পরিত্যাগ করলে বা দূরে তাড়িয়ে দিলে তার মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় বাংলায় পরিত্যাগ না-করে শুধু উত্ত্যক্ত করলেও সে অবস্থার সৃষ্টি হয়।

উদর

'উদর' শব্দের অর্থ—পেট, জঠর, অভ্যন্তর বা গর্ভ। এর মূল অর্থ কিন্তু 'পেট' ছিল না। সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত 'উদর' শব্দটির অর্থ—'যা থেকে বায়ু নির্গত হয়'। এঁদো পুকুর, পচা ইঁদারা, গোবরস্তূপসহ আরও অনেক কিছু থেকে বায়ু নির্গত হতে পারে। বিজ্ঞানে এ বায়ুকে গ্যাস বলা হয়। অবশ্য বিজ্ঞানের বদৌলতে পেট থেকে নির্গত বায়ুও ইদানীং গ্যাস পরিচিতি পেয়ে জাতে উঠে গিয়েছে। তবে একসময় পেট থেকে নির্গত গ্যাসকে বায়ু বলা হতো। কবিরাজগণ এখনও তা বলে থাকেন। বিভিন্ন কারণে পেট থেকে নানান শব্দে বৈচিত্র্যময় গন্ধ সহযোগে কোনোরূপ পূর্ব-ঘোষণা ছাড়া অহরহ গ্যাস নির্গত হয়। বহু কষ্টেও বিব্রতকর এ উদ্গীরণ গোপন রাখার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বস্তুত এ বায়ু নির্গমন কাহিনি থেকে পেটের প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃত 'উদর' শব্দের বাংলায় আগমন। প্রসঙ্গক্রমে, বাংলায় ব্যবহৃত 'পেট' কিন্তু মারাঠি 'পোট' শব্দের পরিবর্তিত রূপ।

উদগ্র

'উদগ্র' শব্দের আভিধানিক অর্থ—উৎকট, ভয়ানক, প্রচণ্ড, সাংঘাতিক। এটি একটি নেতিবাচক ধারণা। উদগ্র

বাসনা, উদগ্র চিন্তা, উদগ্র লালসা প্রভৃতি বহুল প্রচলিত নেতিবাচক শব্দ। 'উদগ্র' সংস্কৃত শব্দ। এর মূল অর্থ —'যার অগ্রভাগ উপর দিকে ঠেলে উঠেছে'। কিন্তু বাংলায় এসে শব্দটি তার আদি অর্থ হারিয়ে ভয়ানক এক বিপর্যয়কর অর্থ ধারণ করেছে। উপরদিকে ঠেলে ওঠা যেমন ভয়ানক, তেমনি যে বা যিনি ওঠেন তিনিও ভয়ানক হয়ে যেতে পারেন—হয়তো এ অর্থে বাংলার উদগ্র এমন উৎকট অর্থ ধারণ করেছে।

উদাত্ত

উদাত্ত শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—উচ্চ, গম্ভীর, গমগমে প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত হতে আগত একটি গুণবাচক শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ ছিল মহান, উদার, দাতা, বিশাল, দীর্ঘ প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় এসে অন্য অনেক শব্দের ন্যায় উদাত্ত শব্দটাও তার মূল অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। তবে মূল অর্থ হারিয়ে ফেললেও অন্তর্নিহিত প্রায়োগিক অর্থ অভিন্ন রয়ে গেছে। যেমন—কাউকে কোনো কিছু করার জন্য যখন উদাত্ত আহ্বান জানানো হয় তখন শব্দটির অর্থ সংস্কৃত 'উদাত্ত' শব্দের অনুরূপই থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে যা উদার, মহান, বিশাল তা গম্ভীর, উচ্চ ও গমগমে হয়।

উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে/উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

প্রবাদ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে—একের দোষ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান', প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণের দশম মুদ্রণ (জানুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ) থেকে পাওয়া যায় "সম্বন্ধ-নির্ণয় নামক কুলগ্রন্থ মতে উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত নাম 'উধো'। ...উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের (উধোর) পত্নীর সহিত যোগেশ পণ্ডিতের (বুধোর) অবৈধ প্রণয় জন্মে, দৈবকীনন্দন তাদের এ অবৈধ প্রণয়জাত সন্তান।" উধোর মৃত্যুতে দৈবকীনন্দন উধোর নামে পিণ্ডদান করিলে বুধ যোগেশ বীজী অধিকারে তাহা পেয়েছিলেন। যথা "যোগেশের উপজায়া প্রসবিল যোগ ছায়া দৈবকীনন্দন উধোর পত্নী।" "পঞ্চানন নুলো কয় দৈবদত্ত পিণ্ডচয়, ক্ষেত্রী বীজী কেহ নাহি ছাড়ে। পণ্ডিতের বুধ খ্যাতি নহ্যমুলা জনশ্রুতি, উদোর পিন্ডি পড়ে বুধোর ঘাড়ে।"— সম্বন্ধ-নির্ণয়। যোগেশ বুধ বা পণ্ডিতের নামের অনুপ্রাস ঘটাবার জন্য বুধ শব্দটি থেকে এসেছে বুধো বা বুদো। 'বুধ' শব্দটির অন্যতম অর্থ—পণ্ডিত, বিদ্বান, জ্ঞানী, প্রতিভাধর ব্যক্তি।

উদ্বেল

'উদ্বেল' শব্দের প্রচলিত ও আধুনিক অর্থ হলো উচ্ছলিত, উচ্ছ্বাসময়, আকুলিত প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ—বেলাভূমি অতিক্রান্ত, কূলাতিক্রান্ত। এটি নদ-নদীর নামের একটি উত্তম বিশেষণ। বেলাভূমি নদ-নদীর সীমা। এ সীমা অতিক্রম করাই হলো উদ্বেল। অর্থাৎ কূল প্লাবিত করে ভেসে যাওয়া বা ভাসিয়ে দেওয়াকে উদ্বেল বলা হয়। তবে বাংলা উদ্বেল-এর সঙ্গে সংস্কৃত 'উদ্বেল'-এর অর্থের কোনো মিল নেই। হৃদয়াবেগ তথা প্রেম, বিরহ, প্রণয়, স্নেহ, বাৎসল্য, শোক, আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি প্রকাশের জন্য শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। নদী যেমন উদ্বেল হয়ে গেলে অনুভূতির প্রাবল্যে কোনো কিছু চিন্তা না-করে দুকূল ছাপিয়ে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি মানুষের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলে নদীর মতো বাঁধভাঙা স্রোতের ন্যায় প্রমত্ত আচরণ শুরু করে। এ জন্য হয়তো সংস্কৃত—নদীর উদ্বেল বাংলা ভাষায় এসে হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এ হিসাবে বাংলা ভাষা সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশি মননশীল ও প্রকাশ-বান্ধব।

উদ্ভট

বাংলায় 'উদ্ভট' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—আজগুবি, উৎকট, অসম্ভব, বেমানান, পাপিষ্ঠ প্রভৃতি। শব্দটি মূলত পরস্পর নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভট সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটি—মহাশয়,

মহাত্মা, উদার, দুর্মদ, দুর্ধর্ষ, শ্রেষ্ঠ, প্রকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট, মহান প্রভৃতি ইতিবাচক অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। অথচ বাংলায় এসে শব্দটি সম্পূর্ণ নেতিবাচক অর্থ ধারণ করেছে। সমাজের নিচুস্তরের লোকেরা অপেক্ষাকৃত উঁচুস্তরের লোকদের আচরণকে উদ্ভট মনে করে। শহুরে শিক্ষিত রমণীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন গ্রামের নারীদের কাছে উদ্ভট; আবার অভিনয়-শিল্পীদের আচরণ শহুরে শিক্ষিত রমণীদের কাছেও উদ্ভট; অন্যদিকে বাংলাদেশের অভিনয়-শিল্পীদের কাছে পশ্চিমা দেশেগুলোর অভিনেত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদ উদ্ভট। আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সমতলবাসীদের কাছে উদ্ভট, আবার সমতলবাসীদের জীবনযাত্রা আদিবাসীদের কাছে উদ্ভট। বানর নাকি মানুষের দুপায়ে হাঁটাকে উদ্ভট ভেবে মুখ ভেঙচায়। সুতরাং দেখা যায়, মহাশয়, মান্যবর, দুর্ধর্ষ ও শ্রেষ্ঠগণের আচরণ সবসময় অপেক্ষাকৃত উঁচু ও নিচুস্তরের সাধারণ মানুষের কাছে আজগুবি, উৎকট, পাপময় ও বেমানান। তাই সংস্কৃত মহাশয়, মান্যবর, শ্রেষ্ঠ ও দুর্ধর্ষ বাংলায় এসে আজগুবি, উৎকট ও বেমানান রূপ ধারণ করে আদি অর্থকে বিলোপ করে দিয়েছে।

উদ্ভিন্ন যৌবনা

'উদ্ভিন্ন যৌবনা' বাগভঙ্গিটির অর্থ চমৎকার, আকর্ষণীয়, সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত, নতুন, হৃদয়গ্রাহী প্রভৃতি। ১. উদ্ভিন্ন [উৎ = ভিদ (ভেদ করা, প্রকাশ পাওয়া) + ত (র্ম্ম = ক্ত = ন্ন)] বিণ, অঙ্কুরিত। ২. প্রকাশিত; প্রস্ফুটিত; বিকশিত। 'উ' যৌবন। ৩. প্রকটিত। ৪. পৃথক্কৃত। ৫. [ত্তৃ = ত] যা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-ভুক্তি উদ্ভিন্ন থেকে উদ্ধৃত। যে সব উদ্ভিদ সদ্য ভূমি থেকে কচি-সবুজ ডগা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় তা যেমন দেখতে সুন্দর তেমনি সদ্যজাত বস্তু সবার কাছে প্রিয় ও আকর্ষণীয়। অনুরূপভাবে, নতুন যৌবনপ্রাপ্ত নারী-পুরুষও আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও অপরূপ দেহবল্লরীর অধিকারী। তাই 'উদ্ভিন্ন যৌবনা' বাগভঙ্গি দিয়ে সুন্দরী রমণীকে প্রকাশ করা হয়।

উন্নতি ও উন্নয়ন

'উন্নতি' ও 'উন্নয়ন' নিয়ে আজকাল অনেক কথা হচ্ছে। বাংলা ভাষার কথা বললেও এখন আমরা বাংলা শব্দের মানে বুঝি ইংরেজিতে। ইংরেজিতে 'উন্নতি' যা, 'উন্নয়ন'ও তাই—'development'। কিন্তু বাংলায় শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের ভাষাস্রষ্টা-পূর্বপুরুষেরা একটি বিষয়কে বোঝাতে দুটি শব্দ খরচ করতেন না। তাঁদের কাছে শব্দ দুটোর পৃথক অর্থ ছিল। সে কারণে তাঁরা 'উন্নয়ন' শব্দটি তৈরি করেছিলেন 'নী' (আনয়ন) ক্রিয়া দিয়ে; এবং 'উন্নতি' শব্দটি তৈরি করেছিলেন 'নম' (নত হওয়া) ক্রিয়া দিয়ে। তার মানে, খেটে-খুঁটে অর্জন বাড়িয়ে নিজেকে বা নিজেদেরকে উপরে তুলে আনতে পারলে 'উন্নয়ন' হয়। কিন্তু 'উন্নতি' হয় কারও 'নত হওয়া'-র ওপর নির্ভর করে। অন্যেরা নত হলে তবে একজন উঁচুতে উঠেছে বলে প্রতীয়মান হয়। তাই 'উন্নতি'র জন্য অর্জন বৃদ্ধির পরিশ্রম করতে হয় না, অন্যদের 'নত হওয়া'র ব্যবস্থা করলেই চলে। বড় হওয়ার অন্তত দুটি পথের কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন এবং সেই দুটি পথকে চিহ্নিত করে দুটি পৃথক শব্দ তাঁরা তৈরি করেছিলেন। এখন অনেকে 'উন্নয়ন' ও 'উন্নতি'কে গুলিয়ে ফেলেছে। আসলে শব্দ-দুটোর অর্থ অভিন্ন নয়।

উপনিষদ

'উপনিষদ' সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত উপনিষদ শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে উপ- (কাছে), নি- (সঠিক জায়গায়, নিচে) এবং ষদ- (বসা)— এ তিনটি শব্দাণুর সমষ্টি। যার অর্থ কাছে নিচু আসনে বসা বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গুরু বা শিক্ষকের কাছে নিচু আসনে এসে বসা। আবার অনেকের মতে, এর অর্থ গুরুর পদতলে বসা বা গুরুর শরণাগত হওয়া। উপনিষদ মূলত বেদের শিরোভাগ। তাই এর অপর নাম বেদান্ত। এটি হিন্দুধর্মের বিশেষ ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি। এ গ্রন্থসমূহে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচিত হয়েছে।

হিন্দুদের বিশ্বাস, উপনিষদসমূহে ব্রহ্মের প্রকৃতি এবং মানুষের মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের উপায় বিধৃত আছে। দুশোরও বেশি উপনিষদের কথা জানা যায়। তন্মধ্যে প্রথম বারোটিই প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক গুরুত্ববহ। এগুলোকে 'মুখ্য উপনিষদ' বলা হয়। ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র এবং মুখ্য উপনিষদসমূহকে একত্রে প্রস্থানত্রয়ী বলা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, মুখ্য উপনিষদসমূহ প্রাক-বৌদ্ধ যুগ থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন লেখকদের দ্বারা রচিত। এ সকল রচয়িতাদের মধ্যে কৌশীতকী, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, কেন, তৈত্তিরীয়—এ বারোখানি প্রামাণ্য বলে গণ্য। অপ্রধান উপনিষদসমূহ মধ্যযুগ ও প্রাক-আধুনিক যুগে রচিত হয়েছে। ব্রিটিশ কবি মার্টিন সেমোর-স্মিথ উপনিষদসমূহকে 'সর্বকালের ১০০টি প্রভাবশালী গ্রন্থের' তালিকায় স্থান দিয়েছেন। উপনিষদের দর্শনের সঙ্গে প্লেটো ও কান্টের দর্শনের মিল রয়েছে। বিভিন্ন সময় মুনি-ঋষিগণ উপনিষদ রচনা করেন।

উপ-পুরাণ

নানা মুনি রচিত অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ 'উপ-পুরাণ' নামে পরিচিত। মুনিদের মধ্যে আদি, নৃসিংহ, বায়ু শিবধর্ম, দুর্বাসাঃ, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

উর্বশী

পুরাণ মতে উর্বশী হচ্ছে স্বর্গের অপরূপ লাবণ্যময়ী অপ্সরা। তাঁর জন্ম সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। কেউ বলেন তিনি নারায়ণের ঊরু ভেদ করে নির্গত হয়েছিলেন। অধিকাংশের অভিমত, তিনি সমুদ্রমন্থনকালে অন্যান্য অপ্সরার সঙ্গে উত্থিত হয়েছিলেন। উর্বশী সাতজন মুনির সৃষ্টি—এ কথাও প্রচলিত আছে। তবে এখনও উর্বশী বললে সুন্দরী রমণীকেই বোঝায়।

ঊ

ঊন বর্ষায় দুনো শীত

'ঊন বর্ষায় দুনো শীত' এবং 'ঊনা ভাতে দুনা বল'—এ দুটো বাক্যের সূচনা-শব্দ 'ঊন'-র আভিধানিক অর্থ কম। ঊন লিখতে 'ঊ' যেমন ঊনত্রিশ, ঊনচল্লিশ, ঊনপঞ্চাশ, ঊনষাট, ঊনসত্তর, ঊননব্বই ইত্যাদি, কিন্তু 'উনিশ' লিখতে 'ঊ' লাগে না। উদ্ভট হলেও মনে রাখার যুক্তি উনিশ তো উনিশ। যদি ঊনবিংশ হতো তাহলে 'ঊ' না-হলে চলত না। বাগধারাটির অর্থ হচ্ছে বৃষ্টি যে বছর কম হবে সে বছর বেশি শীত পড়বে।

ঊর্ধ্বরেতা

যার বীর্য ঊর্ধ্বগত হয়েছে অথবা যার কখনো রেতস্খলন হয়নি, অর্থাৎ যার রেত কখনো অধঃপতিত হয় না, যার আস্খলিত বীর্য— সেই ঊর্ধ্বরেতা। মহাদেব শিব, রাজা শান্তনু প্রমুখসহ মহাভারতে অষ্টাশীতি ঊর্ধ্বরেতা ঋষির উল্লেখ আছে।

ঋ

ঋক

'ঋক' একটি স্তুতি গ্রন্থ। যা দিয়ে দেবগণের স্তুতি করা হয় তা ঋক। এটি বেদের অন্তর্গত ত্রিবিধ মন্ত্রের অন্যতম। বাকি দুটো হচ্ছে যজু ও সাম।

ঋক্ষ

‘ঋক্ষ’ একটি পর্বত। এ পর্বতের মধ্য দিয়ে নর্মদা নদী প্রবাহিত। বর্তমান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বাংশ প্রাচীনকালে ‘ঋক্ষ’, ‘ঋক্ষবান’ প্রভৃতি নামে অভিহিত হতো।

ঋগ্বেদ

চারটি বেদের মধ্যে ‘ঋগ্বেদ’ প্রাচীনতম। কথিত হয়, এটি পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য পরস্পর শ্রুত হয়ে এটি প্রচারিত হতো বলে এর অন্য নাম ‘শ্রুতি’। ঋগ্বেদে ১০৫৮০টি ঋক আছে। তবে বর্তমানে ১৬৩টি ঋক পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদ প্রথমবার শাকল মুনি দ্বারা অধীত হয়েছিল। তারপর আসে যথাক্রমে বাস্কল, অশ্বলায়ন, শঙ্খায়ন ও মন্ডুক। ঋগ্বেদ যতবারই কোনো নতুন ঋষির দ্বারা অভ্যস্ত ও চর্চিত হয়েছে ততবারই এর নতুন শাখার উদ্ভব ঘটেছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলো অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ, ঊষা, অশ্বিনীদ্বয়, পৃথিবী, মরুৎ, মরু, রুদ্র, যম ও সোম প্রমুখদের স্তব-স্তুতিতে পূর্ণ। এ সকল স্তব-স্তুতি ও মন্ত্র দ্বারা আর্যরা দেবতাদের উদ্দেশে যাগযজ্ঞ করে অভীষ্ট প্রার্থনা করতেন।

ঋষি

শব্দটির অর্থ কবি ও মহাদ্রষ্টা মুনি। পরমার্থ তত্ত্বে যিনি খুব ভালো জ্ঞান ও সম্যক দৃষ্টি রাখেন, তিনিই ঋষি। যিনি জ্ঞানমর্গে গমন করে সংসার অতিক্রম করেছেন, তিনিই ঋষি। পুরাণ মতে, যাঁর দ্বারা বিদ্যা, সত্য, তপঃ ও শ্রুতি সম্যকরূপে নিরূপিত হয় তিনিই ঋষি। তবে বর্তমানে যিনি জ্ঞানী, স্বার্থহীনভাবে মানুষের কল্যাণে চরম ও পরম আত্মত্যাগে নিবেদিত তিনিই ঋষি।

পঞ্চম অধ্যায়

এ ঐ ও ঔ

এ

একচ্ছত্র

'একচ্ছত্র' শব্দের আভিধানিক অর্থ—প্রবল প্রতাপ, প্রভাবশালী, একাধিপত্য প্রভৃতি। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো—যাতে একের ছত্র রয়েছে। যার প্রায়োগিক ও আভিধানিক অর্থ—যাতে কেবল একজন রাজার অধিকার বিদ্যমান। অন্য কথায় বলা যায়, ছত্র মানে ছাতা। সুতরাং একচ্ছত্র মানে একটা ছাতা। এ ছাতা বা ছত্রের সঙ্গে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ছত্রের ইতিহাস-ঐতিহ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একসময় ছাতা ছিল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। রাজা বা সম্রাটগণই তখন ছাতা ব্যবহার করতেন। ফলে রাজশক্তি ও ছাতা সমার্থক বিবেচিত হতো। রাজশক্তির প্রতীক ছিল ছাতা এবং একচ্ছত্র দ্বারা কোনো রাজশক্তির একক প্রভাব বা আধিপত্যকে প্রকাশ করা হতো। একচ্ছত্র শব্দের বর্তমান প্রচলিত অর্থ ঠিক আগের মতো না-হলেও মূল অর্থ কিন্তু অভিন্ন রয়ে গেছে। আগে শব্দটি দিয়ে রাজাদের একক আধিপত্য প্রকাশ করা হতো। এখন শব্দটি কোনো স্থান বা বিষয়ে কারও প্রবল প্রতাপ, এককাধিপত্য প্রভৃতি প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন—বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র প্রভাব রয়েছে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত দেশে রাষ্ট্রপতিই নির্বাহী ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী।

একাডেমি

একাডেমি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, গবেষণা প্রভৃতির চর্চা ও গবেষণাকেন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশের জন্য একাডেমি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। গ্রিক একাডেমিয়া শব্দ থেকে একাডেমি শব্দের উৎপত্তি। গ্রিক কিংবদন্তির বিখ্যাত চরিত্র বিবেকবান ও জাতীয় বীর হিসাবে সর্বমান্য একাডেমস-এর সম্মানে তাঁরই নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত বিশাল একটি জলপাই বাগানের নাম ছিল 'একাডেমিয়া'। একাডেমিয়া ছিল নিরপেক্ষতা, বিবেক, শান্তি ও সমঝোতার প্রতীক। এ একাডেমিয়া (Akademia) হতে বাংলা একাডেমির উৎপত্তি। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশে একাডেমি শব্দটি অভিন্ন অর্থে প্রচলিত। সে হিসেবে এটি একটি সর্বভাষিক শব্দ। তবে একাডেমিয়া শব্দটির বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার একটি ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৭ অব্দে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এথেন্সের এক জলপাই বাগানের পাশে দর্শন চর্চার জন্য 'একাডেমিয়া' নামের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন—যা একাডেমিয়া শব্দটিকে ক্রমশ বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করে তোলে।

একুশ বনাম একুশে

অনেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস/শহিদ দিবস বোঝাতে একুশ লেখেন। এটি কি যথার্থ? একুশ মানে ২১; এটি একটি সংখ্যা; কিন্তু একুশে মানে কোনো মাসের নির্দিষ্ট তারিখ। ভাষা-দিবসের তারিখটি বাঙালির নিকট এতই পরিচিত যে, একুশে বললেই একুশে ফেব্রুয়ারিই ভেসে ওঠে। কিন্তু একুশ একটি সংখ্যা মাত্র। সুতরাং একুশ আর একুশের তফাত রয়েছে। ভাষা-দিবসের কথা প্রকাশে লিখুন একুশে, একুশ লিখবেন না।

এবং

বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত এ শব্দটির অর্থ—আর, অধিকন্তু, এমন, আরও প্রভৃতি। 'এবং' শব্দটি সংস্কৃত হতে আগত। 'এবং' শব্দের সমার্থক শব্দ 'ও' ফারসি, এবং 'আর' হিন্দি শব্দ। 'এবং' একটি অব্যয় পদ। এক বাক্যের সঙ্গে আর এক বাক্যের বা বাক্যাংশের সংযোগ প্রকাশে 'এবং' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য অনেক সময় নিশ্চয়তা প্রকাশেও 'এবং' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—আমি যাব এবং যাবই। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে 'এবং' শব্দের

মূল অর্থ প্রকার, এ প্রকার, এ প্রকারের, উপমা, সদৃশ্য, অনুরূপ প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় এসে শব্দটি এবংবিধ/ এবম্প্রকার প্রভৃতি অর্থ ধারণ করে। তবে এখন 'এবং' শব্দটি তার মূল ও আদি অর্থ হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্য অর্থ ধারণ করে দিব্যি বাংলা ভাষায় রাজত্ব করে চলছে প্রবল প্রতাপে।

এলাহি কাণ্ড

'এলাহি কাণ্ড' বাগভঙ্গিটির অর্থ বিরাট ব্যাপার, মহা ধুমধাম প্রভৃতি। আরবি 'ইলাহি' শব্দের বাংলা রূপ এলাহি। বাঙালি মুসলমান সমাজে চিঠিপত্র, হিসাবের খাতাপত্র প্রভৃতির শীর্ষে একসময় 'এলাহি ভরসা' লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখনও লেখা হয়। আরবি 'ইলাহি' শব্দের অর্থ আমার আল্লাহ। 'ইলাহ' শব্দ থেকে ইলাহি। 'ইলাহ' শব্দের অর্থ উপাস্য অর্থাৎ আল্লাহ। আরবি 'ইলাহি' ও হিন্দি 'ভরসা' মিলে তৈরি হয়েছে শুভ-কামনা-সূচক শব্দ ইলাহি ভরসা। এলাহি ভরসার ন্যায় তৈরি হয়েছে এলাহি কাণ্ড, এলাহি কারখানা, এলাহি ব্যাপার প্রভৃতি বাগভঙ্গি। তবে শব্দগুলোতে এলাহি বা ভরসার কোনো অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র নেই। বরং যে আয়োজনটা বিশাল কিংবা যা করা সাধ্যাতীত সে ব্যাপারগুলোই এখানে 'এলাহি' শব্দ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'এলাহি কাণ্ড' বাগভঙ্গিতে এলাহি শব্দটি উপাস্য অর্থের পরিবর্তে বিশাল বা অসাধ্য হয়ে উঠেছে। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন। হিন্দুদের অবতার রাম বা রাঘব-এর ক্ষেত্রেও এমন দেখা যায়। যেমন—রামধনু, রামছাগল, রামদা, রাঘববোয়াল প্রভৃতি। বাংলার বিভিন্ন শব্দে তারা দেবত্ব, বীরত্ব, মহত্ত্ব প্রভৃতি হারিয়ে বিশালত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে—এ সকল শব্দে।

ঐ

ঐতরেয়

'ঐতরেয়' ঋগ্বেদের শাখা বিশেষ। মহিদাস ঐতরেয় নামক এক ঋষি এ শাখার প্রবর্তক। ইতরার পুত্র বলে এ ঋষির নাম ঐতরেয় এবং ঐতরেয় মুনির দ্বারা প্রণীত বলে এর নাম ঐতরেয়। ঐতরেয় শাখায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষদ পাওয়া যায়। এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক বিবরণও এখানে পাওয়া যায়।

ঐশ্বর্য

সংস্কৃত হতে আগত 'ঐশ্বর্য' শব্দটির বর্তমান অর্থ 'বৈভব' বা 'ধনসম্পত্তি'। তবে এর মূল অর্থের সঙ্গে ধনসম্পদের কোনো যোগসূত্র ছিল না। ঈশ্বর থেকে 'ঐশ্বর্য' শব্দটির উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষায় ঐশ্বর্য শব্দের অর্থ—ঈশ্বরের ভাব বা কর্ম; অলৌকিক গুণ বা শক্তি। ধনসম্পদ দিয়ে ঈশ্বরের ন্যায় অলৌকিক বিষয় সম্পাদন করা যায় বলেই হয়তো বাংলায় 'ঐশ্বর্য' শব্দটি ধনসম্পত্তি প্রকাশে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। এটি শব্দের গৌরবহানির একটি চমৎকার উদাহরণ। তবে এখন ঐশ্বর্যের প্রয়োজনীয়তা ঈশ্বরের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

ও

ওকে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুইগ দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী William Henry Harrison-এর নির্বাচন প্রচার-কাহিনির সঙ্গে OK বাগভঙ্গিটির ব্যুৎপত্তি জড়িত। John Rock ছিলেন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসনের নির্বাচন-প্রচারে নিয়োজিত অন্যতম একজন। একবার তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষা ও বানান সম্পর্কে অধিকাংশ বাঙালির মতো বোধশোধহীন একজন কর্মী Rock-এর শ্রুতিলিখনে all correct-এর পরিবর্তে oll

korrect লিখে পত্রিকায় পাঠিয়ে দেন। পত্রিকা যথারীতি কোনো পরিবর্তন ছাড়া খবরটি ছাপিয়ে দেয়। এ নিয়ে বেশ কৌতুক করলেও Rock ভাবলেন মন্দ কী, 'ট্রেড-নেম'-এর ফোনেটিক বানানের মতো এটি একটা নির্বাচন স্লোগান হয়ে যাক। এরপর Oll Korrect-এর আদ্যক্ষর দুটো নিয়ে গড়ে ওঠে OK. নির্বাচন-প্রচারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে OK.

অনেকে মনে করেন OK শব্দটি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের উদ্ভাবিত (Oil/Orl) Korrect এ jocular spelling থেকে এসেছে। OK-এর বিশ্বময় দ্রুত পরিব্যাপ্তির আর একটি কারণ আছে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী Martin Van Buren-এর জন্ম হয়েছিল নিউইয়র্কের Kinder Hook নামক স্থানে। তাঁর ডাক নাম ছিল Old Kinder Hook। তাঁর নামের দুটো আদ্যাক্ষর নিয়ে OK নামের একটি ক্লাব গঠন করা হয়। OK ক্লাবটি ভ্যান ব্যারেনের নির্বাচন-প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিল। এভাবে OK শব্দটি আবার নতুন শক্তিতে প্রবল হয়ে ওঠে। মার্টিন ভ্যান ব্যারেন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে পরাজিত হলেও OK শব্দটি পুরো বিশ্ব জয় করে নেয়।

ওডিকোলন

'ওডিকোলন' একপ্রকার সুগন্ধি সুরাসার বিশেষ। ওডিকোলন শব্দের মূল অর্থ কোলন নদীর জল। ফরাসি ভাষায় নামকরণ হলেও এ সুরভিত নির্যাসটি প্রথম জার্মানির কোলন নদীর তীরে অবস্থিত কোলন শহরে প্রস্তুত হয়। তাই নাম ওডিকোলন বা কোলন নদীর জল। ফরাসি উচ্চারণ—ও (অর্থাৎ জল) দ্য কোলন (অর্থাৎ কোলনের)।

ওতপাতা

'ওতপাতা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—আক্রমণের জন্য বিচক্ষণতার সঙ্গে অপেক্ষা, আক্রমণ করার নিমিত্ত সতর্ক পদক্ষেপ। সংস্কৃত 'ওতুবৎ' শব্দ থেকে বাংলা 'ওতপাতা' শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃতে 'ওতু' শব্দের অর্থ বিড়াল। সুতরাং 'ওতুবৎ' শব্দের অর্থ বিড়ালের মতো। তাই 'ওতপাতা' শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হয়—বিড়ালের মতো পেতে থাকা। বিড়াল শিকার ধরার জন্য সতর্ক পদক্ষেপে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করে কিংবা শিকারির দিকে এগিয়ে যায়। বিড়ালের এ কৌশল অবলম্বন করে ইঁদুরের মতো চঞ্চল ও দ্রুতগামী প্রাণীকেও সহজে ধরে ফেলে। বস্তুত সংস্কৃত 'ওতুবৎ' শব্দের অর্থে বিড়ালের শিকার-ধরার কৌশলকে যোজিত করা হয়েছে। ফলে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে—আক্রমণের জন্য সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষা।

ওতপ্রোত

'ওতপ্রোত' শব্দটির প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ বিশেষভাবে জড়িত, পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত, আন্তঃপরিব্যাপ্তি, পরস্পর সংযুক্ত, পরস্পর অন্তর্ব্যাপ্ত প্রভৃতি। 'ওত' ও 'প্রোত' শব্দ দুটোর সমন্বয়ে সংস্কৃত 'ওতপ্রোত' শব্দের সৃষ্টি। সংস্কৃত ভাষায় 'ওতপ্রোত' একটি চিত্রকল্পময় রূপক বাগভঙ্গি। এবার 'ওত' ও 'প্রোত' অর্থ কী তা জানা যাক। কাপড়ের টানার সুতোকে বলা হয় 'ওত' অন্যদিকে পড়েনের সুতোকে বলা হয় 'প্রোত'। সুতরাং ওতপ্রোত শব্দের অর্থ দাঁড়ায় টানা ও পড়েনের সুতোতে যা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। একটি নকশা যা 'ওত' ও 'প্রোত' উভয়ের সঙ্গে পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত হয়ে ফুটে থাকে সেটিই ওতপ্রোত। বাংলায় সংস্কৃত 'ওতপ্রোত'-এর প্রায়োগিক অর্থ ভিন্ন হলেও অন্তর্নিহিত অর্থ অভিন্ন।

ঔ

ঔষধি

ভারতীয় পুরাণমতে, হিমালয়ে স্বর্ণময় ঋষভ পর্বত ও কৈলাস পর্বতের মাঝে একটি পর্বত রয়েছে। এটি ঔষধি

পর্বত। এ পর্বতের শীর্ষদেশে মৃত-সঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী—এ চার প্রকার মহৌষধি পাওয়া যেত। হনুমান, রাম-রাবণের যুদ্ধকালীন দুবার ঔষধি পর্বত উৎপাটন করে আনেন। প্রথমবার ঔষধির গন্ধ শুকিয়ে রাম-লক্ষ্মণ শল্য-মুক্ত ও বানরও সুস্থ হয়। পরে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হলে হনুমান ঔষধি চিনতে না-পেরে ঔষধি-শৃঙ্গ পুরোটাই তুলে নিয়ে আসেন। ঔষধি পর্বতের আর এক নাম গন্ধমাদন। এ পর্বতের গন্ধ সকলকে মত্ত করে দেয়—তাই এর নাম গন্ধমাদন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক

কংস মামার আদর

বাগভঙ্গিটির আভিধানিক অর্থ—কৃত্রিম ভালোবাসা, ভালোবাসার ভান, ভালোবাসার আবরণে ক্ষতি করার চেষ্টা। কংস ছিলেন কৃষ্ণের মামা। কংস যদুবংশীয় বসুদেবের সঙ্গে নিজের ভগিনী দেবকীর বিবাহ দেন। বিবাহকালে দৈববাণী হয় যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে হত্যা করবে। ভীত কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাগারে দেবকী ও বসুদেবের ছয়টি সন্তান হয়, তাদের প্রত্যেককে মামা কংস হত্যা করে। অষ্টম সন্তান কৃষ্ণকে কৌশলে বসুদেব কারাগারের বাইরে পাঠিয়ে দেন। অষ্টম সন্তানকে হত্যার মানসে কংস হাজার হাজার শিশুকে হত্যা করেন। কংস নানা উপায়ে ভাগ্নে কৃষ্ণকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হননি। ভাগ্নেকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মামা কংসের এ নিষ্ঠুরতা থেকে 'কংস মামার আদর' বাগধারাটির উৎপত্তি।

কঞ্চি

'কঞ্চি' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ বাঁশের সরু শাখা। কঞ্চি তুর্কিজাত শব্দ। তুর্কি 'কমচি' শব্দ বাংলায় এসে কিছুটা পরিবর্তন হয়ে কঞ্চি রূপ ধারণ করেছে। তুর্কি ভাষায় 'কমচি' শব্দের অর্থ চাবুক। একসময় শিক্ষার্থীদের শায়েস্তা করার জন্য এরূপ কঞ্চি চাবুক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এখনও যে ব্যবহার করা হয় না তা নয়। মূলত বাঁশের গ্রন্থিমূল থেকে নির্গত একটি ক্ষুদ্র শাখা কঞ্চি নামে পরিচিত। এটি খুব শক্ত, সহজে বাঁকানো গেলেও ভাঙা যায় না। কিন্তু যে বাঁশ থেকে কঞ্চি বের হয় সে কাণ্ড এর চেয়ে অনেক নরম। এ জন্য গুরুর চেয়ে সাগরেদ অধিক দক্ষ হয়ে গেলে বলা হয় 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' হয়ে গিয়েছে। কঞ্চি মহোপকারী বস্তু। এর দ্বারা শায়েস্তা করা শুধু হয় না, নানা রকমের আসবাবপত্র ও ঝুড়ি তৈরি হয়। ক্ষেতের বেড়া দেওয়ার জন্য কঞ্চির ব্যবহার রয়েছে। জ্বালানি হিসেবে গ্রামাঞ্চলে এখনও কঞ্চির জুড়ি নেই।

কথার ফুলঝুরি

'বাগাড়ম্বর, অর্থহীন বাগবিস্তার, অলঙ্কারবহুল কথা' ইত্যাদি অর্থ প্রকাশে বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়। মূলত কথা ও ফুলঝুরি শব্দ-দুটোর মিলনে 'কথার ফুলঝুরি' বাগধারার উৎপত্তি। ফুলঝুরি একপ্রকার আতশবাজি। দেখতে অনেকটা আগরবাতির মতো। এটি হাতে ধরে আগুন দিলে স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে পুষ্পবৃষ্টির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। 'ফুলঝুরি' নামের আতশবাজির এ বৈশিষ্ট্য থেকে 'কথার ফুলঝুরি' বাগধারার জন্ম। বক্তার মুখ দিয়ে কথার ফুলঝুরি ফুটতে পারে, লেখার মধ্যেও কথার ফুলঝুরি থাকতে পারে। 'কথার ফুলঝুরি' যেখান থেকেই ফুটুক তা অর্থহীন বাগবিস্তার ছাড়া কিছু নয়। তবু আতশবাজির মতো এমন কথারও সৌন্দর্য আছে।

কদর্য

'কদর্য' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—কুৎসিত, বিশ্রী, গর্হিত, অশালীন, পাপময় প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় কু বা খারাপ অর্থে কদর্য বিশেষণটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। 'কদর্য' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসির বাংলা ভাষায় প্রবেশ করলেও সে তার মূল সংস্কৃত অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। তবে যে অর্থ এনেছে তা মূল অর্থের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এমনটি বলা যাবে না। 'কু' মানে কুৎসিত এবং 'অর্য' মনে স্বামী। সুতরাং সংস্কৃতে কদর্য শব্দের অর্থ কুৎসিত স্বামী। তবে এ কুৎসিত কেবল শারীরিক নয়। যে সব স্বামী স্ত্রী-পুত্রকে নিপীড়ন করে ধনসঞ্চয় করত সংস্কৃতে তাদেরকেই কদর্য বলা হতো। বাংলা ভাষায় 'কদর্য' বলতে এখন শুধু স্বামী বোঝায় না।

স্বামী হোক বা পিতা হোক যা কিছু কুৎসিত, বেমানান, অশালীন, বিরূপতার পরিচায়ক, ঘৃণ্যময়, তা-ই কদর্য।

কদলি

কদলি শব্দের আভিধানিক অর্থ—কলাগাছ, কলা প্রভৃতি। কিন্তু এর মূল অর্থ হচ্ছে যা বাতাস দ্বারা সহজে দলিত হয়। কদলিবৃক্ষের কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। এর শেকড়গুলোও মাটির গভীরে যায় না। পুরো শরীর যেমন নরম তেমনি ভঙ্গুর। অল্প বায়ু প্রবাহিত হলেও দলিত হয়ে সহজে ভেঙে পড়ে। তাই এর নাম কদলিবৃক্ষ। কদলি বাংলাদেশের একটি অতি পরিচিত সুস্বাদু ফল। এটি শুধু সুস্বাদুই নয়, দেখতেও সুন্দর এবং অতি পুষ্টিকর। কদলি বলতে গাছ ও ফল দুটোকে বোঝালেও অনেক সময় অর্থবিভ্রাট দূর করার জন্য বলা হয় কদলিবৃক্ষ ও কদলি। এটি কলাগাছ বা রম্ভাতরু নামেও পরিচিত।

কলা আর কচু বাগভঙ্গিতে অনেকটা সমার্থক। যখন আমরা বলি, 'কচু পাবে' মানে কিছুই পাবে না। তেমনি পরীক্ষার দিন অনেকেই কলা খেতে চান না। কারণ পরীক্ষায় কেউ কলা পেতে চান না। কেন কলাকে কচুর ভাগ্য বরণ করতে হলো? কলা অত্যন্ত পুষ্টিকর ও আদর্শ ফল। তবু কলার এ পরিণতির কারণ হচ্ছে সহজলভ্যতা। অধিক ফলনের কারণে তুলনামূলকভাবে স্বল্পমূল্যে অধিক ফল পাওয়া যায়। তাই কলা এত সুন্দর, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্য ও মনোজগতে এটি অবহেলার পাত্র। ঠিক কচুর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। আসলে দাম ও মর্যাদা সবসময় গুণের ওপর নির্ভর করে না, লভ্যতার ওপরও নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু যতই গুণকর হোক না কেন, সহজলভ্যতা তার মর্যাদা ও দাম দুটোকেই কমিয়ে দেয়। এ জন্য কলার চেয়ে সজনের দাম বেশি, দুধের চেয়ে মদের বেশি দাম। তুমি আমার কলাটা করবে, কাঁচকলা খাও, কলাপোড়া খাও, কলা খাও, ফল তোমার কলা প্রভৃতি বাগভঙ্গি নেতিবাচক ও অপমানজনক। অথচ কলা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত একটি পুষ্টিকর ফল।

করুণ

কৃ + √উন (উনন), অথবা করুণা + অ (অচ) অন্ত্যর্থে, যাতে কর্ম/কর/কাজ 'উন' বা কম বা এলোমেলো, যা চিত্ত বিক্ষেপ করে, যা শোক উদ্দীপন করে, দীন, করুণাযুক্ত, শোকব্যঞ্জক, প্রিয়বিয়োগনিবন্ধন, শোক, দুঃখজনক প্রভৃতি অর্থে করুণা শব্দ ব্যবহৃত হয়। বস্তুত বেকার বা অর্ধ-বেকারের অবস্থাই করুণ অবস্থা। কারণ এদের 'করা'র বা কর্ম পরিবেশটা 'উন', ফলে উৎপাদন নেই বা হয় না। কিংবা, কাঁচামাল রয়েছে, হাতিয়ার রয়েছে, কিন্তু কেমন করে কী উৎপাদনে যেতে হবে তা জানা নেই, অথবা যিনি দেখিয়ে দেবেন তিনি নেই, অথবা জানা থাকলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি নেই, ফলে কাজ হচ্ছে না। অর্থাৎ কর (কাজ) উন। এ অবস্থায় যে দুরবস্থা সেটিই করুণ। অবশ্য আজকাল যেকোনো দুঃখজনক অবস্থাকে করুণ বলা হয়ে থাকে।

কলকে/কল্কে পাওয়া

আসরে সম্মান পাওয়া, মর্যাদা পাওয়া, খাতির-যত্ন পাওয়া, উষ্ণ অভ্যর্থনা পাওয়া, বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়া প্রভৃতি অর্থে 'কলকে পাওয়া' বা 'কল্কে পাওয়া' বাগভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন বাংলাদেশে সামাজিক প্রথা অনুসারে সভা-সমাবেশ কিংবা কোনো আমন্ত্রণে সম্মানিত বিশিষ্ট অতিথিকে তামাক সেবন করতে দিয়ে স্বাগত জানানো হতো। এটি বর্তমানে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করার চেয়েও অনেক বেশি মর্যাদাকর ছিল। তামাক বা হুঁকোর নল মুখে দিয়ে বরণ করা ছিল গর্ব, মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়। হুঁকোর উপর যে পাত্রে তামাক দিয়ে আগুন জ্বালানো হয় সেটি কলকে/কল্কে। তাই হুঁকোর সঙ্গে কলকের সম্পর্ক নিবিড়। কলকেহীন হুঁকো অর্থহীন। কলকের আগুন ছলকে না উঠলে হুঁকোর আর দাম কী! সবাই কিন্তু কলকে পেত না, কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই সম্মান ও মর্যাদার নিদর্শনস্বরূপ অনুষ্ঠানাদিতে কলকে পেতেন। যিনি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন তিনি সবার আগে কলকে

পেতেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে কলকে পরিচালনা করা হতো। কলকে পাওয়ার মাধ্যমে মর্যদা ও সম্মান পাওয়ার এ প্রাচীন সামাজিক প্রথাটি 'কলকে পাওয়া' বাগধারার মাধ্যমে ভাষায় স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছে। তবে বর্তমানে কলকে পাওয়া শব্দটি গুরুত্ব পাওয়া প্রকাশে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। যেমন— প্রাক্তন সভাপতি রশিদ সাহেব কলেজের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় কলকে পেলেন না।

কলঙ্ক

'কলঙ্ক' শব্দের আভিধানিক অর্থ কেলেঙ্কারি, অখ্যাতি, দাগ প্রভৃতি। তবে শব্দটির মূল অর্থ— যা নিজেকে হীন করে। যে সকল কাজকর্ম, বিষয় বা আচরণ নিজেকে হীন করে সে সবই ছিল 'কলঙ্ক' শব্দের মূল অর্থ। তবে এর আধুনিক ও প্রচলিত অর্থ— অখ্যাতি, দাগ, অপবাদ, দীর্ঘস্থায়ী নিন্দা, বড় রকমের নিন্দা, মালিন্য প্রভৃতি। অর্থের সামান্য পরিবর্তন হলেও শব্দটির মূল অর্থ ও প্রচলিত অর্থের তেমন প্রায়োগিক পার্থক্য নেই। যে সকল বিষয় কারও অখ্যাতি এনে দেয় সে সকল বিষয় কারও থাকলে সে ব্যক্তি কলঙ্কিত। মেয়ে হলে বলা হয় কলঙ্কিনী। তবে পুরুষ-শাসিত সমাজে 'কলঙ্ক' শব্দটা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি প্রয়োগ করা হয়। যদিও কলঙ্ক নিজে ছেলেমেয়ে ভেদাভেদ করে না।

কলম

কল + অম = কলম-ণ। শব্দটি দ্বারা ১. কল সীমায়িত হয় যাতে, কলের সীমায়ন বহন করে যে; ২. লেখনী, শালিধান্য, প্রচুর জলোৎপন্ন ধান্য, চোর, লিখিত বিষয়, বেলোয়ারি ঝাড়ের কলম; ৩. কলকল করে মানুষ কথা বলে যায় কিন্তু সে কলকাকলির ধারাকে সীমায়িত করে লিখে রাখে যে, সে হলো কলম বা কলম্ব; ৪. ইংরেজি pen প্রভৃতি অর্থে প্রচলিত।

মূলত 'কলম' অতি প্রাচীন শব্দ। 'উণাদি সূত্র' বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্বে বৌদ্ধ যুগের একটি প্রাচীন অমরকোষ। এ অমরকোষেও 'কলম' শব্দটি পাওয়া যায়। শব্দরত্নাকর, মেদিনীকোষ, বৈজয়মন্তী, বিশ্বপ্রকাশ, ত্রিকাণ্ডশেষ, অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে 'লেখনী' অর্থে কলম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এর সঙ্কালক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, অমরকোষধৃত 'কলম্ব' শাকনালিকা 'ডাঁট', বোধ হয় আরবি শব্দের মূল 'কলম্ব'; মুসলমান শাসনামলে শব্দটি প্রথমে আদালতে, পরে কথ্য ভাষায় 'কলম' শব্দ প্রচলিত হয় এবং পরবর্তীকালে এটি সংস্কৃতকোষে ধৃত হয়েছে। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে এর প্রয়োগ নেই। প্রাচীনকালে লেখার নিমিত্ত ব্যবহৃত 'শর', 'খাক', 'কঞ্চির কলম' সবই ছিল নালিকাবিশেষ। গ্রিক kalamos এবং ল্যাটিন calamus শব্দের মৌলিক অর্থ নল; বেত্র (reed, cane) এবং গৌণার্থে 'নলের কলম' (reed-pen)।

'কলম' শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণে বোঝা যায়, প্রাচীনকালে খাগের কাঠি ছিল এক ধরনের নালিকা। মূলত এ নালিকা দিয়ে লেখালেখির সূচনা। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির জন্য এটি ছিল অভিন্ন। এ জন্য গ্রিক kalamos এবং ল্যাটিন calamus শব্দের মৌলিক অর্থ নল—বেত্র (reed, cane) এবং গৌণার্থে 'নলের কলম'। পত্রিকায় লেখালেখিকেও column বলা হয়। আরবরা ভারতে আসায় নলের কলমও তাদের সঙ্গে ভারতে চলে আসে। তবে শব্দটি কেন 'চোর' অর্থেও ব্যবহারের প্রচলন রাখা হয়েছিল তা আগে বোঝা না-গেলেও এখন বোঝা যায়। কলমের মাধ্যমে কলমবাজগণ জঘন্য চুরির নৃশংস কার্য করে থাকে। হয়তো এ জন্য প্রাচীন ঋষিগণ কলমের একটি অর্থকে 'চোর' ধার্য করেছিলেন। বর্তমানে একজন আমলা মুহূর্তের মধ্যে কলমের এক খোঁচায় যে চুরি করে তা হয়তো লক্ষাধিক বে-কলম লোকের পক্ষে একযুগেও সম্ভব হবে না।

কলস

'কলস' শব্দের আভিধানিক অর্থ—জলপাত্র, বড় আকারের ঘড়া। তবে কলস শব্দের মূল অর্থ যা জল দিয়ে

ভরতি করার সময় কলকল শব্দ করে। এ অর্থে জল দ্বারা ভর্তি করার সময় যে সকল পাত্র কল শব্দ করে সেটিই কলস। তবে এ ধরনের জলপাত্রের পেট গলার তুলনায় অনেক বড় হওয়ায় কলসে জল ঢোকানোর সময় বাতাস-প্রবাহের কারণে কলকল শব্দে মেতে ওঠে। 'কলস' শব্দের একটি প্রায়-সমার্থক শব্দ 'কলসি'। এর অর্থ ছোট আকারের জলপাত্র বা ছোট আকারের ঘড়া বা ছোট আকারের কলস। এটাতেও কলকল শব্দ হয়। কলস সাধারণত বাড়িতে থাকে। অন্যদিকে কলসি কাঁখে মেয়েরা জল আনতে যায়। মেয়েরা জল আনতে যায় বলে হয়তো ছোট কলসের নাম হয়েছে 'কলসি'।

কলহ

'কলহ' সংস্কৃত হতে আগত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির অর্থ—যুদ্ধ। তবে 'কলহ' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ ঝগড়া, বিবাদ, বচসা, বাগবিতণ্ডা প্রভৃতি। 'কল' মানে শব্দ, 'অহ' মানে হনন করা। সুতরাং ব্যাকরণগতভাবে শব্দটির মূল অর্থ ছিল—যা মনোহর ধ্বনি হনন করে। আসলেই কলহ মনোহর ও মধুময় ধ্বনি হনন করে মানুষের কানে কষ্ট ও যাতনা বর্ষণ করে।

কল্প

পুরাণমতে, পৃথিবীর সাধারণ মানুষের ৪৩২ কোটি বছর ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। ৪,৩২,০০,০০,০০০ বছর ব্রহ্মার একদিন এবং এ পরিমাণ সময়ে ব্রহ্মার এক রাত। দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় এবং রাতে লয়প্রাপ্ত হয়। এ সৃষ্টি ও লয়কে 'কল্প' বলা হয়। এক সপ্ততি দৈবযুগে এক মন্বন্তর এবং চতুর্দশ মন্বন্তরে এক কল্প। এই কল্পই হচ্ছে বিধাতার দিন।

কল্পতরু

কল্পতরু = কল্প + তরু, যে তরু (ব্যবস্থা) পরিকল্পনা করে সৃজন করা হয়েছে, বাঞ্ছিতবস্তুপ্রদ নন্দনস্থিত দেবতরু বিশেষ, কল্পবৃক্ষ, সর্ব-পুরুষার্থোপায়, প্রার্থিতবস্তুদাতা, অতিবদান্য, কল্পতরুর ন্যায় সম্পদসমৃদ্ধ, দানে পটু কল্পতরুর ন্যায় ক্রিয়ামাত্রে নিপুণ। এটি ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একটি বৃক্ষ। সমুদ্রমন্থন হতে উত্থিত এ বৃক্ষ কল্পান্ত হলে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এ জন্য এর নাম কল্পতরু বা অভীষ্টদায়ক বৃক্ষ। কল্পতরুর নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করলে অভীষ্ট লাভ হয়। তরুর আর একটি অর্থ হলো সরকারি ব্যবস্থা—যার শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যেখানে গিয়ে আবেদন করে প্রার্থনা করতে হয়। আবেদন করলে প্রার্থিত বস্তু বা বিষয় পাওয়া যায়। এরই প্রতীকী আচরণ করা হয় অশ্বত্থবৃক্ষ ও বটবৃক্ষে সুতো বেঁধে। এ রীতি এখনও গ্রামঞ্চলে প্রচলিত আছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজতান্ত্রিক সরকারি ব্যবস্থাকে অশ্বত্থবৃক্ষ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বটবৃক্ষ বলে। আধুনিক ভাষায় যাকে 'প্রাশাসনিক প্রতিষ্ঠান' বলা হয় সেকালে তাকেই 'কল্পতরু' বলা হতো। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ভেবে-চিন্তে পরিকল্পনা করে সৃজন করা হয়েছে। তাই এগুলোকে কল্পতরু বলে।

কলি

'কলি' যুগপ্রবর্তক দেবতা। তাঁর নামানুসারে বর্তমান যুগের নাম কলিযুগ। ৪,৩২,০০০ বছর পৃথিবী এ দেবতার অধিকারে থাকবে। এ যুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু কল্কিরূপে আবির্ভূত হবেন। দ্বাপরের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হতে অধর্মের সৃষ্টি হয়। অধর্মের স্ত্রীর নাম মিথ্যা। মিথ্যার গর্ভে ও অধর্মের ঔরসে দম্ভ নামের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের 'লোভ' নামের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। লোভ নিজের ভগিনী নিবৃতিকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের ক্রোধ নামের এক পুত্র ও হিংসা নামের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ক্রোধ নিজ ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁদের কলি নামের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কলি নিজের ভগিনী দিরুক্তিকে বিয়ে করেন। তাদের 'ভয়' নামের এক পুত্র এবং 'মৃত্যু' নামের এক কন্যার জন্ম হয়। এ কলিই

‘কলি’ যুগের প্রতিষ্ঠাতা।

কলিযুগ

চার যুগের শেষ যুগ। কলি এ যুগের অধিষ্ঠাতা। ১২০০ দিব্য বছর অর্থাৎ ১২০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০০ বছর এর পরিমাণ। ৩১০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ যুগের শুরু হয়েছে। কলিযুগ অধর্মের যুগ। এ যুগে ধর্ম শুধু এক-চতুর্থাংশ থাকবে। এ যুগে ত্রিপাদ পাপ ও একপাদ পুণ্য। এ যুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু কল্কীরূপে জন্মগ্রহণ করে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। এরপর সত্যযুগের সূচনা ঘটবে।

কাইসর/কায়সার

‘কাইসর/কায়সার’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—সম্রাট, রাজা, বাদশাহ বা প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ব্যক্তি। ল্যাটিন শব্দ Caesar হতে কাইসর/কায়সার শব্দটির উৎপত্তি। এখন রাজা-বাদশা নেই, তবে ক্ষমতাধর ব্যক্তি আছেন। কেউ রাজা-বাদশার মতো ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী—এটি বোঝাতে শব্দটির প্রচলন এখনও আছে। তবে এটি আগের মতো প্রচলিত নয়। একসময় শব্দটির বহুল প্রচলন ছিল।

কাক

সংস্কৃত ‘কৈ’ বা ‘কা’ শব্দের সঙ্গে ‘কন’ প্রত্যয়-যোগে গঠিত হয়েছে কাক। এর অর্থ ‘যে কৈ কৈ বা কা কা করে’। কাকের সংস্কৃত নাম হচ্ছে বায়স। প্রকৃতির ঝাড়ুদার হিসাবে পরিচিত কাকের ‘বায়স’ নামটি রামায়ণ ও মহাভারতে বারবার এসেছে। ‘বায়স’ শব্দের বাংলা অর্থ—‘যার বয়স বোঝা যায় না’। কাকের বেলায়ও ব্যাপারটি সত্য। একটু বড় হবার পর কাকের বাহ্যিক চেহারা দেখে বোঝার কোনো উপায় থাকে না যে, বাড়ির পাশে খাম্বার তারে বা গাছের ডালে বসে থাকা কাকটির এখন যৌবন না কি বার্ধক্য চলছে। হিন্দুপুরাণ মতে, মহর্ষি কশ্যপ ও তার স্ত্রী তাম্রার সন্তান কাকী থেকেই পৃথিবীতে সব কাকের জন্ম। অবশ্য পুরাণে যে ভূষণ্ডীর কাকের কথা বলা হয়েছে, সেটা ত্রিকালজ্ঞ। সে এখনও মরেনি, কখন মরবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীকে পাঁচবার জলমগ্ন হতে দেখেছে এই কাক। বারো বার দেখেছে সমুদ্রমন্থন। পরশুরাম ও রামের ছয় বার জন্মগ্রহণের সাক্ষী এই কাক।

কাকতালীয়

‘কাকতালীয়’—এটি একটি বহুলপ্রচলিত শব্দ। মানুষ কথায় কথায় প্রায় সময় বলেন কাকতালীয়। শব্দটির অর্থ—আকস্মিক যোগাযোগজাত কোনো বিষয় বা ঘটনা, হঠাৎ ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনা বা বিষয়, কার্যকরণহীন দুটি ঘটনা। কাক ও তাল থেকে কাকতালীয় বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। কিন্তু কাক ও তাল কেন? একটি কাক তালগাছের উপর বসল এবং বসামাত্র টুপ করে একটা তাল মাটিতে পড়ে গেল। কাকটি না-বসলেও তালটি পড়ত এবং তালটি না পড়লেও কাকটি বসত। কাকের মতো ছোট একটা পাখির তালগাছে বসার সঙ্গে তাল-পড়ার কোনো যোগসূত্র ছিল না এবং সংগতকারণে থাকতে পারে না। কিন্তু ঘটনাচক্রে তালের পতন ও কাকের বসা দুটোই একসঙ্গে ঘটে গেল। এটাই কাকতালীয়। আসলে প্রকৃত কারণ না-হলেও কোনো বিষয় বা ঘটনাকে অন্য কোনো বিষয় বা ঘটনার অনিবার্য কারণ বলে মনে করাকে বলা হয় ‘কাকতালীয়’।

শিক্ষক কাকতালীয় কী তা বুঝিয়ে দিয়ে ছাত্রকে বললেন এবার তুমি কাকতালীয় ঘটনার একটা উদাহরণ দাও।

ছাত্র বলল আমার বাবার বিয়ে হলো, সঙ্গে সঙ্গে আমার মায়ের বিয়েও!

কাকবলি

কাক + বলি = কাকবলি। কাককে দেয় বলি, কাককে দেয় অন্নাদি, কাককে দেয় নবান্নের অংশ প্রভৃতি। সম্ভবত

আগের যুগে দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞাকারী ফেরিওয়ালাকে কিছু পরিমাণ উৎপন্ন দিয়ে দিতে হতো। হয়তো দাম নিয়ে অথবা বিনামূল্যে। সে প্রদত্ত উৎপন্নকে বলা হতো কাকবলি। একসময় গ্রামাঞ্চলে বছরের একটা বিশেষ দিনে কাকের উদ্দেশ্যে রুটি, পিঠা প্রভৃতি গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়ে রাখার আচার প্রচলিত ছিল। বাচ্চারা নানা রকম ছড়াগান গেয়ে কাককে খাদ্যবস্তু ভক্ষণের জন্য ডাকত। এটাও কাকবলি। বর্তমানে এমন আচার আর দেখা যায় না।

কাক ভূষণ্ডী

'কাক ভূষণ্ডী' বাগভঙ্গির অর্থ দীর্ঘজীবী ব্যক্তি, বহুদর্শী অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রসিদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ কাক হতে বাগধারাটির উৎপত্তি। কাক ভূষণ্ডী বলতে আসলে 'ভূষণ্ডী'কেই বোঝায়। ভূষণ্ডী নিজেই কাক; সেখান থেকেই 'কাক ভূষণ্ডী'। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দীর্ঘজীবী ব্যক্তিকে কেন কাক বলা হবে? কারণ, পৌরাণিক এই কাকটির বিশেষত্ব হলো, সে আবহমানকাল জুড়ে বেঁচে আছে। আর সেই আদিকাল থেকে পৃথিবীতে আছে বলে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাই জানে। একবার নাকি কৃষ্ণ, ভূষণ্ডী মানে কাক ভূষণ্ডীকে জিজ্ঞেস করেছিল কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সম্পর্কে। তখন সে যা বলেছিল, সংক্ষেপে তা এরকম। সত্যযুগের শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধের সময় সে ছিল। কাকদের কাজই তো ময়লা-এঁটো খাওয়া। সেই যুদ্ধের সময়ও নিহত দৈত্যদের রক্ত-মাংস সে খেয়েছিল। তার একদমই কষ্ট হয়নি খেয়ে শেষ করতে। পরে ত্রেতাযুগে লঙ্কাযুদ্ধে সে-সব খেয়ে শেষ করতে তার একটু কষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবু সে তা সামলে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তার কষ্টের সীমা ছিল না।

কাণ্ডজ্ঞান

কাণ্ড + জ্ঞান = কাণ্ডজ্ঞান; কাণ্ড বিষয়ে জ্ঞান থাকে যাতে, কাণ্ডের বোধ, প্রকরণজ্ঞান, বিষয়বোধ, দেশকালপাত্রানুসারে বিষয়বিশেষের কর্তব্যাকর্তব্য-বোধ, common sense প্রভৃতি অর্থে প্রচলিত। 'কাণ্ড' শব্দের আর একটি অর্থ 'বাণ', কিন্তু সেটি বাণ নয়, ধন অর্থে প্রচলিত। এ ধন হলো সমাজের সকল রীতিনীতি বা আইনের ব্যবস্থা। তাকে জানলে সব জানা যায়, মানুষের 'কাণ্ডজ্ঞান' হয়। অনেকে বলেন, গাছের কাণ্ড থেকে শব্দটির উৎপত্তি। কোনো গাছের কাণ্ড পুরো গাছটি নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো গাছের কাণ্ড হাত দিয়ে মুঠো করে ধরতে পারলে তার শাখা-প্রশাখা সবই অধিকারীর এখতিয়ারে চলে আসে। তাই এর আর এক অর্থ হলো—অখণ্ড জ্ঞান। অখণ্ড জ্ঞানের অধিকারী হলেই সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করার যোগ্যতা অর্জিত হয়, খণ্ডজ্ঞানের অধিকারী কেবল শাখা বা প্রশাখার বিষয়ে ভাবতে পারে, তাই তার অনেক ত্রুটি হয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয় 'কাণ্ডজ্ঞানহীন'। তবে প্রশাখার জ্ঞানও মানুষের কাজে লাগে। তাকে বিশেষায়িত জ্ঞান বলা হয়। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে সে বিশেষায়িত বা প্রশাখাজ্ঞানও কোনো কাজে লাগে না, অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়ে যায়। একজন চক্ষু-বিশেষজ্ঞের যদি পুরো শরীর সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান না থাকে তা হলে তার প্রশাখাজ্ঞান (চক্ষু) রোগীর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ চক্ষু শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কানাঘুষা

'কানাঘুষা' শব্দের আভিধানিক অর্থ গোপন রটনা। এটি একটি মিশ্র শব্দ। বাংলা 'কান' ও ফারসি 'ঘুসা' শব্দের মিশ্রণে কানাঘুষা শব্দটির উৎপত্তি। ফারসি 'গুস' শব্দের অর্থও হচ্ছে কান। সুতরাং কানাঘুষা শব্দের অর্থ হয় কানকান। ব্যাখ্যা করলে যার অর্থ হয়—কান থেকে কানে। বাংলায় এরূপ আর একটি বাগভঙ্গি আছে। সেটি হচ্ছে কানাকানি। কানে কানে কথা বলাকে বলা হয় কানাকানি। এটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অর্থে ব্যবহার করা যায়। তবে কানাঘুষা কিন্তু কানে কানে কথা নয়, এটি নেতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। কোনো খারাপ ঘটনা গোপনে জনে জনে প্রচার ও আলোচনাকে কানাঘুষা বলা হয়। যেমন—নায়িকা তাঁর পরকীয়ার কানাঘুষা

অস্বীকার করলেন।

কারচুপি

'কারচুপি' শব্দের অর্থ ছিল কাপড়ের সূচিকর্ম—ফুলতোলা, লতাপাতা কাটা ইত্যাদি, জরির কারুকার্য, রেশমি কাপড়ে বা ভেলভেটে জরির সূচিশিল্প, গুলকারী। কিন্তু এখন কারচুপি শব্দের অর্থ যদি এগুলো বলা হয় তা হলে অনেকে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। এখন যদি কোনো বাংলাভাষীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কারচুপি শব্দের অর্থ কী? উত্তরে তিনি বলতে পারেন, 'চুপিচুপি কিছু করার ব্যাপার আছে যাতে সেটিই কারচুপি। 'কার' ও 'চুপি' দুটো শব্দ বাংলায় আছে। তবে এ দুটো শব্দ যুক্ত করে 'কারচুপি' শব্দ গঠন করা হয়নি। ফারসি 'কার্চোবি' শব্দের অর্থ থেকে কারচুপি শব্দের সৃষ্টি হয়েছে।

কারসাজি

'কারসাজি' শব্দের অর্থ—চালাকি, কূটকৌশল, কৌশলে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি। ফারসি 'কারসাজ' থেকে বাংলা কারসাজি শব্দের উৎপত্তি। ফারসি কারসাজ শব্দের মূল অর্থ ছিল কর্মসম্পাদনকারী, ভাঙাগড়ার নিয়ামক; এককথায় সৃষ্টিকর্তা। যিনি 'কারসাজ' করেন তিনি কারসাজি। বাংলায় ফারসি 'কারসাজি' বা 'সৃষ্টিকর্তা' চরম অর্থাবনতির কবলে পড়ে যে অর্থ ধারণ করেছে তা বিস্ময়কর মনে হলেও অনেকে এর পেছনেও সুন্দর যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। সৃষ্টিকর্তার কাজে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তিনি যখন ইচ্ছা গড়েন, যখন ইচ্ছে ভাঙেন। তাঁর কাছে কেউ হন লাভবান কেউ হন প্রবঞ্চিত। সে সর্প হয়ে দংশন করে আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ে—এটি এক ধরনের চালাকি, কূটকৌশল বা চাতুরী। হয়তো সৃষ্টিকর্তার এমন খামখেয়ালি চরিত্রই ফারসি 'কারসাজি' শব্দের অর্থাবনতির অন্যতম কারণ।

কালনেমি

কালনেমি রাবণের মাতুল। শক্তিশেলে হতচেতন লক্ষ্মণকে পুনর্জীবন দান করার জন্য হনুমান গন্ধমাদন পর্বত হতে ঔষধি আনতে গেলে, রাবণ মাতুল কালনেমিকে পথিমধ্যে হনুমানকে নিহত করার জন্য পাঠান এবং পুরস্কারস্বরূপ মাতুলকে অর্ধেক লঙ্কারাজ্য দান করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। হনুমানকে নিহত করার পূর্বেই কালনেমি লঙ্কার কোন অংশ গ্রহণ করবেন সেটি মনে মনে স্থির করে নেন। লঙ্কার ওপর রাবণ বা কালনেমির কোনো অধিকার ছিল না। হনুমান নিহত হবে তারপর লক্ষ্মণ প্রাণত্যাগ করবেন, অতঃপর লঙ্কা ভাগ। এরপরও লঙ্কা দখলে তাদের অনেক প্রতিপক্ষ এবং বাধা ছিল। তারপর হনুমান নিহত হওয়ার পূর্বে লঙ্কা ভাগ এবং কালনেমির লঙ্কার কোন অংশ নেবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত ছিল যেমন অবাস্তব তেমনি হাস্যকর। শেষ পর্যন্ত কালনেমি হনুমানকে নিহত করতে পারেননি, পক্ষান্তরে কালনেমি নিজেই হনুমানের হাতে নিহত হন। কালনেমির লঙ্কা ভাগের এ হাস্যকর সিদ্ধান্ত থেকে বাংলায় 'কালনেমির লঙ্কা ভাগ' প্রবাদটির উৎপত্তি।

কালাপাহাড়

'কালাপাহাড়' শব্দটির অর্থ—বিশাল ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক, প্রচলিত সংস্কার বা রীতিনীতি যিনি গ্রাহ্য করেন না, বিদ্রোহী প্রভৃতি। মূলত এ সকল অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। গৌড়ের সুলতান সুলায়মান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড়ের নাম থেকে কালাপাহাড় বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। কালাপাহাড়ের আসল নাম ছিল রাজু। জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইতিহাসে তিনি প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী হিসাবে পরিচিত। কৃষ্ণ বা কালো রঙের রাজুর শরীর ছিল পাহাড়ের মতো বিশাল। দূর থেকে দেখলে মনে হতো কালো পাহাড়। তাই তাঁর নাম হয় কালাপাহাড়। কথিত হয়, পূর্বে আসাম, দক্ষিণে উড়িষ্যা ও পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত কোনো দেবমন্দির

কালা পাহাড়ের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হতে রেহাই পায়নি। কালাপাহাড় পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা তৎকালীন হিন্দু সমাজের মনে গভীর রেখাপাত করে। কালাপাহাড়ের এ ঘটনা থেকে যে ব্যক্তি প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাসকে ধ্বংস করে তাকে কালাপাহাড় বলা শুরু হয়। আসামের অনেক অঞ্চলে কালাপাহাড় 'কালযবন' নামেও পরিচিত।

কালি

'কালি' শব্দের অর্থ—কালো রঙ, মসী প্রভৃতি। খালি চোখের সামনে কালো রঙের কিছু ভেসে উঠলেও আসলে কালি অর্থ শুধু কালো রঙের জিনিস বোঝায় না। লাল কালি, নীল কালি, হলুদ কালি, সবুজ কালি এমনকি সাদা কালিও কালির অন্তর্ভুক্ত। ছোটবেলার একটা ধাঁধা মনে পড়ে গেল। কালো কালি দিয়ে তুমি কি লাল লিখতে পারবে? হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম শিশুবেলায় প্রথম এ প্রশ্নটি শুনে। বাবা বলেছিলেন তোমার হাতের কালো রঙের কালি দিয়ে 'লাল' বানানটা লিখলেই তো হয়ে যায়! আবিষ্কারের প্রারম্ভে 'কালি' নামে পরিচিত লেখার তরলটি শুধু কালো রঙেরই হতো। অন্য কোনো রঙের ছিল না। তাই এর নাম হয়ে যায় 'কালি'। যদিও এখন নানা রঙের কালি আছে। তবু লেখার নিমিত্ত ব্যবহৃত তরলটি তার কালো নাম ঘোচাতে পারেনি। কলমের কালি ছাড়াও আর নানা রকম কালি আছে। যেমন—চুনকালি, কুলে কালি, মুখে কালি, বংশে কালি ইত্যাদি।

কালী

দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা। শাক্তরা কালীকে আদ্যাশক্তি বলে উপাসনা করেন। তাঁর চারটি হাত আছে। দুই দক্ষিণ হাতে খট্টাঙ্গ ও চন্দ্রহাস আর দুই বাঁ হাতে চর্ম ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড, দেহ বাঘের চামড়ায় আবৃত। দীর্ঘদমন্তী, রক্তচক্ষু, বিস্তৃত মুখ ও স্থূল কর্ণ। কালীর বাহন হচ্ছে মস্তকবিহীন শিব—যাকে এককথায় 'কবন্ধ' বলা হয়।

কালেভদ্রে

'কালেভদ্রে' শব্দের আভিধানিক অর্থ—কদাচিৎ, খুব অল্পকাল, অল্প সময়, মাঝে মাঝে প্রভৃতি। কালে ও ভদ্রে শব্দদ্বয়ের মিলনে 'কালেভদ্রে' বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। 'কাল' মানে সময় এবং 'ভদ্র' মানে ভালো, উচিত প্রভৃতি। সুতরাং ভদ্রকাল মানে ভালো সময়। লোকমুখে এটি উল্টে গিয়ে কালেভদ্রে কথায় স্থিতি লাভ করেছে। মানুষের জীবনে ভালো সময় খুব কদাচিৎ আসে। তাই কালেভদ্রে শব্দটির অর্থ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে 'কদাচিৎ' অর্থ ধারণ করে।

কাসুন্দি ঘাঁটা

'কাসুন্দি ঘাঁটা' বাগভঙ্গির অর্থ—পুরনো অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। 'কাসুন্দিকে ঘাঁটা' বাক্য হতে কাসুন্দি ঘাঁটা শব্দের উৎপত্তি। এবার কাসুন্দি কী দেখা যাক। কাসুন্দি রান্নায় ব্যবহৃত একটি অতিপরিচিত মসলাজাতীয় বস্তু। সরষে বাটা দিয়ে এটি প্রস্তুত করা হয়। এটি খাদ্যের গন্ধ ও স্বাদ বাড়ায়। কিন্তু কাসুন্দি যখন পুরনো হয়ে যায় তখন এর স্বাদ ও গন্ধ দুটোই অসহ্যকর ও খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। সুগন্ধের পরিবর্তে বের হয় প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। মুখরোচক ও সুগন্ধিময় কাসুন্দি পুরনো হয়ে গেলে যেমন দুর্গন্ধ ছড়ায় তেমনি মানুষের জীবনে কিছু ঘটনা বা কাহিনি থাকতে পারে যা উত্থাপন করলে কাসুন্দির মতো অসহ্যকর দুর্গন্ধের ন্যায় অনেক ভালো মানুষের জন্যও অনেক কিছু কষ্টকর হয়ে ওঠে। মূলত কাসুন্দির এ ব্যবহার থেকে 'কাসুন্দি ঘাঁটা' বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

কিংকর্তব্যবিমূঢ় = কিং (কিম = কী) + কর্তব্য (= করতে হবে) + বিমূঢ় [কী করতে হবে তা নিয়ে (বিমূঢ় = হতবুদ্ধি)]।

কিম সংস্কৃত শব্দ, অব্যয়; বাংলায় এর স্বাধীন ব্যবহার নেই; অন্য শব্দের আগে যুক্ত হয়ে প্রশ্ন, সন্দেহ, বিতর্ক, প্রয়োজনাভাব, নিষেধ, নিন্দা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে; আরও বোঝাতে পারে—কী, কে, কুৎসিত ইত্যাদি।

কিন্নর

'কিন্নর' শব্দের অর্থ কুৎসিত নর। কিন্নর দুই প্রকার। যথা শরীর মানুষের মতো এবং মুখ অশ্বের মতো; দ্বিতীয় প্রকার কিন্নর শরীর অশ্বের মতো কিন্তু মুখ মানুষের মতো। এদের অন্য নাম কিম্পুরুষ। এদের রাজা কুবের এবং এরা স্বর্গের গায়ক। ব্রহ্মার ছায়া হতে উৎপন্ন কিন্নরগণ কৈলাসে বিচরণ করেন।

কিম্ভূতকিমাকার

বিকট, ভয়ঙ্কর, অতি বিশ্রী, কদাকার, অদ্ভুত প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে 'কিম্ভূতকিমাকার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃতাগত বা সংস্কৃতরূপী শব্দ 'কিম্ভূত' ও 'কিমাকার' মিলে বাংলা 'কিম্ভূতকিমাকার' শব্দের গঠন। তবে 'কিম্ভূত' বা 'কিমাকার' শব্দের কোনোটাতে বিকট বা কুৎসিত কিছু নেই। 'কিম্ভূত' সংস্কৃত 'কিম ভূত' হতে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে—কী প্রকার/কিসের মতো/কী ধরনের ইত্যাদি। অন্যদিকে কিমাকারের সংস্কৃত রূপ হলো 'কিম আকার'। এর অর্থ—কী তার আকার। অথচ বাংলায় শব্দ দুটি মিলিত হয়ে কেমন কদাকার হয়ে গেল। মনে হয়, 'কিম্ভূত' বা 'কিম ভূত'-এর ভূত শব্দটা এ জন্য দায়ী। বাঙালিরা ভূতের ভয়ে এত তটস্থ থাকত যে, 'কিম ভূত'-এর কী প্রকার অর্থটিকে শেষ পর্যন্ত ভূতের মতো অদ্ভুত বানিয়েই ছাড়ল। এতগুলো শব্দ থাকাতেও কেন কিম্ভূতকিমাকার? আসলে শব্দটি তার অর্থের মতোই বিকট ও ভয়ঙ্কর। হয়তো এ জন্য বক্তা বিষয়ের বিদঘুটে অর্থটি এ কথার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চায়। সংস্কৃত 'কিম্ভূত' ও 'কিমাকার' শব্দ মিলে কিম্ভূতকিমাকার শব্দের উৎপত্তি। কিম্ভূত-এর ভূত 'কিমাকার' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভয়ঙ্কর অর্থদায়ক শব্দটির বিকাশ ঘটিয়েছে। সংস্কৃত কিম্ভূত শব্দের অর্থ—কিম ভূত বা কী প্রকার, কিসের মতো বা কী ধরনের। একইভাবে কিমাকারের সংস্কৃত রূপ হলো 'কিম আকার' বা কী আকারের। সুতরাং 'কিম্ভূতকিমাকার' শব্দের অর্থ হলো কিসের মতো ও কী ধরনের। কিন্তু বর্তমানে এ শব্দটির অর্থ বিকট, ভয়ঙ্কর প্রভৃতি। আদি অর্থের সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত অর্থের সম্পর্ক নেই। তবে মানুষ নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুকে প্রায় সময় ভয়ানক বা কুশ্রী ভাবে। সে অর্থে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে 'কী আকারের?' স্বাভাবিক উত্তর আসতে পারে কদাকার, ভয়ানক প্রভৃতি। পরশ্রীকাতর বাঙালিরা অন্যের সুখ-শান্তি সহ্য করতে পারে না। 'কিম্ভূতকিমাকার' শব্দের উৎপত্তি তারই ইঙ্গিত দেয়।

কিরাত

ভারতের পূর্বদিকে অবস্থিত পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসী বিশেষ। রামায়ণ অনুসারে কিরাত দ্বীপবাসী এবং অদগ্ধ মাংস ভক্ষণ করেন। পর্বতের গুহায় এবং পর্বতগাত্রে এঁরা বসবাস করতেন। প্রাচীন ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, এঁরা ভারতের আদি অধিবাসীদের অন্যতম।

কীর্তিকলাপ

'কীর্তিকলাপ' শব্দের অর্থ—যশোরাশি, কৃতিত্বের পরিচায়ক ভালো কাজ, কুকীর্তি প্রভৃতি। 'কীর্তি' ও 'কলাপ' এ দুটি শব্দ মিলে তৈরি হয়েছে কীর্তিকলাপ। 'কীর্তি' শব্দের অর্থ যশ, খ্যাতি, সম্মান, সুনাম প্রভৃতি। আর 'কলাপ' শব্দের অর্থ হচ্ছে ময়ূরের ছড়ানো পেখম। সুতরাং কীর্তিকলাপ শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হচ্ছে ময়ূরের পেখমের মতো সজ্জিত বিচিত্র রঙের কীর্তি। ময়ূরের পেখম সৌন্দর্য ও সম্মানের প্রতীক। তাই 'কীর্তিকলাপ' শব্দের মূল ও আদি অর্থ—ভালো কাজ, কীর্তিসমূহ, যশ প্রভৃতি। তবে কীর্তিকলাপ শব্দের সে আদি অর্থ এখন আর নেই। এখন কীর্তিকলাপ বলতে কুকীর্তিই বোঝায়। কুকীর্তি ময়ূরের পেখমের মতো সজ্জিত না-হলেও নিজস্ব সজ্জায়

যেমন বিচিত্র তেমন অন্য লোকের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। পত্রিকায় কোনো ব্যক্তিবিশেষের কুকীর্তি ছাপা হলে কাটতি বেড়ে যায় কিন্তু সুকীর্তি ছাপা হলে কেউ পড়ে না। বঙ্গদেশে মানুষ অন্যের প্রশংসা শুনতে আগ্রহী নয়, বদনাম বা কুকীর্তিসমূহ শুনতে আগ্রহী। এসব কারণে সংস্কৃত সুকীর্তি (কীর্তিকলাপ) বাংলায় এসে কীর্তিকলাপ (কুকীর্তি) অর্থ ধারণ করেছে।

কুক্ষিগত

'কুক্ষিগত' শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—কুক্ষিগত করা, দখল করে নেওয়া। সংস্কৃত 'কুক্ষি' শব্দ থেকে বাংলা 'কুক্ষিগত' শব্দের উৎপত্তি। 'কুক্ষি' শব্দের অর্থ—উদর, গর্ত ইত্যাদি। সুতরাং যা উদরে গত বা উদরে প্রবিষ্ট তাই কুক্ষিগত। এর মূল অর্থ— উদরগত, ভক্ষিত। যা খাওয়ার পরে হজম হয়ে গেছে তাই কুক্ষিগত। তবে বাংলায় শব্দটি মূল অর্থে প্রয়োগ হয় না। এটি অন্তর্নিহিত বা আলঙ্করিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'ক্ষমতা ও সম্পত্তি কুক্ষিগত করা' প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

কুপোকাত

'কুপোকাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ—পতন, ভূমিস্যাৎ, পর্যুদস্ত প্রভৃতি। কুপো ও কাত শব্দের সংযোগে কুপোকাত শব্দের সৃষ্টি। 'কুপো' শব্দের অর্থ পেট মোটা ও সরু গলাবিশিষ্ট পাত্র, যাতে সাধারণত তৈল রাখা হয়। কাত অর্থ হেলে পড়া বা মাটিতে ঢলে-পড়া। অতএব কুপোকাত শব্দের অর্থ তেলের পাত্র মাটিটে 'কাত' হয়ে পড়া। সুতরাং 'কুপোকাত' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় চিৎপাত, পরাজয়, বিনষ্ট, এলোমেলো, বিপর্যস্ত, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত প্রভৃতি। পাত্রের তেল মাটিতে গড়িয়ে পড়লে যেমন ভীষণ বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয় তেমনি কোনো ব্যক্তিবিশেষ কুপোকাত হলেও একই রকম করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কুবের

'কুবের' ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত ধনাধিপতি যক্ষরাজ। তিনি ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের পৌত্র এবং পৌলস্ত্য বা বিশ্রবার ও ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র। বিশ্রবার পুত্র বলে তাঁর আর এক নাম বৈশ্রবণ। কুবের মহাবনে গিয়ে দ্বিসহস্র বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার নিকট বর-লাভ করেন যে, তিনি অমর ও উত্তর দিগন্তের দিক্‌পাল এবং ধনাধিপতি হবেন। দেবতাদের সমান মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মা তাঁকে একটা পুষ্পক রথ দান করেন। তবে ব্রহ্মা তাঁর আবাসস্থান নির্দেশ না-করায়, তিনি নিজ পিতাকে বাসস্থান নির্দেশ করার অনুরোধ জানান। পিতা বিশ্রবা বিশ্বকর্মা-নির্মিত ত্রিকূট-শিখরে অবস্থিত লঙ্কাপুরীতে কুবেরের আবাসস্থল স্থির করেন। কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই রাবণ লঙ্কাপুরী অধিকার করতে চাইলে কুবের পিতার উপদেশ অনুযায়ী লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে কৈলাসে প্রস্থান করেন। ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী কুবের সমস্ত ধনের প্রদাতা ও অধ্যক্ষ। তিনি যক্ষ ও কিন্নরগণের অধিপতি ও দশ দিক্‌পালের অন্যতম। তাঁর দেহের গঠন খুব কুৎসিত ছিল। তাই তাঁর নাম হয় কুবের। তাঁর তিনটি পা ও আটটি দাঁত ছিল। কুবেরের স্ত্রীর নাম আহুতি। তাঁদের দুই পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব এবং এক কন্যা মীনাক্ষী। কুবের বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—ধনপতি, যক্ষরাজ, বৈশ্রবণ, রাক্ষসেন্দ্র, রত্নগর্ভ, কিন্নরেশ, পৌলস্ত্য, দিক্‌পাল, ত্র্যম্বকসখা, গুহ্যকেশর, ধনদ, নরবাহন, একপিঙ্গল প্রভৃতি। কুবেরের ধন থেকে বাংলায় 'ধনকুবের' শব্দের উৎপত্তি।

কুম্ভকর্ণ

'কুম্ভকর্ণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রচণ্ড ঘুমকাতুরে, যে খুব ঘুমাতে পারে, যাকে সহজে ঘুম থেকে জাগানো যায় না। তবে 'কুম্ভকর্ণ' শব্দের অর্থ যাই বলা হোক না কেন, 'কুম্ভকর্ণ' ছাড়া আর কোনো শব্দ দ্বারা এর অর্থকে এমন জীবন্ত ও স্পষ্ট-দ্যোতনায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কুম্ভকর্ণ ভারতীয় পুরাণের একটি চরিত্র। তিনি ছিলেন

রামায়ণ মহাকাব্যে বর্ণিত খ্যাতিমান রাক্ষসরাজ রাবণের মধ্যম ভ্রাতা। কুম্ভকর্ণ একনাগাড়ে ছয় মাস ঘুমাতেন। মাঝে একদিন আহার করার জন্য জাগতেন এবং আহার শেষ হলে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়তেন। কুম্ভকর্ণ ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিশালী, প্রবল সাহসী ও কুশলী যোদ্ধা। তাঁর ভয়ে উপমহাদেশে দেবতা-দাবিদার বহিরাগতরা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ থাকতেন। তাই দেবতাগণ ষড়্যন্ত্র করে কুম্ভকর্ণের জন্য দীর্ঘ এ ভয়ঙ্কর ঘুমের ব্যবস্থা করেছিলেন।

দেবতাগণ কীভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিতে কুম্ভকর্ণকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা শোনা যাক। কুম্ভকর্ণ শুধু শক্তিশালী ছিলেন না, খেতেও পারতেন খুব। জন্মাবার পরপরই তিনি হাজারখানেক প্রজা গিলে ফেলেছিলেন। পরে তিনি ভাইদের সঙ্গে গোকর্ণ আশ্রমে তপস্যায় বসলেন। তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্টও করলেন। তারপর বর চাইলেন—অমরত্ব। দেবতারা ব্রহ্মাকে গিয়ে বললেন, কুম্ভকর্ণকে বর দিয়ে কাজ নেই। এমনিতেই ও যা খায়! ততদিনে কুম্ভকর্ণ প্রচুর রাক্ষস-প্রজা আর মানুষ তো বটেই, আরও খেয়ে ফেলেছে স্বর্গের সাতজন অপ্সরী, ইন্দ্রের দশজন অনুচর এবং অসংখ্য মুনি-ঋষি। ফলে ব্রহ্মা ওকে বর না দিয়েই চলে যান। বর পেয়ে অমর হয়ে গেলে তো ও ত্রিভুবন খেয়ে ফেলবে। বর না-পেয়ে অসন্তুষ্ট কুম্ভকর্ণ আবার কঠোর তপস্যায় বসে যান। সে তপস্যা এমন কঠোর ছিল যে, পুরো পৃথিবী ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুরো পৃথিবী পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার অবস্থা। ব্রহ্মা ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে ব্রহ্মা এক চাতুরীর আশ্রয় নিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকতে বললেন। ব্রহ্মা যখন কুম্ভকর্ণের কাছে বর জানতে চাইবেন, তখন কুম্ভকর্ণের বদলে সরস্বতীই বর চেয়ে বসবেন। ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের ঘরে গিয়ে বর শুনতে চাইলে কুম্ভকর্ণ বললেন, 'অনন্ত জীবন'। কিন্তু পূর্ব চাতুরী অনুযায়ী ঘাপটি মেরে থাকা সরস্বতী সেটাকে বদলে বানিয়ে দিলেন, 'অনন্ত নিন্দ্রা'। 'তথাস্তু' বলে ব্রহ্মাও নিশ্চিন্তে বর দিয়ে দিলেন। চৈতন্য আসার পর কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কৈফিয়ত চাইলেন। অবশেষে ব্রহ্মা নিজের ভুল বুঝতে পেরে বর একটু পাল্টে দিলেন—ছয় মাস পর পর একদিনের জন্য কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে। তবে অসময়ে ঘুম ভাঙলে অবশ্য কুম্ভকর্ণের মৃত্যুও হতে পারে।

'দেবতাগণ কারসাজি করে কুম্ভকর্ণের জন্য দীর্ঘ এ ভয়ঙ্কর ঘুমের ব্যবস্থা করেছিলেন'—এ কারসাজির কাহিনিটা বেশ চমকপ্রদ। কুম্ভকর্ণ যখন দেবতাদের রাজপদ ইন্দ্রাসন (দেবতাদের রাজার পদবি ইন্দ্র, ইন্দ্র কোনো ব্যক্তির নাম নয়) পাবার আশায় কঠোর তপস্যা শুরু করলেন, তখন দেবরাজ তাঁর মনের ইচ্ছা টের পেয়ে বাগদেবী সরস্বতীর শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিতে এসে কুম্ভকর্ণকে বললেন, তুমি কী চাও? সরস্বতী তখন কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় গিয়ে বসলেন, তাই কুম্ভকর্ণ 'ইন্দ্রাসন' উচ্চারণ না করে উচ্চারণ করল 'নিদ্রাসন'। ব্রহ্মাও বললেন 'তথাস্তু'। ব্রহ্মার বাক্য কখনই নিষ্ফল হয় না। দেবরাজ সরস্বতীর চাতুরীতে এভাবে এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন, কুম্ভকর্ণ হতে তাঁর সিংহাসন বাঁচল আবার নিদ্রার বর পাওয়ায় তাঁর দাপট থেকেও মুক্তি মিলল।

রাবণ-রামের যুদ্ধে পুরো লঙ্কা প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। তবু কুম্ভকর্ণ দিব্যি আরামে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলেন। লঙ্কা বীরশূন্য হয়ে পড়লে কুম্ভকর্ণের সহায়তা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় রাবণ বহু অনুচর ও সহস্র হস্তী দ্বারা ধাক্কা দিয়ে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। কুম্ভকর্ণের এ ঘুমকাতুরে ঘটনা হতে বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। অনেক লোক আছে যারা সংসারে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সবকিছু উপেক্ষা করে নির্বিকার থাকতে পারেন। বস্তুত এমন চরিত্রের লোকদের বোঝানোর জন্য 'কুম্ভকর্ণ' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

কুরুক্ষেত্র

'কুরুক্ষেত্র' শব্দটি সাংঘাতিক ঝগড়া, তুমুল কাণ্ড প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়। মহাভারতে বর্ণিত কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কুরুক্ষেত্র বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী, কুরুক্ষেত্রে একই বংশের কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে আঠারো দিনব্যাপী এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুলবিনাশী এ যুদ্ধ এতই ভয়াবহ ও নৃশংস ছিল যে, যুদ্ধ শেষে উভয় বংশে মাত্র দশজন জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত এ যুদ্ধের মতো ভয়াবহ

যুদ্ধ তৎকালে আর হয়নি। তাই কোনো পক্ষসমূহের ঝগড়ার ভয়াবহতা বোঝাতে এ বাগভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ১৮ দিনব্যাপী যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটি 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ' নামে পরিচিত। এমন ভয়াবহ যুদ্ধ সেকালে আর হয়নি। যুদ্ধ-শেষে উভয়পক্ষের মাত্র দশজন জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে সাত জন এবং তাঁরা হলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি। কৌরবপক্ষের তিনজন হচ্ছেন—কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা।

কুশপুত্তলিকা

'কুশপুত্তলিকা' হচ্ছে ঘাস দিয়ে তৈরি একপ্রকার পুতুল, কাপড় দিয়ে তৈরি একপ্রকার পুতুল। কুশ + পুত্তলিকা = কুশপুত্তলিকা। কুশ দিয়ে তৈরি হয় যে পুতুল সেটিই কুশপুতুল বা কুশপুত্তলিকা। কুশ অর্থ তৃণ। কুশ বা তৃণে বা শরপত্রে রচিত পুত্তলিকাই হচ্ছে কুশপুত্তলিকা। যার দাহ হয়নি বা মুখাগ্নি পর্যন্ত হয়নি এবং যার অস্থি পাওয়া যায়নি, তার দাহকার্যার্থ পর্ণনর বা কুশপুত্তলিকা দাহ করতে হয়। ইদানীং কুশপুত্তলিকা শব্দটি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত। এখন যাঁরা রাজনীতির দুনিয়াতে কুশপুতুল পোড়ান, তাঁরা যেমন জানেন না, এটি প্রাচীন মানুষের নিদান; তেমনি এখন যাঁরা লাল রঙকে প্রতিবাদের রং বলে মনে করেন তাঁরাও জানেন না, এটিও প্রাচীন মানুষেরই নিদান।

কুশাসন

একটা অদ্ভুত শব্দ—কুশাসন। এটা দুইভাবে গঠিত হতে পারে। কুশাসন = কু + শাসন, অর্থ খারাপ শাসন। আবার 'কুশাসন = কুশ + আসন', অর্থ কুশের বা খড়ের আসন। ধরুন কেউ বলল—'রাজার মানায় না কুশাসন/তবু করে থাকলেও বারণ।' এই কথার দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত, নিষেধ থাকলেও রাজা অন্যায় শাসন করেন, যা তাকে মানায় না, দ্বিতীয়ত, হাতি (বারণ) থাকা সত্ত্বেও রাজা খড়ের আসনে বসেন, যা তাঁকে মানায় না।

কূপমণ্ডূক

কূপমণ্ডূক শব্দের প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ—সীমাবদ্ধ জ্ঞানবিশিষ্ট, সংকীর্ণচিত্ত প্রভৃতি। 'কূপ' ও 'মণ্ডূক' শব্দের মিলনে 'কূপমণ্ডূক'। কূপ শব্দের অর্থ 'কুয়ো' ও 'মণ্ডূক' শব্দের অর্থ ব্যাঙ। সুতরাং কূপমণ্ডূক শব্দের অর্থ—কুয়োর ব্যাঙ। কূপমণ্ডূক অর্থাৎ কুয়োর ব্যাঙ সবসময় কুয়োর অতি ক্ষুদ্র আয়তনের স্বল্পপরিমাণ জলে বাস করে। ওখানে বাস করে সে মনে করে কূপই বিশ্ব, কূপই সব। কূপের বাইরে যে আরও নদী, সাগর রয়েছে এবং সেখানে সীমাহীন জলের অসীম সঞ্চয় রয়েছে সেটি তার ধারণার বাইরে। কুয়োর ব্যাঙের দৃঢ় বিশ্বাস, কুয়োর মধ্যে যা আছে তা নিয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এর বাইরেও যে আরও অগণিত প্রাণী রয়েছে, সুবিশাল মাটি জলে নক্ষত্ররাজির লীলা চলে নিয়ত—তা সে জানে না। কুয়োর সীমাবদ্ধ জল ও তার বাসিন্দাদের বাইরে চিন্তা করার শক্তিও তার নেই। এমন অনেক মানুষ আছে, তারা যা জানেন এবং দেখেছেন সেটার বাইরে আর কোনো ধারণা তাঁদের নেই। তাঁদের ধারণার চৌহদ্দি অত্যন্ত সংকীর্ণ। জীবন আর বিশ্বকে এমন মানুষ নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে বিচার করেন। এঁদেরকে কূপমণ্ডূক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

কৃপাণ

√কৃপ + আন (আনক)। এর অর্থ—যা ছেদনে সমর্থ, খড়্গ, অসি, করবাল, ছুরি, কাটারি ইত্যাদি। শব্দটি কীভাবে

প্রস্তুত হয়েছিল তা ঠিকভাবে জানা যায় না। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর মতে, কৃপণ যে নীতি গ্রহণ করেছিল, সে নীতিটার নাম হতে পারে কৃপাণ। কিন্তু তার সমর্থনে কোনো তথ্য তাঁরা পাননি। তাঁরা মনে করেন, যৌথসমাজের কোনো সদস্যকে কোনো কৃপণ যখন 'তুমি এ কাজ করে দিলে আমি এ বস্তু দেব'—এরূপ 'মজুরি' দেওয়ার পণ করত এবং তার ফলে সে সদস্য যৌথসমাজের কাজ ছেড়ে সে কৃপণের কাজ করতে লেগে যেত, তখন 'মজুরি' স্বরূপ বস্তুকে কৃপাণ বলা হতো। যেহেতু যৌথসমাজ থেকে সে সদস্য কৃপণতার কারণে ছিন্ন হয়ে যেত। সে কারণে, যা ছেদনে সমর্থ তাকে কৃপাণ বলা হতো। পরে এ অদৃশ্য কৃপাণের বাহ্যিক উদাহরণ হয়ে যায় খড়্গ বা কাটারি।

কৃষ্ণচূড়া

√কৃষ্ + ন (নক), কৃ দিশাগ্রস্ত হয়ে নিঃশেষিত যাতে বা কেন্দ্রীভূত যাতে, কর্ষণজাত-এর রহস্যকরূপ থাকে যাতে বা যিনি প্রলয়ে বিশ্বকে নিজেতে আকর্ষণ করেন, অসিত, কালো, black অর্থে শব্দটি বহুল প্রচলিত। কৃ ও ষ বর্ণের অর্থ যোগ করলে যে ক্রিয়াটি পাওয়া যায়, তার স্বরূপ অনেকটা টর্চের আলোর বিপরীত স্বভাবের। টর্চের আলো ত্রিমাত্রিক শঙ্কু আকৃতির, যা টর্চ থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে প্রসারিত হয়। কিন্তু ঠিক বিপরীত যদি হয় তা হলে, প্রসারিত আলো বিপরীত মুখে ধাবিত হয়ে টর্চে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সত্তার প্রসারিত অংশ যদি তার নিজের কেন্দ্রের দিকে বিপ্রসারিত বা আকৃষ্ট হয়ে না-কৃত হতে হতে কেন্দ্রে বিলীন হয়ে যায় তাকে কৃষ্ণ বলে। তার অর্থ দাঁড়ায়, 'কৃষ'-এর না-করণ যাতে তাকে কৃষ্ণ বলে। এটিই চরম সত্য। কালো মানেই তো, যা সঙ্কুচিত হতে হতে বিন্দুতে পৌঁছে স্বরূপকে অনালোকিত করে ফেলেছে। এটিই আধুনিক বিজ্ঞান চিহ্নিত ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণগহবর—যা থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' অনুযায়ী, যিনি প্রলয়ে বিশ্ব আপনাতে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ; অর্থাৎ কালো/কাল বা ইংরেজিতে black। এই 'কাল'-এর ভেতরে স্থান-কাল-পাত্রের কল-কল পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। তাই সে কাল বা মহাকাল এবং কাল বা কালো; তাই সে কৃষ্ণ। তার থেকেই এ মহাবিশ্ব উৎসারিত। রূপের চোখে এ কৃষ্ণই নিরাকার। আধুনিক বিজ্ঞানও বলে, সকল রঙের অনুপস্থিতিই হচ্ছে কৃষ্ণ। এ কালো থেকে আকারবিশিষ্ট বিশ্বজগতের উদ্ভব। এ কালোই বাংলাভাষীর কাছে 'কালো, গুণে আলো'। পশ্চিমের ধারণাজগতে কালো মাত্রই মন্দ। কারণ, 'কালীকৃষ্ণ-শ্যাম-গৌর' এ তিনের মধ্যে তারা 'কালো'-র শুভ উত্তরাধিকার হতে চরমভাবে বঞ্চিত। তাই তাঁদের Devil বা শয়তান কালো। শেকসপিয়রের যুগের নাট্যকার ওয়েবস্টারের White Devil ব্যতিক্রম মাত্র। আমাদের কবি যখন বলেন, 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখি আলোর নাচন' তখন কালো কত রূপময় হয়ে ওঠে বাংলাভাষীর চোখে! কারণ কালোই যে জগতের আলো। এ জন্য চোখের মণি কালো, মাথার চুল কালো। জ্যোৎস্নাকে উপভোগ করা কী কৃষ্ণ-রাত ছাড়া সম্ভব? কৃষ্ণচূড়া গাছটি অপেক্ষাকৃত অধিক সবুজ, তাই কিছুটা কালো। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড গরমে চারদিক অসহ্য হয়ে ওঠে। তন্মধ্যে গাছটির চুড়োয় রক্তলাল ফুলগুলো কৃষ্ণগহবরের মতো সৃষ্টির উল্লাসে মণির মতো আলো এবং চুলের মতো সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে চারদিক আলোময় করে তোলে। রাতে কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলো সত্যি কৃষ্ণগহবরের মতো নিকষ হয়ে ওঠে। এ নিকষ কৃষ্ণই দিনের বেলাগাছের চুড়োয় রঙিন স্বপ্নে জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গরমেও দু দণ্ড শান্তির বারতা বয়ে আনে। তাই তো এটি কৃষ্ণচূড়া।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

ব্যাসদেবের অপর নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ব্যাসদেব দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় দ্বৈপায়ন। দ্বৈপায়ন একটি সমাসবদ্ধ পদ। যার সমস্তপদ হচ্ছে দ্বীপ হয়েছে অয়ন (আশ্রয়) যার। কুরুবংশীয় চেদিরাজ উপরিচরবসু মৃগয়াকালে স্ত্রী গিরিকাকে স্মরণ করে কামাতুর হয়ে স্খলিত শুক্র এক শ্যেনপক্ষীর মাধ্যমে স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে অন্য এক শ্যেনপক্ষীর আক্রমণে ওই শুক্র যমুনায় পতিত হয়। অদ্রিকা নামের মৎস্যরূপিণী ঋষি-শাপগ্রস্তা এক অপ্সরা সে শুক্র গ্রহণ করে গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং এক ধীবর কর্তৃক ধৃত হয়ে এক পুত্র ও

এক কন্যার জন্মদান করেন এবং শাপমুক্ত হয়ে আকাশপথে উধাও হয়ে যান। কন্যার গায়ে মাছের গন্ধ থাকায় নাম রাখা হয় মৎস্যগন্ধা। মৎস্যগন্ধা ধীবরের নৌকা পারাপার করত। একদিন পরাশর মুনি নদী পারাপারের সময় কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গম প্রার্থনা করে। উন্মুক্ত নদীবক্ষে সঙ্গমকার্যে রত হতে মৎস্যগন্ধা লজ্জাবোধ করলে, পরাশর মুনি নদীবক্ষে কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেন। অতঃপর পরাশর সত্যবতীর (মৎস্যগন্ধা) গর্ভসঞ্চার করেন এবং তপোবলে তাঁর গায়ের মৎস্যগন্ধ দূর করে সুগন্ধযুক্ত করেন। মৎস্যগন্ধা যমুনার তীরে এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন। দ্বীপ-জাত বলে এ পুত্রের নাম রাখা হয় দ্বৈপায়ন এবং কৃষ্ণবর্ণ ছিল বলে নাম হয় কৃষ্ণ। দুটো মিলে নাম হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ইনি মহাভারতের রচয়িতা।

কেওকেটা

কেওকেটা শব্দের অর্থ—তুচ্ছ, নগণ্য, যেমন-তেমন, গণ্যমান্য (ব্যঙ্গার্থে)। বিশেষণটির উৎপত্তি নিয়ে একটি মজার বিশ্লেষণ আছে। বলা হয় 'কে + ও + কে + টা' সংক্ষিপ্ত বাক্যটি হতে কেওকেটা শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ কে ও? কেটা? (ক্যাডা?)। প্রশ্ন-দুটোর ভাবভঙ্গি থেকে অনুমান করা যায়, যাকে নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে তিনি গণ্যমান্য লোক নন। অবশ্য বাগভঙ্গিটি দুইভাবে প্রয়োগ করা যায়। যেমন—'তিনিই তো এ শহরের কেওকেটা' বললে ব্যঙ্গার্থে বোঝায় তিনি শহরের গণ্যমান্য লোক। আবার যদি বলা হয় 'তিনি কেওকেটা কেউ নন', তা হলে বোঝাবে তিনি নগণ্য লোক।

কেল্লাফতে

কেল্লাফতে শব্দের অর্থ সিদ্ধিলাভ/বাজিমাত/সফলকাম। কোনো কঠিন কাজে সফলকাম হলে বাঙালিরা মহানন্দে এ শব্দটি ব্যক্ত করেন। আরবি শব্দ 'কিলআ' ও 'ফতৌ' শব্দ থেকে কেল্লাফতে শব্দটির উৎপত্তি। আরবি 'কিলআ' শব্দ থেকে এসেছে বাংলা 'কেল্লা', যার অর্থ দুর্গ। অন্যদিকে ফৌত থেকে এসেছে বাংলা ফতে। যার অর্থ জয়। অতএব, কেল্লাফতে শব্দের অর্থ—দুর্গজয়। দুর্গজয়ের যে আনন্দ সেটা 'কেল্লাফতে' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়।

কৈলাস

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একটি বিখ্যাত পর্বত। মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান। এটি মানস সরোবরের উত্তর-পশ্চিম দিকে হিমালয়ের চূড়ায় অবস্থিত।

কোজাগরী

শরৎকালের পূর্ণিমার রাত বৎসরের সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এ রাতে ধনসম্পদ, প্রাচুর্য, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী বিষ্ণুলোক হতে ধরায় নেমে আসেন এবং মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে 'কে জেগে আছ?' এই প্রশ্ন করেন (নিশীথে বরদা লক্ষ্মী কোজাগর্তিভাষিণী—অর্থ নিশীথে বরদাত্রী লক্ষ্মীদেবী 'কে জেগে আছ' বলে সম্ভাষণ করেন)। যিনি বা যাঁরা এই রাতে লক্ষ্মীব্রত করে জেগে থাকেন দেবী তাঁর কাছ থেকে সাড়া পান এবং তাঁর গৃহে প্রবেশ করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেন। কোজাগর বা কোজাগরী শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'কে জেগে আছ?' তবে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি এবং ওই তিথিতে অনুষ্ঠিত লক্ষ্মীপূজাকে যথাক্রমে কোজাগরী পূর্ণিমা এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বলে অভিহিত করা হয়।

মজা : লক্ষ্মী দেবী মর্ত্যে এলেন, প্যাঁচা আনন্দচিত্তে দেবীর সঙ্গে সঙ্গে সারা রাত কোলাহল করে বেড়াল। প্যাঁচা ভোরের আলো দেখে গাছের কোটরে ঢুকে পড়ে এবং কাঠঠোকরা আলো দেখে গাছের কোটর হতে বেরিয়ে আসে। দেবী কাঠটোকরাকে দেখে ভাবলেন ইনিই তিনি, যিনি সারা রাত তাঁর আগমনে কোলাহল করে বেড়িয়েছেন। খুশি

মনে চমৎকার এক মুকুট তুলে দিলেন কাঠঠোকরার মাথায়। জন্ম হলো চাকমা প্রবাদের—"প্যাঁচায় কুড়কুড়ায়, খোড়ইল্যা সোনার তুক পায়।"

কোলাব্যাঙ

কোলাব্যাঙ একধরনের ব্যাঙ বিশেষ। এটি উভচর। পেট মোটা আকারের সামান্য বড় ব্যাঙকে কোলাব্যাঙ বলে। কোলা ও ব্যাঙ এ দুটো শব্দের মিলনে কোলাব্যাঙ শব্দের উৎপত্তি। 'কোলা' ফারসি শব্দ। এর অর্থ—ডোবা, ছোট পুকুর, অগভীর জলাশয়। কোলাব্যাঙ সাধারণত অগভীর জলাশয় বা ছোট পুকুরে বাস করে। তাই এর নাম 'কোলাব্যাঙ'। আর এক ধরনের ব্যাঙ আছে যা দেখতে কুৎসিত, চলফেরাতেও তেমনি। এর নাম কুনোব্যাঙ, গ্রামাঞ্চলে স্যাঁতসেঁতে ঘরের মেঝের কোণে এদের পাওয়া যায়। ঘরের কোণে বসবাস করে বলে এদের নাম 'কুনো ব্যাঙ'।

কৌমদকী

'কৌমদকী' ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একটি বিখ্যাত অস্ত্র। অগ্নির দেওয়া কৃষ্ণের গদা কৌমদকী নামে পরিচিত। খাণ্ডবদাহনকালীন অগ্নি বরুণের নিকট সবিনয় অনুরোধের ফলে কৃষ্ণার্জুনকে যে সকল অস্ত্র দেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণকে কৌমদকী গদা ও সুদর্শনচক্র দান করেন।

কৌশল

'কৌশল' শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—কুশলতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য, ফন্দি, ছল, চাতুর্য, কারিগরি ইত্যাদি। 'কুশল' শব্দ থেকে কৌশল শব্দের উৎপত্তি। তবে বাংলা ভাষায় কুশল শব্দ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, কুশল বলতে বোঝায় নিপুণ, দক্ষ, বিচক্ষণ প্রভৃতি। 'কৌশল' শব্দ থেকে কুশলী ও কৌশল শব্দের উৎপত্তি। অন্যদিকে 'কুশল' শব্দের আরেক অর্থ হলো মঙ্গল, শুভ, কল্যাণ প্রভৃতি। তবে সংস্কৃতে 'কুশল' শব্দটি বাংলার মতো দু-রকম অর্থ বহন করে না। সংস্কৃত 'কুশল' শব্দটি 'কুশ' শব্দ হতে এসেছে। কুশ একজাতীয় তৃণ বা ঘাস। এটি অতি চিকন ও ধারালো এবং মাটির সঙ্গে শেকড় দিয়ে শক্তভাবে লেপ্টে থাকে। মাটি থেকে উত্তোলন করতে গেলে হাত কেটে যায়। যে হাতকে অরক্ষিত রেখে দ্রুত 'কুশ' উত্তোলন করতে পারে সে হচ্ছে 'কুশ' এবং কার্যক্রম বা ভাবটা হচ্ছে কৌশল। আবার অন্যদিকে 'কুশ' তৃণটি পবিত্র বিবেচনায় যজ্ঞ ও পূজা-পার্বণের অনিবার্য উপকরণ। এ কারণে 'কুশ' শব্দটি বাংলায় পবিত্র, মঙ্গল, কল্যাণ প্রভৃতি অর্থ পেয়েছে। তাই কুশল কথাটির অর্থ হয়েছে—কুশযুক্ত অর্থাৎ পবিত্র, শুভ, কল্যাণযুক্ত ও মঙ্গলময়।

কৌস্তভ

সমুদ্রমন্থনের সময় উত্থিত মহামূল্য উজ্জ্বল মণি-বিশেষ। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এই মণি বক্ষে ধারণ করতেন।

ক্যাঙারু

অনেকদিন আগের কথা। বর্তমানে 'ক্যাঙারু' নামে পরিচিত অস্ট্রেলিয়ার এ জন্তুটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে বনের প্রান্ত দিয়ে যাচ্ছিল। একজন পর্যটক স্থানীয় এক অস্ট্রেলীয় বনবাসীকে জিজ্ঞেস করেছিল : ওটা কী? বনবাসী উত্তর দিয়েছিল কাং গা রু। যার বাংলা অর্থ—আমি জানি না। প্রশ্নকর্তা মনে করল জন্তুটির নাম 'কাং গা রু'। তিনি তাঁর ডায়েরিতে জন্তুটির ছবি এঁকে পাশে লিখলেন—অস্ট্রেলিয়ার এ জন্তুটির নাম ক্যাঙারু (Kangaroo)। এভাবে অদ্ভুত-সুন্দর ও নিরীহ জন্তুটা ভাষার ফাঁদে পড়ে 'আমি জানি না' হয়ে যায়।

ক্রীড়নক

যে অন্যের অনুগত, বশংবদ, বাধ্য, পুতুল তাকে বলা হয় ক্রীড়নক। যে ক্রীড়নক সে অন্যের ইশারায় চলে, অন্যের ইশারায় বলে। শব্দটির আদি ও ব্যাকরণগত অর্থ—খেলার পুতুল। কিন্তু বাংলা ভাষায় এখন ক্রীড়নক বলতে খেলার পুতুল বোঝায় না। বরং খেলার পুতুল যেমন অন্যের ইচ্ছায় নড়েচড়ে, ওঠেবসে তেমন কোনো ব্যক্তি যদি অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাসের ন্যায় খেলার পুতুলের মতো আচরণ করে তাকে বলা হয় ক্রীড়নক। শব্দটিকে অনেকে লেখেন ক্রীড়ানক। এটি ভুল। অবশ্য আকার থাকলে শব্দটি এত দুরুচ্চার্য হতো না। 'খেলার পুতুল' শিশুদের কাছে যতই হেলাফেলার বস্তু হোক না কেন কিন্তু ক্রীড়নক শব্দটির উচ্চারণ সত্যি কঠিন।

ক্রোধ

'ক্রোধ' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ anger. নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোনো কিছু করার প্রবল ইচ্ছা, যা কিনা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় অতি তীব্র আকার নিয়েছে—সেটাও ক্রোধ। ক্রোধ শব্দটি 'কোপ, রোষ, রৌদ্ররসের স্থায়ী ভাব, ষড়রিপুর দ্বিতীয়, লোভ ও নিকৃতির পুত্র' অর্থেও প্রচলিত। ভাগবত মতে ক্রোধ লোভের পুত্র। তিনি নিজের বোন হিংসাকে বিয়ে করেন। তাঁদের পুত্রের নাম কলি, কন্যার নাম দ্বিরুক্তি। সত্যযুগ গত হওয়ার সময় অতি ধনসম্পদ গ্রহণ ও গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হওয়ায় তাদের শরীর গুরুভার হয়েছিল। শরীরের গুরুভার হওয়ায় শ্রান্তি, শ্রান্তিবোধ হতে আলস্য; আলস্য হতে ধন সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চয়েচ্ছা হতে প্রতিগ্রহ এবং প্রতিগ্রহ হতে লোভের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। অতঃপর ত্রেতাযুগ আরম্ভ হলে, লোভ হতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হতে মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা হতে 'কাম ক্রোধ অভিমান দ্বেষ পরুষতা অভিঘাত ভয় তাপ শোক চিন্তা ও উদ্বেগাদি'র প্রাদুর্ভাব হয়েছিল।

ক্ষণ

খুব অল্প সময়, অবকাশ, মুহূর্ত প্রভৃতি অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। ক্ষণ-এর একটি নির্দিষ্ট হিসাব আছে। প্রাচীন হিসাবমতে, নিমিষের এক-চতুর্থাংশ সময়কে 'ক্ষণ' বলে। সে হিসাবে 'ক্ষণ'-এর স্থায়িত্ব হলো চার মিনিট। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে কালের সময়সীমা হচ্ছে ৪৮ মিনিট। কিন্তু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ক্ষণের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। বস্তুত অল্পসময় বোঝাতে 'ক্ষণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন—কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসব। এটি একটি অনির্দিষ্ট কিন্তু স্বল্পসময়-জ্ঞাপক শব্দ। কেউ যদি বলেন—আমি এক ঘণ্টার মধ্যে চলে আসব, বা ৪৮ মিনিটের মধ্যে চলে আসব, তা হলে এটি 'ক্ষণ' হবে না। ক্ষণ যেমন অনির্দিষ্ট তেমনি তার ব্যবহারও অনির্দিষ্ট। শব্দটি মূলত এতক্ষণ, খানিকক্ষণ, কিছুক্ষণ, বহুক্ষণ, অনুক্ষণ, ক্ষণস্থায়ী প্রভৃতি শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

খ

খই ফোটা/খৈ ফোটা

'খই ফোটা' বাগভঙ্গি দিয়ে অনর্গলভাবে অতিদ্রুত কথা বলা, বক্তৃতার মতো দ্রুত কথা বলা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করা হয়। 'খই' ও 'ফোটা' শব্দ দিয়ে 'খই ফোটা' বাগভঙ্গিটি গঠিত। 'খই'/'খৈ' ধান্যজাত একপ্রকার শুকনো ও সুস্বাদু খাদ্য। এ খই প্রস্তুত-প্রণালির কার্যক্রম থেকে বাগধারাটির সৃষ্টি। হাঁড়িতে বালু গরম করে তাতে ধান দিয়ে খই ভাজা হয়। তপ্ত বালিযুক্ত কড়াইতে ধান দিয়ে নাড়াচাড়া করলে তা অবিরাম শব্দে হাঁড়ির ভেতর ফুটতে থাকে। হাঁড়ির এ ধানকে কোনো অবস্থাতে সশব্দ ফোটা থেকে থামানো যায় না। ফুটতেই থাকে। এভাবে খই ফোটার কার্যক্রম ও ধরন থেকে বাংলা বাগধারা 'খই ফোটা'/'খৈ ফোটা'-র উৎপত্তি।

খয়ের খাঁ

'খয়ের খাঁ' বাগভঙ্গির আভিধানিক অর্থ—চাটুকার, চামচা প্রভৃতি। আরবি 'খায়ের' মানে শুভ আর ফারসি 'খাহ' মানে চাওয়া। এ-দুয়ে মিলে বাগধারাটি শুদ্ধার্থে বোঝায় 'শুভার্থী'। তবে বঙ্গদেশে নকল শুভার্থী বেড়ে গেলে 'খায়ের খাহ' হয়ে যায় 'খয়ের খাঁ' এবং বোঝাতে লাগল চাটুকার বা মোসাহেব। বাংলাদেশে এসব স্তাবকের মোসাহেবি আরও বেড়ে গেলে তুচ্ছার্থে 'খয়ের খাঁ' হয়ে গেল 'চামচা'।

খাণ্ডবদাহ

পাণ্ডবগণ যমুনা নদীর তীরে খাণ্ডবপ্রস্থে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। একদিন কৃষ্ণার্জুন যমুনায় জলবিহারের পর যমুনাতীরের খাণ্ডববনের সন্নিকট পানভোজনে রত ছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশে অগ্নি তাঁদের কাছে এসে খাণ্ডববন দগ্ধ করার জন্য তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে বারো বছর ঘি পান করে অগ্নিমান্দ্যে ভুগছিলেন তিনি। ব্রহ্মা তাঁকে বলেন যে, খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের চর্বি ভক্ষণ করলে তাঁর অজীর্ণ রোগ সেরে যাবে। খাণ্ডববন ইন্দ্রের প্রিয় ছিল। ইতঃপূর্বে অগ্নি সাতবার এ বন দগ্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ হাজার হাজার হাতি, শুন্ড ও নাগ মস্তকের সাহায্যে জলসিঞ্চন করে তার চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতেন। কৃষ্ণার্জুন অগ্নিকে সাহায্য করতে সমর্থ হন। তবে তাঁরা নিরস্ত্র বলে অগ্নি বরুণের নিকট থেকে অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, ক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে কৌমোদকী গদা ও সুর্দশনচক্র দান করেন। সশস্ত্র কৃষ্ণার্জুন ইন্দ্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খাণ্ডব দহনক্রিয়ায় সহায়তা করতে সক্ষম হন। এভাবে কৃষ্ণার্জুন ইন্দ্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খাণ্ডববন দহন করার কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে অগ্নিকে তৃপ্ত করেন। পনেরো দিন ধরে অগ্নি খাণ্ডববন দগ্ধ করে। বনে সকল প্রাণীর মধ্যে ময় নামক দানব, তক্ষক নাগের পুত্র অশ্বসেন ও চারটি মাত্র শর্ঙ্গক পক্ষী রক্ষা পায়। বাকি সব অগ্নির দহনে লয়প্রাপ্ত হয়।

খাণ্ডারনি

অতি বদমেজাজি, কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে প্রভৃতি। উপমহাদেশের প্রাচীন গীতপদ্ধতির অন্যতম হলো খাণ্ডারি গীতি। খাণ্ডারি গীতি থেকে ধ্রুপদের বাণী চতুষ্টয়ের অন্যতম খাণ্ডারবাণীর সৃষ্টি হয়েছে। মূলত এই খাণ্ডারবাণী থেকে বাংলা 'খাণ্ডারনি' শব্দের উৎপত্তি। খাণ্ডারি গীতি ও খাণ্ডারবাণী 'বীররস-প্রধান' এক বিশেষ গায়নভঙ্গি। এটি খুব উচ্চৈঃস্বরে নানা বীরভঙ্গিতে গাওয়া হয়। এ বীররসের আধিক্য যে নারীর মধ্যে থাকে, সে নারীকে পুরুষ তার আড়ালে খাণ্ডারনি বলে থাকে। তবে সামনে বলে মহারানি। বস্তুত কলহপ্রিয় ও ভীষণ উগ্রমেজাজের অধিকারী

মহিলাকে আড়ালে খাণ্ডারনি বলা হয়। সাধারণত নরম, দুর্বল ও ভদ্রস্বভাবের পুরুষের স্ত্রী খাণ্ডারনি হয়। কোনো পাষণ্ড পুরুষের স্ত্রী কখনো খাণ্ডারনি হতে পারে না।

খাপছাড়া

'খাপছাড়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ মিলহীন, বেমানান, অসংলগ্ন, অদভুত, উদ্ভট প্রভৃতি। 'খাপ' ও 'ছাড়া' শব্দের মিলনে 'খাপছাড়া' শব্দের উৎপত্তি। 'খাপ' অর্থ আবরণ। সুতরাং 'খাপছাড়া' অর্থ আবরণহীন। অনেক বস্তু বা বিষয় আছে যাকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয় বা আড়াল করে রাখতে হয়। নইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়-বস্তু অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, নষ্ট হয়ে যায়, উদ্ভট দেখায়। খাদ্য ঢেকে না-রাখলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তলোয়ার খাপে না ভরলে তো বহনকারীর সমূহ বিপদ থেকেই যায়। কিছু কিছু কথা আড়াল করে না-রাখলে অনেকের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে। আচরণের মধ্যেও কার্যকারণ ও পরম্পরা থাকতে হয়। এ সম্পর্ক বা পরম্পরাটি হলো কাজের বা আচরণের আবরণ। পোশাক সভ্য মানুষের একটি অনিবার্য খাপ বা আবরণ। যার আবরণ আবশ্যক তার আবরণ না-থাকলে তাকে খাপছাড়া, অসংলগ্ন, উদ্ভট ও বেমানান মনে হবে। আবরণ-আবশ্যক বস্তু বা বিষয় আবরণহীন হলে অসংলগ্ন, উদ্ভট ও বেমানান হয়ে যায়। বস্তুত এ বিষয় থেকে বাংলা 'খাপছাড়া' শব্দের উৎপত্তি।

খামচাখামচি

আঙুলের সব নখ দিয়ে আঘাত বা খোঁচা দেওয়া। আরবি শব্দ 'খমস' থেকে বাংলা খামচাখামচি শব্দের উৎপত্তি। খমস শব্দের অর্থ হলো পাঁচ। মানুষের একটি হাতে পাঁচটি আঙুল রয়েছে। পাঁচটি আঙুল দিয়ে আঘাত করা হলে আঘাতকারীর শরীরে পাঁচ আঙুলের দাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত এ পাঁচ আঙুল দিয়ে আঘাত করা এবং আঘাতকারীর শরীরের পাঁচ আঙুলের দাগ হতে বাংলা বাগভঙ্গি 'খামচাখামচি' শব্দের উৎপত্তি। খামচাখামচি ছাড়াও বাংলায় খামচা শব্দের আরও বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। যেমন—এক খামচা চিনি, পেট খামচানো প্রভৃতি। একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, পাঁচ আঙুল দিয়ে আঘাত বা খোঁচা না-দিলে তা কিন্তু খামচাখামচি হবে না। তবে একজন কিন্তু খামচা দিল একবার আর একজন কিছুই করল না অথবা শুধু একবার খামচা দিয়ে থেমে গেল—তা কিন্তু 'খামচা দেওয়া' হবে। খামচাখামচি হবে না। খামচাখামচি বহুবচনাত্মক শব্দ। তাই এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আবশ্যক।

খালি

বাংলায় 'খালি' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমটির অর্থ হচ্ছে বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র, কেবল, একমাত্র প্রভৃতি। আবার 'খালি' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে অনাবৃত, শুধুশুধু, রিক্ত, শূন্য ইত্যাদি। যেমন—আমি খালি কাজ করে যাই কোনো পারিশ্রমিক পাই না। চারদিকে খালি, কোথাও কিছু নেই। পাত্রটি খালি করা হলো। আবার বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র, কেবল, একমাত্র, ক্রমাগত ইত্যাদি অর্থ প্রকাশেও 'খালি' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। দ্বি-অর্থ প্রকাশক 'খালি' শব্দের কোনোটির মূল কিন্তু বাংলা নয়। দুটোই আরবি শব্দ। প্রথম 'খালি' শব্দটি আরবি ভাষা হতে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় মেহমান হয়ে এসেছে। দ্বিতীয় খালিও 'আরবি' হতে আগত। এটি আরবি 'খালিস' শব্দের পরিবর্তিত রূপ। আরবি ভাষায় যার অর্থ খাঁটি। আরবিতে খাঁটি লোক বলতে 'খালিস' লোক বলা হয়, কিন্তু বাংলায় তেমন বলা হয় না। এর অর্থ ও উচ্চারণ দুটোই পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র, কেবল প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খেই

খেই শব্দের আভিধানিক অর্থ—প্রসঙ্গ, ধারা, সূত্র, সন্ধান প্রভৃতি। 'খেই' শব্দের অর্থ সুতোর মুখ বা প্রান্ত। তাঁতে কাপড় বোনার সময় মাঝে মাঝে টানা বা পড়েনের সুতো আকস্মিক নানা কারণে কেটে যায়। কেটে যাবার পর তাঁতি কিন্তু থেমে থাকে না। খেই জোড়া দিয়ে আবার কাপড় বোনার কাজ শুরু করে। অনেক সময় তাঁতি সহজে খেই খুঁজে পায় না। খেই হারিয়ে গেলে তাঁতিকে পুনরায় কাপড় বোনার কাজ শুরু করতে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়। খেই না পাওয়া পর্যন্ত তাঁতি অস্থির হয়ে খেই খুঁজতে থাকে। কারণ এ খেই বা সূত্র ছাড়া পুনরায় কাজ শুরু করা সম্ভব নয়। কারণ খেই হচ্ছে তাঁতির কাজের সূত্র, ধারা ও সন্ধান। এ খেই দিয়ে তাকে কাজ শুরু করতে হয়। তাঁতির এ খেই বোনা কর্মকাণ্ড থেকে 'খেই' শব্দটি মানুষের বাগভঙ্গিতে উঠে এসেছে। মানুষ কথা বলে, কিন্তু অনেক সময় তাঁতির সুতোর মতো কথার সূত্র হারিয়ে ফেলে। অনেকে কথার সূত্র খুঁজে পায় আবার অনেকে সহজে পায় না। এটাও একপ্রকার 'খেই হারানো'।

খোশামোদ

'খোশামোদ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—চাটুকারিতা, তোষামোদ, স্তাবকতা প্রভৃতি। ফারসি 'খোশ আমাদ' কথা হতে বাংলা খোশামোদ শব্দের উৎপত্তি। খোশ আমাদ বাগভঙ্গির অর্থ স্বাগত, শুভাগমন। কারও আগমনকে স্বাগত জানাবার জন্য বলা হয় 'খোশ আমাদ'। এ 'খোশ আমাদ' বাগভঙ্গিটি বাংলার কবলে পড়ে 'খোশামোদ'-রূপে অর্থের চরম অবনতি ঘটিয়ে তোষামোদ ও চাটুকারিতার অর্থ ধারণ করে। অবশ্য এর কারণও রয়েছে। যাদের 'খোশ আমাদ' করা হয় তারা সবাই অর্থ কিংবা বিত্তে শক্তিশালী, জ্ঞান বা গরিমায় মহান। কিন্তু বাঙালিরা শব্দটিকে কোনোরূপ বাছবিচার ছাড়া ব্যবহার করেছেন। ক্ষমতাশীলদের সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু কিছু ব্যক্তি অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত শব্দটিকে যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করে। বাঙালিরা 'খোশ আমাদ' কার্যে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বেশ উদার। এর পেছনে যতটুকু না অমায়িকতা তার চেয়ে বেশি দেখা যায় পার্থিব লোভ। সামান্য পার্থিব বিষয়ের বিনিময়ে নিজের অস্তিত্ব বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অতিভক্তি চোরের লক্ষণের ন্যায় অনেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার মানসে যে যা নয় তারও অধিক স্তাবকতা করার স্বভাব বাঙালিদের মজ্জাগত অভ্যাস। এজন্য ফারসি 'খোশ আমাদ' কথাটি বাংলায় তার আসল অর্থ হারিয়ে আসল কার্যকরণ বিবেচনায় যথার্থ অর্থই ধারণ করেছে বলা যায়।

অষ্টম অধ্যায়
গ

গঙ্গার অনার্য নাম গাঙ

'গাঙ' শব্দের অর্থ নদী। একসময় 'গাঙ' বলে কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় বহুল-ব্যবহৃত 'গঙ্গা' বাংলা ভাষায় এসে ঐতিহ্য হারিয়ে 'গাঙ' হয়ে যায়। বঙ্গদেশ ছিল অনার্য-প্রধান অঞ্চল। কেউ কেউ বলেন, বঙ্গদেশের অনার্যরা যাতে উৎস থেকে প্রবাহিত পবিত্র গঙ্গার জলে স্নাত হয়ে সহজে পুণ্য লাভ করতে না-পারেন সেজন্য আর্যরা বঙ্গদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গাকে 'গাঙ' বানিয়ে দেন। যা থেকে 'গাঙ' শব্দের উৎপত্তি।

গজকচ্ছপ

ভারতীয় পুরাণ মতে, বিভাবসু নামের একজন কোপনস্বভাব মহর্ষি ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক পিতৃসম্পত্তি বিভাজন করার জন্য বারবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পীড়াপীড়ি করায় বড় ভাই ক্ষুব্ধ হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অভিশাপ দেন 'তুমি হস্তী হয়ে যাও'। কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীকও অভিশাপ দেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'তুমি কচ্ছপ হও।' দুই ভাই একই পুকুরে দীর্ঘদিন ঝগড়ারত থাকেন। গরুড় অমৃত আনয়নের জন্য যাত্রাকালে পিতার পরামর্শে গজকচ্ছপকে তুষারাবৃত এক পর্বতশৃঙ্গে নিয়ে আরামে ভোজন করেন। এভাবে ঝগড়ারত দু-ভাই ধ্বংস হয়ে যায়।

গড্ডলিকা প্রবাহ

গড্ডল = মেষ, ভেড়া, গাড়ল, গড্ডল + ইক + আ = গড্ডলিকা। অর্থ— ১. এক মেষের অনুবর্তী মেষদল (কাঁচা ভাষায়— ভেড়া/ভেড়ীর পিছে ভেড়া/ভেড়ীর পাল) ২. মেষপালের সর্বাগ্রবর্তিনী ভেড়ী। গড্ডলিকা প্রবাহের সরলার্থ হচ্ছে ভেড়ার পালের মতো অনুকরণ/অনুসরণ বা ভালো-মন্দ না-বুঝে অন্ধ অনুকরণ/অনুসরণ। গতানুগতিক, ভালো-মন্দ না-বুঝে অন্ধের মতো অন্যকে অনুকরণ/অনুসরণ প্রভৃতি অর্থে বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়। গড্ডল শব্দের অর্থ হলো মেষ বা ভেড়া। 'গড্ডল' শব্দ থেকে গড্ডলিকা শব্দের উৎপত্তি। গড্ডলিকা শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হচ্ছে—ভেড়ার পালের মধ্যকার অগ্রবর্তিনী স্ত্রী ভেড়া। সুতরাং গড্ডলিকা শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ দাঁড়াচ্ছে স্ত্রী ভেড়ার পেছনে পেছনে চলা ভেড়ার দল। এরূপ ভেড়ার ন্যায় কিছু মানুষ আছে যারা ভালোমন্দ বিবেচনা না-করে অন্যকে অন্ধ অনুকরণ করে। এমন লোকের কোনো স্বকীয়তা বা ব্যক্তিত্ব থাকে না। এরা গড্ডলিকা প্রবাহে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়। এমন লোকদের প্রকাশের জন্য 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারাটি সত্যিকার অর্থে অসাধারণ। এ রকম আর একটি শব্দ আছে। সেটি হচ্ছে ভেড়ুয়া, কিন্তু শব্দটি কিঞ্চিৎ অমার্জিত।

গণেশ

ভারতীয় পুরাণ মতে, গণেশ একজন দেবতা। তিনি শিব ও পার্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। গণেশ সফলতাদায়ক সিদ্ধিদাতা। তাই সকল কর্মের সূচনায় সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা করা হয়। গণেশের জন্মবৃত্তান্ত বেশ চমকপ্রদ। দীর্ঘকাল পর বিষ্ণুর বরে পার্বতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবতারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল প্রভৃতি হতে নবজাতককে দেখার জন্য ছুটে আসেন। শনিও এসেছিলেন। তবে শনি শিশুর দিকে তাকাচ্ছিলেন না। পার্বতী বারবার শনিকে অনুরোধ করছিলেন তাঁর শিশুপুত্রের মুখ দেখার জন্য। তখন শনি বললেন "আমি চিত্ররথের কন্যাকে বিবাহ করি। একদিন আমার স্ত্রী ঋতুস্নান করে আমার সঙ্গম প্রার্থনা করেন। তখন আমি এমনই ধ্যানমগ্ন ছিলাম যে, স্ত্রীর কথা রাখতে পারিনি। ঋতু বিফলে যাওয়ায় স্ত্রী আমাকে অভিশাপ দেন যে, আমি যার দিকে দৃষ্টিপাত করব সে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে।" সকল বিবরণ শুনেও পার্বতী নবজাতককে দেখার জন্য শনিকে অনুনয় করছিলেন। নিরুপায় শনি নবজাতকের দিকে দৃষ্টিপাত করামাত্র নবজাতকের মস্তক দেহচ্যুত হয়ে

মাটিতে পড়ে যায়। বিষ্ণুর কাছে এ দুঃসংবাদ পৌঁছলে তিনি প্রতিকার করার জন্য বাড়ির দিকে আসতে থাকেন। পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত হস্তীকে দেখে সুদর্শনচক্রের মাধ্যমে তার মুণ্ড কেটে নিয়ে গণেশের গলায় লাগিয়ে দেন। হস্তীর মুণ্ডের কারণে যাতে গণেশ কারও কাছে অনাদৃত না হন, সে জন্য দেবতারা নিয়ম করে দেন যে, প্রথমে গণেশের পূজা না-হলে তাঁরা কেউ কোনো পূজা গ্রহণ করবেন না। তাই প্রত্যেক দেবকার্য ও পিতৃকার্যে গণেশের পূজা প্রথমে করা হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লেখ আছে, শিবের প্রতি কশ্যপের অভিশাপের কারণে গণেশের মুণ্ডচ্ছেদ হয়। পরে ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর মস্তক গণেশের গলায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। স্কন্দপুরাণ মতে, পার্বতী গণেশকে গর্ভধারণের অষ্টম মাসে সিন্দুর নামের এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে প্রবেশ করে গণেশের মস্তক কর্তন করেন। জন্মের পর নারদ গণেশের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে গণেশ মস্তকচ্যুত হওয়ার কারণ বর্ণনা করেন। নারদ গণেশকে নিজেই নিজের মস্তক সংগ্রহ করার পরামর্শ দেন। শিশু গণেশ তখন আপন তেজে গজাসুরের মাথা কেটে নিজের দেহে যুক্ত করে নেন। সে হতে গণেশের নাম হয় 'গজানন'।

গৎ বাঁধা

শব্দটির আভিধানিক অর্থ—নিয়ম বাঁধা, রুটিনমাফিক, একই প্রকার, অভিন্ন রকম, গতানুগতিক প্রভৃতি। এটি একটি সংগীতসম্পৃক্ত শব্দ। ভারতীয় সংগীতে শব্দটির বহুল প্রচলন লক্ষণীয়। 'গৎ' শব্দের মূল অর্থ হলো—বাজনার বোল। বোলের ওপর নির্ভর করে যন্ত্র বাজানোর উপযোগী ছন্দোবদ্ধ সংগীতই হলো 'গৎ'। 'গৎ' খেয়াল গানের অনুকরণে রচিত একটি সংগীত কৌশল। 'গৎ'-এর মাধ্যমে ধীরগতি ছন্দের খেয়াল চয়নের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এ নিয়ম সর্বত্র অভিন্ন এবং এর মাধ্যমে পুরো সংগীত অভিন্নভাবে পরিচালিত হয়। গানের এ নিয়মবদ্ধ রীতিটি মানুষের নিয়মবদ্ধ গতানুগতিক প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি ও অভিন্নতা প্রকাশে ব্যবহার করা হয়।

গন্ধমাদন

শব্দটির অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। গন্ধ + মাদন, যা গন্ধে মাদয়িত (মত্ত) করে বা গন্ধ যার মাদয়িতা, গন্ধ দ্বারা মাদয়িতা, সুগন্ধি বন-যুক্ত পর্বতবিশেষ, এটি ইলাবৃত ও ভদ্রাশ্ব বর্ষের সীমাপর্বত এবং মেরুর পূর্বে অবস্থিত, ভ্রমর, রামসৈন্যস্থ বানরবিশেষ, গন্ধমাদনস্থ বনবিশেষ; হিমালয়ে স্বর্ণময় ঋষভ পর্বত ও কৈলাস পর্বতের মধ্যস্থিত দীপ্তিমান ঔষধি পর্বত। এ পর্বতের শীর্ষদেশে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী—এ চার প্রকার মহৌষধি জন্মাত। হনুমান রাম-রাবণের যুদ্ধকালে দুইবার ঔষধি পর্বত উৎপাটন করে নিয়ে এসেছিলেন। প্রথমবার ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ করে রাম-লক্ষমণ শল্যমুক্ত হন ও বানরেরা সুস্থ হয়। পরে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে মৃতপ্রায় হলে হনুমান ঔষধি চিনতে না-পেরে পুরো ঔষধি-শৃঙ্গ তুলে নিয়ে আসেন। এ ঔষধি মৃতকল্পকে জীবন দান করে। ঔষধি বৃক্ষের গন্ধ সবাইকে মত্ত করে দেয়, তাই এ পর্বতের নাম গন্ধমাদন। সেকালের বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হতো হিমালয়। এ রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতর যত বিভাগ ছিল, সেগুলোকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল। তারই একটি গন্ধমাদন। এটি সম্ভবত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যকার ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা। এটাকে একেবারে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে হলে, ১০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন ছিল, তার কী কী বিভাগ ছিল, সেসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা দরকার।

গন্ধর্ববেদ

ভারতীয় পুরাণে সংগীতশাস্ত্রকে 'গন্ধর্ববেদ' এবং সংগীতবিদ্যাকে 'গন্ধর্ববিদ্যা' বলা হয়। এখনও সংগীতশাস্ত্র গন্ধর্ববেদ নামে পরিচিত।

গন্ধর্বলোক

গুহ্যকলোকের উপরে কিন্তু বিদ্যাধরলোকের নিচে অবস্থিত একটি স্থান। এখানে দেবগায়ক গন্ধর্বগণ বসবাস করেন। গন্ধর্বলোক সর্বদা সংগীতের অনুপম মূর্ছনায় বিমোহিত থাকে।

গবেষণা

গো + এষণা = গবেষণা। সাধারণ অর্থে 'গো' মানে গরু এবং 'এষণা' মানে অনুসন্ধান, অন্বেষণ, আবিষ্কার, বাসনা, কামনা, ইচ্ছা ইত্যাদি। এটি ইংরেজি research শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। তা হলে গরু অনুসন্ধান বা গরু খোঁজাই কী বাংলায় গবেষণা! কিন্তু কেন? গবেষণা শব্দটির বিশ্লেষণ অর্থ করেছে গো + এষণা, গতিশীল বিষয় ও বস্তু সম্পর্কে দিশাগ্রস্ত জ্ঞানের আহরণ থাকে যাতে, অনুসরণ, অনুসন্ধান, অন্বেষণ, তর্কাদি দ্বারা যথাবোধিত ধর্মাদির অন্বেষণ, বিচারণ, বিষয়বিশেষের তত্ত্বান্বেষণ, ইংরেজি research প্রভৃতি। বস্তুত রিসার্চ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে গবেষণা শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। অনেকে বলেন ইংরেজি research বোঝাতে বাংলায় যে 'গবেষণা' শব্দ ব্যবহার করা হয় তাতে 'গো' বা 'গরুর' প্রাদুর্ভাব কেন? এ প্রশ্নটি একটি বিষয়কে পরিষ্কার করে দেয় এবং সেটি হলো, বাংলা 'গবেষণা' যে বিশাল অর্থ ধারণ করে ইংরেজি 'research' তার সামান্য অংশ মাত্র। উভয়ের মিল হচ্ছে দুটোই দিশাগ্রস্ত জ্ঞানীর খোজাখুঁজি এবং অমিল হলো 'research' যেখানে 'পুনরায় খোজাখুঁজি' মাত্র, গবেষণা সেখানে যে কোনো গাভীর বা 'গো'-এর অর্থাৎ গতিশীল বিষয় ও বস্তুর বিষয়ে অনুসন্ধান। এ বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিসার্চ স্কলার'কে ডক্টর বলা যেতে পারে, কিন্তু আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথের মতো 'গো-গণ' বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানীদের গোস্বামী বলাই সমীচীন।

গরিবের উঠোনে হাতির পা

বাগভঙ্গিটির অর্থ—অপ্রত্যাশিত কোনো বিষয় বা বস্তুর প্রাপ্তি, দুর্লভ কোনো ব্যক্তির আগমন। বাক্যটি একটি প্রবচন, হাতি উপমা। হাত + ই = হাতি, যার হাত আছে। হাতের মূলে হস্ত, তাই হাতির মূলেও হস্তী। বাংলায় 'গরিবের উঠোনে হাতির পা' বাগভঙ্গির অর্থ হচ্ছে অপ্রত্যাশিতভাবে বিশেষ কোনো ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত স্থানে আগমন। এই একটি বাক্য ব্যতীত হাতি বলতে একটি পশুকে বোঝানো হয়। কিন্তু হিন্দি, উর্দু, পশতু ও নেপালি-ভাষায় হস্তী সবসময় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। হস্তী যেমন বিলুপ্তপ্রায়, হস্তীর পশুত্বও তেমনি। তাই হয়তো তারা হস্তী বলতে প্রভাবশালী, ধনবান, জ্ঞানবান ব্যক্তিকেই বোঝায়।

গরুড়পুরাণ

অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত সপ্তদশ পুরাণ। এখানে চিকিৎসাদি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবরণ রয়েছে। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম একটি বলে বিবেচিত হয়।

গরু মেরে জুতো দান

ইংরেজিতে To rob Peter to pay Paul বাগভঙ্গির অর্থ একজনের কাছ থেকে নিয়ে অন্যজনকে দেওয়া। তবে বাংলায় এর অর্থ 'গরু মেরে জুতো দান'। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডে ওয়েস্টমিনিস্টারের St. Peter Church-কে St. Peter's Cathedral-এ পরিণত করা হয়। এ সময় St. Paul's Cathedral-এর আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ, ক্যাথিড্রালটি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। এ দুরবস্থা কাটিয়ে তোলার জন্য St. Peter's Cathedral-এর ফান্ড থেকে অর্থ নিয়ে St. Paul's-এর আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়। এর থেকে এ প্রবাদটির জন্ম। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের প্রশাসনে এমন ব্যবস্থা দেখা যায়। দুর্বল প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য সরকার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থ প্রদান করে।

গলগ্রহ

বাগভঙ্গিটির অর্থ—অনভিপ্রেত বোঝা বা দায়িত্ব, পরের ওপর যা ভারস্বরূপ বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যার ভার নিতে হয়। গলগ্রহ প্রকৃতপক্ষে গলার এক প্রকার কঠিন যন্ত্রণাদায়ক রোগ। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক 'সুশ্রুত'-এর লেখায় দুশ্চিকিৎস্য এ রোগের বর্ণনা পাওয়া যায়। গলগ্রহ রোগে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির কোনো কিছু গলাধঃকরণ করা অতি কষ্টকর। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা কিন্তু গলার যন্ত্রণায় কোনো কিছু গেলা সম্ভব হয় না—এটাই 'গলগ্রহ' রোগের লক্ষণ। বস্তুত, এ অবস্থাটিই উপমাস্বরূপ বাগভঙ্গিটিতে ব্যবহার করা হয়। যাকে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না আবার ত্যাগ করাও সম্ভব নয়—এমন অবস্থা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ই হচ্ছে 'গলগ্রহ'।

গাঁটছড়া

'গাঁটছড়া' শব্দের অর্থ বর ও কন্যার বস্ত্র অন্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সংযোগপূর্বক বন্ধন/গাঁটছড়া' বাঁধা বর-বধূর ন্যায় দুজনের সতত সাহচর্য। গাঁটছড়া একটি প্রাচীন প্রথা। বৈদিক যুগের আগে সনাতন যুগ থেকে এ প্রথার প্রচলন। ফলে এর উত্তরাধিকার পৃথিবীর সকল জাতিতে কম-বেশি রয়েছে। তবে হিন্দু বিবাহে এ প্রথা এখনও স্পষ্টভাবে প্রচলিত। বর-কনের কাপড়ের খুঁট বা প্রান্ত দুটোকে বেঁধে দেওয়া বা গ্রন্থিবদ্ধ করা বা গিঁট দেওয়া হয় যে সংস্কারে তাকেই 'গাঁটছড়া' বলা হয়। বদ্ধ গিঁটকে গাঁট বলা হয়, তা হলে ছড়া কেন? বস্তুত বিয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্তান-সন্ততির সংখ্যা জলধারার মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাই বিয়ের গাঁটের সঙ্গে ছড়া শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে।

গান্ধার

পুরাণমতে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীর হতে আফগানিস্তানের অধিকাংশ এলাকা পুরাকালে গান্ধার দেশ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে কান্দাহার নামে পরিচিত স্থানটি প্রাচীন গান্ধার নগরী। ভারতীয় পুরাণের বিশেষ চরিত্র সুবল ছিলেন গান্ধার দেশের রাজা। সুবলের কন্যার নাম ছিল গান্ধারী। গান্ধার দেশের রাজকন্যা বলে নাম গান্ধারী। গান্ধারীর স্বামীই জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। এই গান্ধারীই হচ্ছেন দুর্যোধনাদির মাতা।

গারদ

'গারদ' শব্দের অর্থ কয়েদ, জেলখানা, কারাগার। ইংরেজি গার্ড (Guard) শব্দ থেকে বাংলা 'গারদ' শব্দের উৎপত্তি। গার্ড শব্দের অর্থ পাহারা, প্রহরী প্রভৃতি। থানার গারদেও গার্ড থাকে। জেলখানাতেও গার্ড থাকে। আবার পাগলাগারদেও গার্ড থাকে। গার্ডের কাজ পাহারা দেওয়া। গার্ডের চারিত্রিক অনুষঙ্গ থেকে বাংলা গারদ শব্দটি এমন অর্থ ধারণ করেছে। গারদে গার্ড থাকে। তাই ইংরেজি গার্ড থেকে আসা বাংলা গারদ অর্থটি বিচিত্র হলেও অযৌক্তিক নয়।

গীতা

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত অষ্টাদশ অধ্যায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। এ যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাঁদের বধ করতে হবে ভেবে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অর্জুনের সারথিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য যে উপদেশ দেন, সে উপদেশ-সমষ্টির সংকলনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলা হয়। এর প্রধান বক্তা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রোতা অর্জুন। এতে সাতশ শ্লোক আছে। তাই এর অপর নাম 'সপ্তশতী'।

গুলতানি

'গুলতানি' শব্দের আভিধানিক অর্থ—গালগল্প, গল্পগুজব, আড্ডা, অহেতুক গল্প, আষাঢ়ে গল্প প্রভৃতি। ফারসি

‘গুলতান’ শব্দ থেকে গুলতানি শব্দের উৎপত্তি। ফারসি গুলতান শব্দের অর্থ গড়াগড়ি দেওয়া, ঘুরপাক খাওয়া, গোলাকার বা পিণ্ডাকার কোনো বস্তুর গড়িয়ে চলা প্রভৃতি। তা হলে কেন গুলতান বাংলায় এসে গল্পগুজব বা আড্ডা হয়ে গেল? এর একটা সম্পর্ক ও হেতু রয়েছে। আড্ডায় যখন গালগল্প শুরু হয় তখন আড্ডায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকে হাসি বা আনন্দে উদ্বেল হয়ে গড়িয়ে পড়ে। এ গড়িয়ে পড়া অনেকটা ফারসি গুলতানের মতো। তাই ফারসি ‘গুলতান’ বাংলায় এসে গালগল্পের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

গেঞ্জি

মানুষের ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাসকে গেঞ্জি বলে। অভিধানে বলা আছে গেঞ্জি হচ্ছে যন্ত্রে বোনা সুতি জামা, যা পুরুষের দেহের ঊর্ধ্বাংশের অন্তর্বাস হিসেবে পরা হয়। ইংলিশ চ্যানেল ও ফ্রান্সের মধ্যিখানে ‘চ্যানেল আইল্যান্ডস’ নামের চারটি ছোট আকারের দ্বীপ রয়েছে। চারটি দ্বীপের মধ্যে একটির নাম গার্নজি এবং অন্যটির নাম জার্সি। খেলার সময় খেলোয়াড়দের পরিহিত ‘জার্সি’ নামের পরিধেয়টি জার্সি দ্বীপে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রস্তুত করা হয়। তাই এ পরিধেয়টির নাম হয় জার্সি। অন্যদিকে পুরুষদের পরিহিত ঊর্ধ্বাংশে পরিধেয় অন্তর্বাসটি ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে গার্নজি দ্বীপে প্রথম প্রস্তুত করা হয়। তাই এর নাম হয় গার্নজি। যা ক্রমান্বয়ে কিছুটা বিকৃত হয়ে ‘গেঞ্জি’ নামে স্থিতি পায়।

গোঁফখেজুরে

‘গোঁফখেজুরে’ শব্দটির মানে হচ্ছে—অলস। তো কেমন অলস? একটা পাকা খেজুর গোঁফের উপর পড়ে আছে তবু সেটি মুখের ভেতরে নেবার মতো শ্রম বা চেষ্টা করে না—এমন অলস! অন্যভাবে বলা যায়, আলস্যজনিত পরিচর্যার অভাবে গোঁফের অবস্থা এমন হয়েছে—খেজুর যে গোঁফের ভেতর আটকে আছে তা নিজে বুঝতেই পারছে না।

গো

গো অর্থ কী তা দেখা যেতে পারে। গম + ও (ডে), যে (কেউ) যায়, যে যায়; যার দ্বারা স্বর্গে যায়, গোজাতি, গরু, বৃষরাশি, সূর্য, চন্দ্র, গোমেধযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়, ঋষিবিশেষ, গায়ক, গৃহ, সংখ্যা, গোজাতি স্ত্রী, ধেনু, দিক, বাক, বাক্যাধিদেবতা, সরস্বতী, পৃথিবী, স্বর্গ, বজ্র, অম্বু, জল, আকাশ, রশ্মি, কিরণ, চক্ষু, বাণ, লোম, কেশ, গোসম্বন্ধী, দুগ্ধঘৃতচর্মাদি, গৃহপালিত পশু, সিংহ, cow অর্থে শব্দটি প্রচলিত। এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ‘যে যায়’ এবং প্রকৃত অর্থ হলো গ (= গামী), গি (গতিশীল গামী), গু (= নবরূপে উত্তীর্ণ গামী), গে (= দিশাগ্রস্ত গামী) প্রভৃতি সর্বপ্রকার গামীদের আশ্রয় যাতে থাকে সে হলো ‘গো’। তা সে অতি উচ্চমার্গের গো যেমন—সূর্য বা গোলকবাসী গোবিন্দ বা নারায়ণ থেকে অতি নিম্নমার্গের গো যেমন, গরু;—এদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে। কোনো ‘গো’-কে খালি চোখে দেখা যায় আবার কোনো ‘গো’-কে চোখ বন্ধ করে দেখতে হয়। যেমন—বাক কিংবা তত্ত্বকথা। কেউ মুহূর্তে বিশ্বের যেকোনো স্থানে যেতে পারে আবার কাউকে যতটুকু তাড়ানো হয় কেবল ততটুকু যেতে পারে। অর্থাৎ গতিশীল বস্তুমাত্র ‘গো’ পদবাচ্য। তবে cow-কে যে ‘গো’ বলা হতো তার কারণ ভিন্ন। সে অন্য জীবের মতো হেঁটে-চলে স্থানান্তরে যেতে পারত বলে তাকে ‘গো’ বলা হতো না। cow-কে ‘গো’ বলা হতো তার বিশেষ ‘গতিশীল’ ভূমিকার জন্য। এ জীবটাই মানবসভ্যতার হাতে পোষমানা প্রথম জীব, যা ‘প্রেরিত’ হতো, তা সে বিনিময়যোগ্য পণ্যরূপে হোক আর বিনিময়ের মাধ্যমরূপেই হোক। উভয় ক্ষেত্রেই সে ‘প্রেরিত’ হতো এবং ‘যেত’। তখন ‘গো’ উত্তম ও সম্মানজনক সম্পদ। ‘গো’ বৃদ্ধি করার অর্থই ছিল সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি ও সম্মান। অধিকন্তু ‘cow’-এর প্রথম ‘বিনিময়ের মাধ্যম’ হওয়ার যোগ্যতা ছিল। ‘gold money’ আবিষ্কারের পূর্বে ‘গো’-এর যে সে-ভূমিকা ছিল মহাভারতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এ ‘গো’ শব্দের উত্তরাধিকার ইংরেজিতে রয়েছে go রূপে, আভেস্তার gao,

ফারসির ‘গাও’ এবং চীনের ngo রূপে। অর্থাৎ ‘গো’ অর্থ—গতিশীল অনুসন্ধান, আবিষ্কার, শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান, মূল্যবোধ, অগ্রসর, উন্নতি কল্যাণ ও বিমূর্ততার চিরন্তন আধার।

গোগ্রাস

‘গোগ্রাস’ শব্দের অর্থ—বড় গ্রাস, ঘন ঘন গ্রাস। ‘গো’ ও ‘গ্রাস’ শব্দের মিলনে ‘গোগ্রাস’ শব্দের উৎপত্তি। ‘গো’ মানে গরু এবং ‘গ্রাস’ মানে লোক্মা বা একবারে যে পরিমাণ খাদ্য মুখে পোরা যায়। সুতরাং গোগ্রাস মানে গরুর লোকমা। গোগ্রাস শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ গরুর লোকমা হলেও শব্দটি গরুর খাদ্য বোঝাতে কেউ ব্যবহার করেন না। কোনো ব্যক্তি যখন অতি দ্রুত বেশি পরিমাণ খাদ্য মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি গিলতে থাকেন এবং গেলা শেষ হওয়া মাত্র আবার একই কায়দায় মুখে বড় গ্রাস ঢুকিয়ে দিতে থাকেন, তখন সেটাকে গোগ্রাস বলা হয়। বিভিন্ন কারণে মানুষকে গোগ্রাসে গিলতে হয়। প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে অনেক দিন পর উপাদেয় খাবার পেলে মানুষ গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে। আবার অনেকে খাদ্য তাড়াতাড়ি খেয়ে না-নিলে ভাগে কম পড়বে ভেবে এমনটি করে থাকেন। আবার কারও কারও অভ্যাসই হচ্ছে গোগ্রাসে গেলা। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে সময়ের অভাবের ফাঁদে পড়ে গোগ্রাসে গেলাটা অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অনিবার্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

গোড়ায় গলদ/বিসমিল্লায় ভুল

‘গোড়ায় গলদ’ ও ‘বিসমিল্লায় ভুল’ বাকভঙ্গি দুটোর অর্থ অভিন্ন, প্রয়োগ ও অন্তর্নিহিত দ্যোতনাতেও কোনো পার্থক্য নেই। তবু বাকভঙ্গি দুটো প্রয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অনেকে ‘বিসমিল্লায় গলদ’ বাকভঙ্গিটিকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে এর ব্যবহার অনুচিত মনে করেন। যদিও বাকভঙ্গিটি প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয়ভাবে কাউকে আহত করার মানসে সৃষ্টি হয়নি। তারপরও যেহেতু অনেকে ‘বিসমিল্লায় গলদ’ বাকভঙ্গিটিকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন সেহেতু এটি ব্যবহার না-করাই সমীচীন। তৎপরিবর্তে ‘গোড়ায় গলদ’ বাকভঙ্গিটি ব্যবহার করুন।

গোতম

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি দর্শনের ন্যায়শাস্ত্র বিভাগ এবং ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। গোতম, শতানন্দ নামেও পরিচিত। তিনি ধর্মশাস্ত্র নামের একটি আইন পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই আইনশাস্ত্র প্রাচীন ভারতীয় কর্মকাণ্ডে তৎকালে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গোধূলি

‘গোধূলি’ শব্দের অর্থ সন্ধ্যাবেলা, সায়াহ্নকাল, সূর্যাস্তকাল, সন্ধ্যা প্রভৃতি। ‘গো’ ও ‘ধূলি’ শব্দ দুটি যুক্ত হয়ে গোধূলি শব্দ গঠন করেছে। সুতরাং এর ব্যাকরণগত অর্থ হচ্ছে গরুর ধূলি বা গরুর পায়ের ধূলি। কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থ প্রায়শ আভিধানিক অর্থের সঙ্গে হুবহু অভিন্ন হয় না। হুবহু অভিন্ন না-হলেও উভয় অর্থের মধ্যে নিবিড় কোনো যোগসূত্র অবশ্যই থাকে। গোধূলি একটি সংস্কৃত শব্দ। যখন গরুর দল ধূলি উড়িয়ে গোয়ালে ফেরে সে সময়টি হচ্ছে গোধূলি। গরু যখন গোয়ালে ফেরে বা গরুকে যখন রাখাল সারাদিন মাঠে চরিয়ে গোয়ালে নিয়ে যায়? সাধারণত এটি ঘটে সন্ধ্যার সামান্য আগে, যখন সূর্য ডুবুডুবু করে ডুবে যাওয়ার প্রস্তুতি প্রায় সেরে ফেলে। গরুর পায়ের ক্ষুরের ধূলি হলেও ‘গোধূলি’ বাংলা ভাষার একটি চমৎকার কাব্যিক শব্দ। বাংলা গানে, কবিতায় ও নানা গল্পে গোধূলির নান্দনিক রূপময়তা শব্দটিকে আকর্ষণীয় করে দিয়েছে। গরুর ক্ষুরের ধুলো আকাশে উড়ছে, দিগন্তে সে ধুলোর আবরণের সঙ্গে অস্তগামী সূর্যের মনোহর রক্তিম আভা চারদিকে এক অপূর্ব মৃন্ময়তার সৃষ্টি করে। নজরুলের কণ্ঠে গোধূলি কী চমৎকার লাস্যে ফুটে উঠেছে গোধূলি লগনে বুকের মাঝে,

মধুর বাঁশরী বাজে।

গোবেচারা

'গোবেচারা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—নিরীহ, শান্তশিষ্ট, নির্বিরোধ ভালো মানুষ। তবে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'গরুর মতো বেচারা'। সংস্কৃত 'গো' এবং ফারসি 'বেচারহ' শব্দ দুটো মিলে 'গোবেচারা' শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃত 'গো' শব্দের অর্থ গরু। এটি নিরীহ, পোষমানা ও গৃহপালিত একটি জীব। অন্যদিকে ফারসি 'বেচারহ' শব্দের অর্থ যার কোনো উপায় নেই বা নিরুপায়। ফারসি 'বেচারহ' শব্দ হতে বাংলা 'বেচারা' শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ শান্তশিষ্ট, নির্বিরোধ ব্যক্তি। কিন্তু গোবেচারা শব্দে গরুর স্বভাবজাত নিরীহতা ও বেচারার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য উভয়ই বিদ্যমান। তাই গোবেচারাকে সবাই ব্যবহার করতে চায় কিন্তু মূল্য দিতে চায় না।

গোমড়া

'গোমড়া'—বিষণ্ণ, মলিন, অপ্রসন্ন, অসহায়, হাসিবিহীন মুখ। ফারসি 'গোমরাহ' শব্দ থেকে বাংলা 'গোমড়া' শব্দের উৎপত্তি। তবে ফারসি গোমড়া শব্দের অর্থ—বিপথগামী, বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, অজ্ঞ প্রভৃতি। যারা এমন চরিত্রের অধিকারী তাদের মুখ সর্বদা অপ্রসন্ন থাকে। পথভ্রষ্টতার কারণে তাদের সর্বক্ষণ বিষণ্ণ, মলিন, ভীত ও অসহায় দেখায়। বস্তুত এ জন্য ফারসি গোমরাহ তথা বিপথগামী, বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্টকে বাংলায় 'গোমড়া' তথা বিষণ্ণ, মলিন, অপ্রসন্ন, অসহায়, হাসিবিহীন অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।

গোলোক

'গোলোক' হচ্ছে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আবাসস্থল। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সকল লোকের উপরে এটি অবস্থিত। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, বৈকুণ্ঠের উপরে গোলক অবস্থিত। এর আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন। বিষ্ণুর অভিপ্রায় অনুযায়ী এ গোলোক বায়ুর উপর অবস্থিত। এখানে একটি বিশাল পর্বত রয়েছে। পর্বতের বহির্দেশে বৃন্দাবন নামের একটি অপূর্ব সুন্দর বন রয়েছে। এটি কৃষ্ণ ও রাধিকার ক্রীড়ার স্থান।

গোষ্ঠী

'গোষ্ঠী' শব্দের অর্থ—পরিবার, জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন, দল, সম্প্রদায়, একই জাতি প্রভৃতি। সংস্কৃত 'গোষ্ঠ' শব্দ হতে গোষ্ঠী শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষায় 'গোষ্ঠ' শব্দের অর্থ হলো গো বা গরুসমূহ রাখার স্থান। যেখানে গরুর পাল রাখা হয় বা থাকে সংস্কৃত ভাষায় সেটিই গোষ্ঠ। এ 'গোষ্ঠ' শব্দের সঙ্গে দীর্ঘ-ঈ-কার যুক্ত হয়ে বাংলা গোষ্ঠী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃতে 'গোষ্ঠ'—গরুর পাল রাখার স্থান এবং গোষ্ঠপ্রধান অর্থ হচ্ছে—গোশালার অধ্যক্ষ বা গোশালার রক্ষণাবেক্ষণ যিনি করেন। তবে বাংলায় গোষ্ঠপ্রধান অর্থ পরিবার বা জ্ঞাতি বা আত্মীয়স্বজন বা দল বা সম্প্রদায়ের নেতা কিংবা প্রধান ব্যক্তি। এখন প্রশ্ন হলো, গরুর পাল রাখার স্থান বাংলায় কীভাবে পরিবার-প্রধান হয়ে গেল? প্রাচীন আমলে বঙ্গদেশে গরু ছিল অন্যতম অর্থকরী প্রাণী। এটি ছিল সম্পদের মূল অধিষ্ঠাতা। কৃষিকাজ ছিল তখন একমাত্র অন্যতম জীবিকা আর এ জীবিকার কর্ষক ছিল গরু। অধিকন্তু আদর্শ খাদ্য হিসেবে খ্যাত দুধের জোগানদাতাও ছিল গো। হিন্দুদের অন্যতম দেবতা কৃষ্ণের বাহন ছিল গো। গো ছিল সমাজ, পরিবার, গোত্র, জ্ঞাতি ও দলের সমৃদ্ধির প্রতীক। হয়তো এ অনুষঙ্গে সংস্কৃত গরুর পাল রাখার স্থানটি বাংলায় এসে পরিবার, জাতি, আত্মীয়স্বজন, দল, সম্প্রদায়, একই জাতি প্রভৃতি অর্থে রূপ নেয়।

গৌতম

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একজন মহাতেজা মহর্ষি। তিনি মানবের আচার, রীতিনীতিবিষয়ক সংহতিকার। গৌতম জিতেন্দ্রিয় হয়ে কঠিন তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চায় সময় কাটাতেন। তিনি অহল্যার স্বামী। গৌতম-রচিত সংহিতার নাম

'গৌতম-সংহিতা'। মহাভারতে কৃতঘ্ন ও শাপভ্রষ্টা আর-এক গৌতমের কথা উল্লেখ আছে। ওই পাপ কাজের জন্য তাকে রাক্ষস দ্বারা হত্যা করে নরকে প্রেরণ করা হয়।

গৌরচন্দ্রিকা

'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—ভূমিকা, ভণিতা, মূল কাজ শুরুর আগে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রভৃতি। 'গৌরচন্দ্র' ও 'পালাকীর্তন' থেকে বাগধারাটির উৎপত্তি। গৌরচন্দ্র হচ্ছে শ্রীচৈতন্যদেব। পালাকীর্তন শুরু করার পূর্বে গৌরচন্দ্রের বন্দনামূলক গান গাওয়া হয়। গৌরচন্দ্রের বন্দনা করে গাওয়া গীত বা গানকে বলা হতো গৌরচন্দ্রিকা। গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া পালাগানের শুরু কল্পনাই করা যেত না। গায়ক-গায়িকাগণ পালাগান শুরু করার আগে গৌরচন্দ্রিকার মাধ্যমে পালাগানের আসরের সূচনা ঘটাতেন। গৌরচন্দ্রিকার এ সূচনামূলক ভূমিকা হতে গৌরচন্দ্রিকা শব্দটির উৎপত্তি। এখন এর অর্থ গৌরচন্দ্রের বন্দনা করে গাওয়া গান বোঝায় না; বোঝায় ভূমিকা, ভণিতা। গ্রন্থের ভূমিকাকে অনেক লেখক বলেন ' গৌরচন্দ্রিকা'।

গৌরী

কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের অমর কবিতার প্রথম চার লাইন

যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা
গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

গড়াই অত্যন্ত প্রাচীন একটি নদী। অতীতে এর নাম ছিল গৌরী। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ টলেমি তদানীন্তন গঙ্গা প্রবাহের সাগরসঙ্গমে পাঁচটি মুখের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে 'কমবরী খান' নামক মুখটিই প্রকৃতপক্ষে গড়াই বলে কেউ কেউ মনে করেন। গড়াই-মধুমতি নদীর গতিপথ দীর্ঘ এবং বিস্তৃত। গড়াই-মধুমতি নদী গঙ্গা নদীর বাংলাদেশ অংশের প্রধান শাখা। একই নদী উজানে গড়াই এবং ভাটিতে মধুমতি নামে পরিচিত। একসময় গড়াই-মধুমতি নদী দিয়ে গঙ্গার প্রধান ধারা প্রবাহিত হতো, যদিও হুগলী-ভাগীরথী ছিল গঙ্গার আদি ধারা। কুষ্টিয়া জেলার উত্তরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ-এর ১৯ কিলোমিটার ভাটিতে তালবাড়িয়া নামক স্থানে গড়াই নদী গঙ্গা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। নদীটি কুষ্টিয়া জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গণেশপুর নামক স্থানে ঝিনাইদহ জেলায় প্রবেশ করেছে। অতঃপর ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে চাদর নামক গ্রাম দিয়ে রাজবাড়ী জেলায় প্রবেশ করেছে। এরপর ঝিনাইদহ-রাজবাড়ী, মাগুরা-রাজবাড়ী এবং মাগুরা-ফরিদপুর জেলার সীমানা বরাবর প্রবাহিত হয়ে মধুমতি নামে নড়াইল ও বাগেরহাট জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মধুমতি পরবর্তীকালে পিরোজপুর জেলার মধ্য দিয়ে বলেশ্বর নামে প্রবাহিত হয়েছে এবং মোহনার কাছাকাছি 'হরিণঘাটা' নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

গ্যারান্টি ও ওয়ারেন্টি

'গ্যারান্টি (Guarantee)' শব্দের সর্বজনীন ও সহজবোধ্য প্রতিশব্দ বাংলায় আছে কি না জানা নেই। বাংলা একাডেমির 'ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারি'তে এর প্রতিশব্দ দেওয়া হয়নি। যা দেওয়া হয়েছে সেটি সংজ্ঞার্থ 'কারও বা কোনো কিছুর জন্য লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করা'; সংক্ষেপে 'জামিন হওয়া'। সাধারণভাবে বলা যায় গ্যারান্টি অর্থ জামিন হওয়া। একই অভিধানে আইনের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি শব্দের ভিন্ন অর্থ দেওয়া হয়েছে 'যেকোনো লেনদেনে স্বীকৃতি শর্তাবলি পূরণের (সাধা, লিখিত বা মুদ্রিত) অঙ্গীকার' বা 'জামিন'। গ্যারান্টি শব্দের মতো 'ওয়ারেন্টি (Warranty)' শব্দেরও যুতসই প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নেই। একই অভিধানে 'ওয়ারেন্টি' শব্দের

অর্থ বলা হয়েছে ‘সরবরাহকৃত ত্রুটিযুক্ত পণ্যসামগ্রী মেরামতের বা বদলে দেওয়ার লিখিত কর্তৃত্ব।’ এটি সংজ্ঞার্থ, প্রতিশব্দ নয়। উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় ‘গ্যারান্টি’ ও ‘ওয়ারেন্টি’ শব্দ দুটোই ব্যবহৃত হয়। শব্দ দুটোর পার্থক্য অনেকে বোঝেন কিন্তু উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ অনেকের জানা নেই।

গ্রহের দৃষ্টি

জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহদের দৃষ্টি (aspect) কল্পনা করা হয়। সব গ্রহই যে রাশিতে থাকে তার সপ্তম রাশিতে অর্থাৎ বিপরীতে অবস্থিত রাশিতে পূর্ণদৃষ্টি দিয়ে থাকে। শনির দৃষ্টিতে পড়লে তো দুর্ভোগের শেষ থাকে না। প্রাচীন বিশ্বাসমতে, গ্রহের দৃষ্টির ওপর মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করত।

নবম অধ্যায়

ঘ

ঘটি-বাঙাল

কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হতে বসবাসরত বাংলাভাষী একটি উচ্চশ্রেণি দাবিদার গোষ্ঠী, রাঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘট গ্রামের অধিবাসী প্রভৃতি। এ ঘটি কিন্তু জল-রাখার কোনো ঘটি নয়। ঘটি শব্দটি এসেছে 'বন্দ্যঘটী' থেকে। আদি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের উপাধি ছিল 'বন্দ্যঘটী'। 'বন্দ্যঘট' গ্রামের নাম থেকে 'বন্দ্যঘটী' উপাধির উৎপত্তি। বন্দ্যঘটে বাস যার সে 'বন্দ্যঘটীয় > বন্দ্যঘটী'। 'বন্দ্যঘট'-এর অপভ্রংশ বাঁড়র (বন্দ্যঘট > বন্দহড় > বন্দঅড় > বাঁড়ড় > বাঁড়র)। বাঁড়ুর্জে বা বাঁড়ুজ্জে-এর উৎপত্তিও বাঁড়র থেকে। ঘটী প্রথমে কেবল রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণকেই বোঝাত, ক্রমে তা শুধু রাঢ়দেশ বা পশ্চিমবঙ্গ অর্থে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থেরও অবনমন ঘটে। প্রাদেশিক প্রতিযোগিতাজনিত ঈর্ষায় শব্দটি ক্রমশ তাচ্ছিল্যমিশ্রিত বিদ্রূপার্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

জ্যোতিভূষণ চাকী তাঁর 'বাগর্থকৌতুকী' গ্রন্থে লিখেছেন, "ঘটি-বাঙালের পারস্পরিক রেষারেষি সুপ্রাচীন। এ-বাংলা ও-বাংলাকে তেমন প্রীতির চোখে দেখত না। বিয়ে-শাদির ব্যাপারও এড়াতে চেষ্টা করত।" প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন, সরহপাদের একটি দোহায় আছে—বঙ্গে জায়া নিলেসি পরে/ভাগেল তোহর বিণাণা। অর্থাৎ বঙ্গে (= পূর্ববঙ্গে) যখন বিয়ে করেছিস তোর বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেল বলে (বিণাণা = চিত্তবান অর্থাৎ সু-চেতনা)। ভুসুকপাদেও দেখছি—'আদি ভুসুক বঙ্গালী ভইলী/ণিঅ ঘরণি চণ্ডালী লেলী।' অর্থাৎ ভুসুক বঙ্গালীকে যেদিন নিজের গৃহিণী করলেন সেদিন তিনি বাঙালি বনে গেলেন অর্থাৎ বঙ্গালসুলভ ভ্রষ্টাচারের ফাঁদে পড়লেন। বাঙ্গালদের বিষয়ে প্রাচীন মুনি-ঋষিদের ধারণা কতটুকু সত্য তা ভুক্তভোগী মাত্রই বলতে পারেন।

ঘটিকা

সময়ের একক, ষাট মিনিটে ঘটিকা, ঘণ্টা প্রভৃতি। সময় পরিমাপক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত ষাট মিনিট সময়কে এক ঘটিকা বলা হয়। আধুনিক যুগের কাঁটা-ঘড়ি বা ডিজিটাল-ঘড়ি আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ জলঘড়ি বা বালিঘড়ি বা সূর্য-ঘড়ির মাধ্যমে সময়ের হিসাব রাখতেন। সে সময় মানুষ সময় জানার জন্য বালি বা জলভর্তি ঘড়া ও ঘড়ি বা ঘটিকা ব্যবহার করতেন। বড় একটা ঘড়াতে জল বা বালি রেখে নিচে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপের ছিদ্র করা হতো। সে ছিদ্র দিয়ে ঘড়া হতে নিচে রাখা ঘটিকায় বিন্দু বিন্দু জল বা বালি পড়ত। ঘটিকা পূর্ণ হয়ে গেলে ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হতো, এক ঘটিকা পূর্ণ হয়েছে। এরপর পূর্ণ ঘটিকা সরিয়ে আর একটি খালি ঘটিকা ঘড়ার নিচে দেওয়া হতো। এরূপ যত ঘটিকা পূর্ণ হতো সময় বলা হতো তত ঘটিকা। ঘড়ার নিচের রাখা ঘড়িটি জল বা বালি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সময় জ্ঞাপন করত বলে সময় পরিমাপক যন্ত্রের নাম হয় 'ঘড়ি'। আমাদের বর্তমান ঘটিকা শব্দটি এ ঘটিকা হতে এসেছে।

ঘটোৎভব

কুম্ভজাত। ঘটের মধ্য থেকে জন্ম নিয়েছিল বলে অগস্ত্যমুনির আর এক নাম ঘটোৎভব।

ঘড়ি

সময় পরিমাপক যন্ত্র। আধুনিক যুগের কাঁটা-ঘড়ি বা ডিজিটাল ঘড়ি বেশিদিনের কথা নয়। প্রাচীনকালে মানুষ সময় জানার জন্য বালি বা জলভর্তি ঘড়া ও ঘড়ি বা ঘটিকা ব্যবহার করতেন। বলা প্রাসঙ্গিক যে, ঘড়া মানে বড় আকারের জলপাত্র বা কলস এবং ঘড়ি বা ঘটি বা ঘটিকা মানে ছোট আকারের জলপাত্র বা কলসি। বড় একটা

ঘড়াতে জল বা বালি রেখে নিচে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপের ছিদ্র করা হতো। সে ছিদ্র দিয়ে ঘড়ার নিচে রাখা ঘড়িতে বিন্দু বিন্দু জল বা বালি পড়ত। ঘড়ি পূর্ণ হয়ে গেলে ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হতো যে, এক ঘটিকা পূর্ণ হয়েছে। এরপর পূর্ণ ঘড়ি সরিয়ে আর একটি খালি ঘড়ি ঘড়ার নিচে দেওয়া হতো। এরূপ যত ঘটিকা পূর্ণ হতো তত ঘটিকা সময় বলা হতো। ঘড়ার নিচে রাখা ঘড়িটি জল বা বালি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সময় জ্ঞাপন করত বলে সময় পরিমাপক যন্ত্রের নাম হয় 'ঘড়ি'।

ঘড়েল

ঘড়েল শব্দের আভিধানিক অর্থ—ফন্দিবাজ, কুচক্রী, ধুরন্ধর প্রভৃতি। আমরা জানি, ঘড়া মানে বড় আকারের জলপাত্র বা কলস এবং ঘড়ি বা ঘটি বা ঘটিকা মানে ছোট আকারের জলপাত্র বা কলসি। প্রাচীনকালে মানুষ সময় জানার জন্য জলঘড়ি ব্যবহার করতেন। এ জলঘড়ি থেকে ঘড়েল শব্দটির উৎপত্তি। বড় একটা ঘড়া থেকে ঘটিকা বা ঘটিতে জল ফেলে সময় জানার জন্য বিশেষ কৌশলে জলঘড়ি তৈরি করা হতো। ঘড়ার নিচে থাকত ছিদ্র, সে ছিদ্র দিয়ে ঘড়ার নিচে রাখা ঘটিকায় বিন্দু বিন্দু জল পড়ত। ঘটি পূর্ণ হয়ে গেলে ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হতো যে, এক ঘটিকা পূর্ণ হয়েছে। এরপর পূর্ণ ঘটিকা সরিয়ে আর একটি খালি ঘটিকা ঘড়ার নিচে রেখে দেওয়া হতো। এরূপ যত ঘটিকা পূর্ণ হতো, সময় বলা হতো তত ঘটিকা। আমাদের বর্তমান ঘটিকা শব্দটি এ ঘটি ও ঘড়া হতে এসেছে। ঘড়ি শব্দটি এসেছে ঘড়া হতে। সাধারণ কোনো লোকের বাড়িতে এ জলঘড়ি ছিল না। রাজা, জমিদার প্রমুখ বিত্তশীলদের বাড়িতে জলঘড়ি রাখা হতো। কেউ সময় জানতে চাইলে রাজবাড়িতে এসে তা জেনে নিতেন। রাজবাড়িতে জলঘড়ির পূর্ণ ঘটিকার হিসাব রাখার দায়িত্ব যার ওপর ন্যস্ত থাকত তার পদবি ছিল 'ঘটিকাপাল'। এ ঘটিকাপাল শব্দটি ক্রমপরিবর্তন ও বিকৃতির মাধ্যমে 'ঘড়েল' শব্দে এসে রূপ নিয়েছে।

এখন একটা প্রশ্ন থেকে যায়, ঘটিকাপাল কীভাবে ফন্দিবাজ, কুচক্রী বা ধুরন্ধর হয়ে যায়? ঘটিকাপালকে ঘটিকা পূর্ণ হওয়া মাত্র ঘণ্টা বাজিয়ে ঘটিকার হিসাব জানিয়ে দেওয়ার জন্য সদাসতর্ক থাকতে হতো। এক মুহূর্তের অসতর্কতার জন্য সময়ের হেরফের হয়ে যেত। তাই চালাকচতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে সবসময় ঘটিকাপাল হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হতো। কোনো লোক চালাকচতুর ও বুদ্ধিমান না-হলে তাকে ঘটিকাপাল হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হতো না। তাদের বেতনও ছিল অন্যান্য সম-মানের কর্মচারীদের তুলনায় অধিক। তাই চালাকচতুর, বুদ্ধিমান বিশেষণগুলো ঘটিকাপাল হিসাবে নিয়োগের অন্যতম শর্ত হয়ে যায়। আর এ কথা কার না-জানা, যিনি বুদ্ধিমান ও চালাকচতুর তিনি সাধারণত ধুরন্ধর, ফন্দিবাজ ও কুচক্রীও হন!

ঘণ্টকর্ণ

প্রচণ্ড বিষ্ণুবিদ্বেষী। হরিনাম কানে যাবে—এ শঙ্কায় তিনি কানে সর্বদা ঘণ্টা বেঁধে রাখতেন এবং তা নাড়িয়ে সবসময় বাজাতেন। বিষ্ণুবিরোধী হলেও তিনি প্রবল শিবভক্ত ছিলেন। শিবের ভক্ত এটা প্রমাণের জন্য তিনি কানে ঘণ্টা বেঁধে রাখতেন। এখনও অনেকের এমন আচরণ দেখা যায়।

ঘরের শত্রু বিভীষণ

এ বাংলা বাগভঙ্গিটির অর্থ—স্বজন-শত্রু, অর্থাৎ যিনি নিজের আপনজনের ক্ষতি করেন তিনিই 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'। বিভীষণ ছিলেন রাবণের ছোট ভাই। রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ ছিলেন বিশ্রবা মুনির সন্তান। তাঁদের মা নিকষা ছিলেন সুমালী রাক্ষসের মেয়ে। নিকষার আরেক নাম কৈকসী। সুমালী তাঁর মেয়ে নিকষাকে বিশ্রবা মুনির কাছে পাঠান। বিশ্রবা মুনি তখন ধ্যান করছিলেন। নিকষা আসায় তাঁর ধ্যান ভেঙে যায়। ক্ষুব্ধ মুনি অভিশাপ দিয়ে বসেন নিকষাকে 'তোমার সব সন্তানই হবে ভীষণাকার রাক্ষস'। অভিশাপ শুনে বিমূঢ় নিকষা। মুনিকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেন নিকষা। অবশেষে বিশ্রবা মুনি শান্ত স্বরে বললেন শাপ পুরো বন্ধ করার

ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমার শেষ সন্তানটি রাক্ষস হলেও ধর্মনিষ্ঠ হবে। রাম-রাবণের যুদ্ধের গল্প অনেকের জানা। রাবণ সীতাকে উঠিয়ে নিলে রাম সীতাকে উদ্ধারের জন্য ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন রাবণের এই ধর্মনিষ্ঠ ছোট ভাই রামের পক্ষে যোগ দেন। রাক্ষস-রাজ্যের নানা গোপন কথা ফাঁস করে রামকে তিনি জয়ের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে সহায়তা করেন। বিভীষণের এই কাজ ধর্মের পক্ষে হলেও, তিনি নিজের পরিবারের সঙ্গে শত্রুর মতো আচরণ করেছিলেন। তাই, ঘরের বা পরিবারের কেউ শত্রুর মতো আচরণ করলে, তাকে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বলা হয়। বিভীষণের সঙ্গে আধুনিক যুগের মীরজাফরের তুলনা করা যায়।

ঘুণাক্ষর

'ঘুণাক্ষরে' শব্দটির অর্থ—সামান্যতম ইঙ্গিত বা আভাসমাত্র। ঘুণাক্ষর শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'ঘুণপোকা দ্বারা তৈরি অক্ষর'। ঘুণপোকা কাঠ কাটে, অবিচল কেটে চলে। দৈবাৎ কোনো কোনো কাটা অংশ কাকতালীয়ভাবে অক্ষরাকৃতি ধারণ করে। ঘুণপোকা দ্বারা সৃষ্ট অক্ষরাকৃতির এ কাটাকুটিই হচ্ছে ঘুণাক্ষর। মানুষের ভাষার অক্ষর তৈরির ইচ্ছে, জ্ঞান বা সচেতনতা কোনোটাই ঘুণপোকার নেই। তবু নিজের অজান্তে কাটা-কাঠের কোনো কোনো অংশ অক্ষরের মতো লাগে। বস্তুত ঘুণপোকার অক্ষর সৃষ্টির এ অসচেতন প্রয়াস থেকে 'ঘুণাক্ষর' শব্দটির উৎপত্তি। যা হবে বলে কখনো চিন্তা করা হয়নি, তা যদি হয়ে যায় বা দৈবাৎ ঘটে যায়, তখনই 'ঘুণাক্ষরে' জানা-অজানা বিষয়টি উঠে আসে।

ঘৃণা

'ঘৃণা' শব্দের অর্থ—বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অবহেলা, বিরাগ প্রভৃতি। এটি ভালবাসার বিপরীত শব্দ। প্রীতি, দয়া, করুণা, সহানুভূতি, প্রেম, মর্যাদা প্রভৃতি সুকুমারভিত্তিক হার্দিক গুণ। এই গুণাবলির উল্টো প্রত্যয়কে 'ঘৃণা' বলা হয়। যার প্রতি এমন ঘৃণা বর্ষিত হয় সে হচ্ছে ঘৃণ্য। মানুষ নানা কারণে পরস্পরকে ঘৃণা করে। তবে ঘৃণা শব্দের আদি অর্থ বিবেচনা করলে এর বর্তমান অর্থ নিয়ে বিস্মিত না-হওয়ার কোনো হেতু থাকে না। সংস্কৃত হতে আগত 'ঘৃণা' শব্দের আদি অর্থ ছিল—'করুণা, দয়া, কৃপা, প্রীতি' প্রভৃতি। কালক্রমে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হয়ে মূল অর্থের পুরো বিপরীত অর্থ ধারণ করে। 'অপরূপ' শব্দটির ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। এর আদি অর্থ ছিল অসুন্দর, কদর্য। কেন এমন হলো? স্বজনদের মধ্যে ঘৃণা আর ভালবাসা পরস্পর চক্রাকারে আবর্তিত। কোনো অপরিচিত লোককে মানুষ যেমন ভালবাসে না তেমনি ঘৃণাও করে না। ভালবাসা ও ঘৃণার যে কারণ বা শর্ত আবশ্যক তা কেবল পরিচিতদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং ঘনিষ্ঠতা যত গভীর ভালবাসা ও ঘৃণাও তত গভীর হয়। মূলত যার প্রতি যত ভালবাসা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, আদর, নানা কারণে তার প্রতি সৃষ্টি হতে পারে বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, অবহেলা ও বিরাগ। একটি অপরটির বিপরীত। যেকোনো মুহূর্তে কারও প্রতি কারও ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হতে পারে। সংস্কৃত 'ঘৃণা' শব্দের অর্থের বেলাতেও তা ঘটেছে।

ঘোল খাওয়া

'ঘোল খাওয়া' বাগভঙ্গির আভিধানিক অর্থ—বিপর্যস্ত হওয়া, নাকাল হওয়া, বেকায়দায় পড়া প্রভৃতি। 'ঘোল' দুগ্ধজাত একটি সুপেয় খাদ্য। ননী-মিশ্রিত মথিত দধিকে 'ঘোল' বলা হয়। বাঙালি সমাজে ঘোলের কদর এখনও আগের মতো প্রবল। ননী-মিশ্রিত বলে এ ঘোল সবাই খেতে চায়। কিন্তু সমস্যা হলো, আমাদের এ বাগভঙ্গিতে বর্ণিত ঘোল কিন্তু দুগ্ধজাত ও ননী-মিশ্রিত সে সুপেয় ঘোল নয়। এ ঘোল মারাত্মক ও বিপর্যয়কর। একসময় গ্রামবাংলায় একটা উদ্ভট শাস্তির ধরন ছিল। শাস্তিটি হলো ক্ষুর দিয়ে মাথা ন্যাড়া করে ন্যাড়া-মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়িয়ে গ্রামময় ঘুরিয়ে আনা। শাস্তিকে আরও কঠোর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অপরাধীর মুখের একপাশে চুন ও অন্যপাশে কালি মাখিয়ে দেওয়া হতো। গাধার পেছনে ঢোলকদল কী কারণে তাকে এ শাস্তি

দেওয়া হচ্ছে নানা ঢঙে তার বর্ণনা দিতেন। অনেক সময় অপরাধীর পিঠে বা গাধার গলাতেও অপরাধীর নাম ও অপরাধের বিবরণ সংক্ষেপে লিখে দেওয়া হতো। প্রাচীনকালের এ উদ্ভট অথচ অপমানজনক শাস্তিপ্রক্রিয়ার ঘোল-ঢালা হতে 'ঘোল খাওয়া' বাগধারাটির উৎপত্তি। শাস্তিস্বরূপ যার ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢালা হয় আসলে তার বিপর্যস্ত না-হয়ে স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়। যার মাথায় এমন ঘোল ঢালা হয় সে-ই নাকাল হয় ও বেকায়দায় পড়ে যায়। তাই ঘোল-খাওয়া শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—বিপর্যস্ত হওয়া, নাকাল হওয়া, বেকায়দায় পড়া প্রভৃতি।

দশম অধ্যায়

চ

চক্ষুলজ্জা

'চক্ষুলজ্জা' শব্দের অর্থ—প্রকাশ হয়ে যাবার সংকোচ, অন্যে জেনে ফেলার লজ্জা প্রভৃতি। অন্যায়, অনুচিত বা অশোভনীয় কাজের অন্তর্নিহিত সংকোচই লজ্জা। লজ্জা মানুষকে নিজের মনে এক সংশোধন ও অভিজ্ঞানমূলক অনুভূতি এনে দেয়। বলা হয়—লজ্জা নারীর ভূষণ, যে নারীর লজ্জা হারিয়ে গেছে সে নারীর সকল সৌন্দর্য বিলুপ্ত। পুরুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। লজ্জা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও শোভনীয় মনে করা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লজ্জা মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। আমার বাবা বলতেন, জানার সময় লজ্জা রাখতে নেই। যারা জানার সময় লজ্জা পায় তারা চিরদিন অজ্ঞ থেকে যায়। তবে চক্ষুলজ্জা কিন্তু এ লজ্জা নয়। চক্ষুলজ্জা সম্পূর্ণ চোখের লজ্জা এবং সাধারণ লজ্জার সম্পূর্ণ বিপরীত। যা নিজে করতে লজ্জা বোধ হয় না কিন্তু অন্যে দেখলে বা জানলে তথা অন্যের চোখে পড়লে লজ্জা বোধ হওয়ার সমূহ কারণ সৃষ্টি হয় তা-ই 'চক্ষুলজ্জা'। উদারহণস্বরূপ, ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার কথা বলা যায়। ঘুষ নিতে সাহেবের প্রবল ইচ্ছে এবং ঘুষদাতাও ঘুষ দিতে উদগ্রীব। কিন্তু কাজটি উভয়েই গোপনে করতে চান। কারণ কেউ যদি দেখে ফেলেন! এই যে কেউ দেখে ফেলার ভয়ে কোনো কাজ গোপনে করার প্রবণতাটা—এটাই হচ্ছে চক্ষুলজ্জা।

চন্দ্রবংশ

চন্দ্র থেকে উদ্ভূত বংশ। এ বংশ যাদব ও পৌরব নামে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম বংশ যদু থেকে এবং দ্বিতীয় বংশ পুরু থেকে উদ্ভূত। কৃষ্ণ যদুবংশজাত এবং কুরুপাণ্ডব পুরুবংশজাত।

চন্দ্রভাগা

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একটি নদী। বিখ্যাত পঞ্চনদের অন্যতম বলে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নদীটির বর্তমান নাম চেনাব। দক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার সময় চন্দ্র এ নদীতে স্নান করেন। তাই এর অন্য নাম চন্দ্রভাগা।

চম্পকারণ্য

মহাভারতে বর্ণিত একটি পবিত্র অরণ্য। এ বনে এক রাত বসবাস করলে সহস্র গো-দানের পুণ্যলাভ হয়। এর বর্তমান নাম চম্পারণ। চম্পকারণ্যে বসবাস পুণ্যলাভের অন্যতম উপায়।

চম্পা

চম্পা নামক রাজা কর্তৃক স্থাপিত একটি প্রসিদ্ধ নগরী। একসময় এটি অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল। বর্তমানে এটি ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত।

চরু

দেবতরা যা আহার করেন তাকে চরু বলা হয়। হোমের উদ্দেশ্যে যে অন্ন পাক করা হয় তা-ই চরু। এটি যজ্ঞীয় পায়সান্ন নামেও পরিচিত। এটি পবিত্র এবং স্বাস্থ্যকর।

চলচ্ছক্তি

ইদানীং অনেক জায়গায় 'চলচ্ছক্তি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। চলার শক্তি বা চলনের শক্তি অর্থে 'চলচ্ছক্তি'

শব্দ ব্যবহার করা হয়। 'চলচ্চিত্র' শব্দের অনুকরণে নাকি শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাকরণের সূত্রানুসারে বিবেচনা করলে এ অর্থে শব্দটি হওয়া উচিত 'চলনশক্তি'। 'চলচ্ছক্তি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয় 'চলৎ + শক্তি'। 'চলৎ' অর্থ যা চলে, যা চলছে, চলতে চলতে— এককথায় চলন্ত। 'চলচ্ছক্তি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'চলন্ত শক্তি, যে শক্তি চলছে'। কিন্তু যে অর্থে 'চলচ্ছক্তি' ব্যবহার করা হয় তা 'চলন্ত শক্তি নয়'। 'শক্তির চলা' আর 'চলার শক্তি' এক হতে পারে না। 'চলচ্চিত্র' মানে 'যে চিত্র চলছে'—এটি চলনের চিত্র নয়। তেমনি 'চলচ্ছক্তি' মানে যে শক্তি চলছে—এটি চলার শক্তি নয়। অতএব 'চলার শক্তি' অর্থে 'চলচ্ছক্তি' হয় না; হয় 'চলনশক্তি'।

চাঁদা

বিভিন্ন লোকের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থ বা বিষয়বস্তু, নির্দিষ্ট সময় তথা মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক বিভিন্ন সময়ের জন্য সংবাদপত্রের মূল্য বাবদ পরিশোধ্য অর্থ, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহার্যার্থে প্রদত্ত অনুদান প্রভৃতি। ফারসি 'চান্দ' শব্দ থকে বাংলা চাঁদা শব্দের উৎপত্তি। ফারসি ভাষায় 'চান্দ' শব্দের অর্থ হলো কতিপয়, সামান্য, অল্প, ৩—৯-এর মধ্যবর্তী যেকোনো সংখ্যা। তা হলে ফারসি সামান্য কীভাবে বাংলায় চাঁদা হয়ে গেল? এখন চাঁদার অর্থ অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। চাঁদাবাজির জন্য খুন—পত্রিকায় দেখা এমন সংবাদই তা বলে দেয়। তবে আগে চাঁদা ছিল সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত, কেউ কোনো কাজ করার জন্য অর্থ বা কোনো বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য গেলে যে যা পারেন তা প্রদান করতেন। এতে চাঁদা সংগ্রহকারীদের কোনো দাবি বা বলার থাকত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ হতো সামান্য, এক অঙ্কের মধ্যে। তাই ফারসি 'চান্দ' শব্দের সামান্য অর্থটা বাংলায় এসে 'সামান্য'কে প্রতিহত করে বিভিন্ন লোকের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থে পরিণত হয়েছে। তবে ইদানীং চাঁদা সংগ্রহকারীরা চাঁদার পরিমাণই শুধু নির্ধারণ করে দেয় না, এর পরিমাণ হয় বিশাল এবং না-দেওয়ার পরিণতিও হয় ভয়াবহ। তাই 'চাঁদা' শব্দটির আবার অর্থনাশ আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চাকরি

'চাকর' ফারসি শব্দ। এর অর্থ—গোলাম, ভৃত্য, খানসামা, নফর, ফাইফরমাশ খাটে এমন লোক। 'চাকরি' শব্দটি ফারসি। এর অর্থ চাকরের কাজ। যাঁরা চাকরের কাজ করেন তাঁরা চাকুরে। তবে শব্দটি বাংলায় জাতে-ওঠা একটি শব্দ। শব্দের অর্থের কত প্রবল উনণতি হতে পারে 'চাকরি' শব্দটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চাটুকার

'চাটুকার' শব্দটির অর্থ—তোষামোদকারী, অতিরিক্ত প্রশংসাকারী, প্রশংসামূলক বাচালতা প্রভৃতি। 'চাটু' ও 'কার' শব্দের মিলনে চাটুকার। অর্থাৎ যে চাটু করে সে-ই চাটুকার। 'চাটু' সংস্কৃত শব্দ। এর মূল অর্থ—চিত্তভেদকারী প্রিয় বাক্য, চিত্তউদ্বেলকারী মনোহর বাক্য। যে বাক্য কারও মন বা চিত্তকে আনন্দে, প্রশান্তিতে মুগ্ধ করত সেটিই 'চাটু'। সুতরাং এরূপ আনন্দদায়ক বা চিত্তপ্রশান্তকারী বাক্য দিয়ে যিনি অন্যের মনে আবেগ ও মধুময় অনুভূতি সৃষ্টি করেন সংস্কৃত ভাষায় তিনিই চাটুকার। অতএব সংস্কৃতে 'চাটুকার' কিন্তু কোনো নেতিবাচক শব্দ ছিল না। কিন্তু বাংলার 'চাটুকার' একটি নেতিবাচক শব্দ। আসলে এমনটিই হওয়ার কথা। মানুষকে সবসময় সত্য কথা বলে কারও চিত্তভেদ করা প্রায়শ সম্ভব হয় না। একজন মানুষ যা করে তা হুবহু বলা হলে কারও চিত্ত উদ্বেল না-ও হতে পারে। যেমন কেউ একজন ভিক্ষুককে এক শ টাকা দান করল। এটি যদি বলা হয় তা হলে তা তেমন চিত্তভেদকারী হবে না। যদি বলা হয়—তিনি দরিদ্রের প্রতি উদারহস্ত, ভিক্ষুককে শত শত টাকা দান করেন, তাঁর মতো দাতা দেশে আর নেই। এ বাক্যগুলো দাতাকে চরমভাবে উদ্বেল করবে। এগুলোই হচ্ছে চাটু এবং যিনি এমন করেন তিনি হচ্ছেন চাটুকার। এখন চাটুকার সর্বত্র চোখে পড়ে। চাটুকারিতা পছন্দকারী লোকের

সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চাটুকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সবাই চাটুকার ও চাটুকারিতাকে নেতিবাচক মনে করে, কিন্তু কেউ নিজের অতিরিক্ত প্রশংসা শুনলে উদ্বেল না-হয়ে পারে না। এখানেই চাটুকারদের জয়।

চাপরাশি

'চাপরাশি' শব্দের অর্থ—আরদালি, পেয়াদা, পিয়ন, বেয়ারা প্রভৃতি। 'চাপরাশি' ফারসি হতে আগত। ফারসি 'চপরাস্ত' শব্দ থেকে বাংলা চাপরাশি শব্দের উৎপত্তি। চপরাস্ত শব্দের অর্থ পদজ্ঞাপক চিহ্ন। তৎকালে ভৃত্যগণ মালিকের পরিচয়জ্ঞাপক ধাতুফলক বা ব্যাজ পরিধান করতেন। ভৃত্যের পরিধান-করা ধাতুফলক থেকে তার মালিকের পদমর্যাদা ও পরিচয় পাওয়া যেত। ভৃত্যগণ যখন মালিকের সঙ্গে কোথাও যেতেন তখন এ ব্যাজ পরিধান করতেন। এ অনুষঙ্গে ফারসি 'চপরাস্ত' নামের শব্দটি বাংলা পিয়ন, বেয়ারা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। আধুনিককালের পেয়াদা, পিয়ন বা বেয়ারাগণ কোনো ব্যাজ বা ধাতুফলক ব্যবহার না-করলেও বড় গলায় মালিকের পরিচয় দিতে উদগ্রীব হয়ে থাকেন। কারণ মালিকের ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার ওপর তার নিজের মর্যাদা নির্ভরশীল।

চামচা

'চামচা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—অনুচর, তোষামোদকারী পার্শ্বচর, তাঁবেদার, চাটুকার প্রভৃতি। এটি একটি মজার শব্দ। ফারসি চমচহ শব্দ থেকে বাংলা 'চামচা' শব্দের উৎপত্তি। ফারসি ভাষায় ছোট হাতাওয়ালা চামচ-কে চমচহ বলে। রান্নাঘরে, খাওয়ার টেবিলে এমনকি ক্রোকারিজ বিক্রির দোকানেও ছোট চামচের সঙ্গে বড় চামচও রাখা হয়। তবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, শেলফে রাখা চামচের মধ্যে বড় চামচের সংখ্যার চেয়ে ছোট চামচের সংখ্যা বেশি। বড় চামচ নেতা আর ছোট চামচ অনুসারী। একজন বড় নেতা বা ক্ষমতাশীল ব্যক্তির আশপাশে অনেক ছোট ছোট নেতা ঘুরঘুর করে। ঠিক যেন বড় চামচের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক ছোট চামচ। ছোট ছোট নেতাদের কাজ হলো বড় নেতার চারদিকে ঘিরে থেকে তার তোষামোদ করা ও আদেশ-নির্দেশ পালন করা। ছোট চামচগুলোও হচ্ছে 'চামচা'।

চার্মিং গার্ল

'চার্মিং গার্ল'-এর আদি এবং মূল অর্থ ছিল ডাইনি, এটা কি বিশ্বাস হয়? Charisma শব্দের উৎস গ্রিক। গ্রিক Charis মানে gift বা gracel gift, অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ঈশ্বর যে ক্ষমতা কাউকে দিয়েছেন' আর grace হলো ঈশ্বরের করুণায় পাওয়া শক্তি। শব্দটির মূল অর্থে অলৌকিকতার উপস্থিতি তো আছেই, সে সঙ্গে যুক্ত আছে charm-এর অর্থ। অবশ্য পূর্বে charm বলতে সম্মোহন বা সম্মোহনশক্তি বোঝাত। চতুর্দশ শতকে ইংল্যান্ডে charming girl মানে ছিল dangerous girl having magical power to seduce, সোজা কথায় charming girl অর্থ ছিল ডাইনি—আরও পরিষ্কারভাবে বললে বলতে হয়, জার্মান উপকথায় বর্ণিত Lorelei-এর মতো ডাইনি—যে রাইন নদীর দক্ষিণ তীরে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তার রূপ ও সম্মোহক শক্তিতে নাবিকদের আকৃষ্ট করে তাদের প্রাণ নাশ করত। এখন যেমন সব মেয়েই charming girl হতে চায় কিন্তু তখন কোনো মেয়েই তা চাইত না। কারণ কোনো মেয়েই ডাইনি হতে চাইত না। সপ্তদশ শতক থেকে charming শব্দটার অর্থ পরিবর্তন হতে শুরু করে। তার সঙ্গে চালু হয়ে যায় charismatic শব্দটিও। এখন রাজনীতিক নেতার প্রভাব বিস্তারের অসাধারণ ক্ষমতাকে বোঝাতে charismatic এবং অসাধারণ মোহনীয় রমণী বোঝাতে charming girl শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। charismatic শব্দটি সরাসরি ইংরেজি থেকে বাংলায় আসতে পারে, আবার হিন্দি থেকেও আসতে পারে। তবে বাংলার চেয়ে হিন্দিতে শব্দটির প্রয়োগ বেশি। হিন্দিতে শব্দটি হচ্ছে করিশম। হিন্দি বা উর্দুতে এসেছে ফারসি হতে। ফারসিতে এর উচ্চারণ অনেকটা ক্রিশম বা কিরিশম। ইদানীং ভারত ও বাংলাদেশে অনেকে মেয়ের নাম রাখা হচ্ছে ক্যারিস্মা বা

কারিস্মা। যাই হোক না, ক্যারিস্মা বা কারিস্মার কোনো বিকল্প নেই। এর দ্বারা যে কাউকে ঘায়েল করা হয়।

চালচিত্র

'চালচিত্র' শব্দের আভিধানিক অর্থ—পশ্চাৎপট, হালচাল, রীতিনীতি, পরিস্থিতি প্রভৃতি। তবে প্রতিমার পেছনের পট বা চিত্র, যাতে আকাশ ও স্বর্গরাজ্যের দৃশ্যাবলি নানা আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয় সেটাকে বলে চালচিত্র। এ চালচিত্রে দেব-দেবীর বীরত্বসূচক ঘটনা, যুদ্ধজয়ের চিত্র এবং অসুর বিনাশের রোমহর্ষক ছবি নানা রঙে আঁকা থাকে। মূলত এটাই চালচিত্র শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ। পশ্চাৎ দিকের চিত্রে মানুষ কল্পিত আকাশ-বাতাস ও স্বর্গালোকের একটা ধারণা পেয়ে যেত। তেমনি বাংলায় ব্যবহৃত চালচিত্র শব্দ হতেও রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এখানে চিত্র না-থাকলেও পরিবেশগত পরিস্থিতি পশ্চাৎচিত্রের ন্যায় একটি ধারণাকে পরিস্ফুট করে তোলে।

চালচুলোহীন

'চালচুলোহীন' শব্দের আভিধানিক অর্থ—বৃত্তিহীন, কর্মহীন বেকার। চাল ও চুলো—এ দুই শব্দের মিলন 'চালচুলো'। 'চাল' অর্থ ঘরের 'চাল বা ছাদ' এবং 'চুলো' হলো 'রান্নাঘরের উনুন'। যার 'চাল' ও 'চুলো' দুটোই রয়েছে সে চালচুলোওয়ালা ব্যক্তি। চাল চুলোয় রান্না করে জীবন নির্বাহের সহজ ও অত্যাবশ্যক বিষয় তার আয়ত্তে। এমন ব্যক্তি সচ্ছল ও স্বনির্ভর। যার চাল ও চুলো কোনোটাই নেই সে চালচুলোহীন। তার শস্য ও শস্য খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করার সামর্থ্য নেই। অর্থাৎ যার অর্থ—আশ্রয়হীন ও খাদ্যসংস্থানহীন ভবঘুরে।

চালশে

দৃষ্টিহীনতা, অতিরিক্ত বয়সের কারণে ক্ষীণদৃষ্টি, দৃষ্টির ক্ষীণ অবস্থা, চোখের দৃষ্টি হ্রাস পাওয়ার লক্ষণ প্রভৃতি। সংখ্যাবাচক শব্দ চল্লিশ থেকে 'চালশে' শব্দের উৎপত্তি। বয়স যখন চল্লিশ বা চল্লিশের কাছাকাছি হয় তখন সাধারণত চোখের দৃষ্টিতে সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। কাছের জিনিস দেখতে বা বইপত্রের অক্ষর চিনতে সমস্যার সূচনা ঘটে। তখন মানুষ ভালোভাবে দেখার জন্য চশমা পরতে শুরু করে। চল্লিশের প্রভাবে চোখের এ সমস্যার সূচনাকে 'চালশে' বলা হয়।

চাষবাস

'চাষবাস' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—কৃষিকর্ম। 'চাষ' ও 'বাস' শব্দ দুটোর সমন্বয়ে চাষবাস শব্দের উৎপত্তি। 'চাষ' শব্দের অর্থ হলো ভূমি কর্ষণ এবং 'বাস' শব্দের অর্থ হলো বসবাস করা। বসবাস অর্থ ঘড়বাড়ি নির্মাণ করে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে শান্তিতে দিনাতিপাত করা। অতএব চাষবাস শব্দের অর্থ হলো কৃষিকর্মে নিয়োজিত থাকা এবং বসবাস করা। যার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে—সুন্দরভাবে জীবনযাপন ও পরিবার-পরিজন লালন-পালনের জন্য কৃষিকর্ম। একসময় চাষ বা কৃষিকর্মই ছিল মানুষের মূল পেশা। এর মাধ্যমে মানুষের আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো। তাই কৃষির সঙ্গেই ছিল মূলত সুষ্ঠু ও সুন্দর বসবাসের নিবিড় সম্পর্ক। তখন কৃষি হতে বসবাসকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো উপায় ছিল না।

চিকামারা

এক কালের 'দেওয়াল-লিখন' কথাটি বর্তমানে চিকামারা নামে পরিচিত। 'চিকামারা' শব্দটির উৎপত্তি ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত। তবে 'দেওয়াল-লিখন' অনেক প্রাচীন একটি পদ্ধতি। আদিম যুগের মানুষদের হাতে এর উৎপত্তি। তারা পাহাড়ের গুহাগাত্রে নানা সংকেত এঁকে সংবাদ আদান-প্রদান করত। ব্রিটিশ আমলে কাগজের অভাবে দেওয়ালে বিভিন্ন স্লোগান লেখা হতো। এটা শুধু সরকারবিরোধীরাই করত তা নয়।

সরকারের পক্ষেও স্লোগান লেখা হতো। অক্ষর আবিষ্কারের পর পর মূলত দেওয়াল বা পাথরে লিখে সরকারি বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ জনগণকে অবহিত করার জন্য জারি করা হতো। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেওয়াল-লিখন শুরু করে। কিন্তু অল্পসময় পরে পাকিস্তানি শাসকদের বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড শিক্ষার্থীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা গোপনে দেওয়ালে বিভিন্ন স্লোগান লিখে এর প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'দেওয়াল-লিখন' কথাটা 'চিকামারা' শব্দে প্রতিস্থাপিত হয়। বাংলা ভাষা নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকদের অযৌক্তিক ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দেওয়ালে বিভিন্ন স্লোগান ও দাবি-দাওয়া লেখার প্রবণতা বেড়ে যায়। সর্বদলীয় বাংলা ভাষা পরিষদ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাষা-আন্দোলনসহ বিভিন্ন কারণে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জিগা গাছের ডাল ভেঙে এর আগা থেঁতলিয়ে ব্রাশের ন্যায় তুলি বানাত। নিচে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ওপরেও যাতে স্লোগান লেখা যায় সে জন্য তুলিগুলো করা হতো লাঠির মতো লম্বা। সে সব ব্রাশ বা তুলিতে আলকাতরা লাগিয়ে দেওয়ালে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের পক্ষে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হতো। গ্রেফতারের ভয়ে সাধারণত রাতের বেলা টর্চ জ্বালিয়ে দেওয়ালে এ সব স্লোগান লেখা হতো। তবে সুযোগ হলে দিনের বেলাতেও সাহসী শিক্ষার্থীরা স্লোগান লিখে সটকে পড়ত। জিগা গাছের ডাল দিয়ে তৈরি ব্রাশে আলকাতরার মাধ্যমে লেখা দেওয়াল-লিখন সহজে মুছে ফেলা যেত না।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের কোনো একদিন রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী জিগা গাছের ডাল দিয়ে তৈরি লাঠি-আকৃতির লম্বা ব্রাশ দিয়ে দেওয়ালে স্লোগান লিখছিল। এ সময় একদল টহল পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখে শিক্ষার্থীরা ঝোপের আড়ালে আলকাতরার টিন লুকিয়ে লাঠির মতো লম্বা তুলি দিয়ে ঝোপঝাড়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে শুরু করে। টহল পুলিশ এগিয়ে এসে বলে এত রাতে তোমরা বাইরে কী করছ? শিক্ষার্থীরা বলল হলে চিকার জ্বালায় থাকতে পারছি না। এ ঝোপ দিয়ে হলে চিকা ঢোকে। এ জন্য আমরা লাঠি দিয়ে চিকা মারছি। ইতোমধ্যে কয়েকটা চিকাও মেরে ফেলা হয়। শিক্ষার্থীদের কথায় পুলিশের সন্তুষ্ট না-হয়ে কোনো উপায় ছিল না। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ছিল একতলা এবং অধিকাংশ টিনশেডের ও স্যাঁতসেঁতে মেঝের। পাশে ছিল ঝোপঝাড়, সেখান থেকে চিকা হলে হানা দিত। শুধু হলে নয়, পুলিশের ব্যারাকেও চিকার উপদ্রব ছিল। পুলিশ দল সন্তুষ্টচিত্তে চলে যায়। শিক্ষার্থীরা এবার দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল চিকামারার ভানে ঝোপঝাড়ে আঘাত করতে থাকে আর একদল দেওয়াল লিখন শুরু করে। এরপর থেকে 'দেওয়াল-লিখন' লিখতে গেলে শিক্ষার্থীরা বলত চিকামারতে যাচ্ছি। এভাবে 'দেওয়াল-লিখন' বাগভঙ্গিটি 'চিকামারা' শব্দে পরিণত হয়। এখন শুধু দেওয়ালে নয়, রাস্তাতেও চিকামারা হয়।

চিনি

'চিনি' বহুল প্রচলিত একটি দানাদার শর্করা, বিশেষভাবে আখ থেকে তৈরি দানাদার মিষ্টি রাসায়নিক পদার্থ। 'চিনি' বললে এর অর্থ কী তা বলে দিতে হয় না। 'চিনি' চেনে না এমন লোক কারও চেনার মধ্যে হয়তো নেই। 'চিনি' সবাই চিনলেও 'চিনি' শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেকের অজানা। চিনি কিন্তু প্রাচীন বাংলায় ছিল না। বাংলাদেশ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে গুড়ের দেশ হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে গুড় থেকে একপ্রকার শুষ্ক শর্করাজাতীয় মিষ্টি দ্রব্য তৈরি করা হতো। কিন্তু সেটাকে 'চিনি' বলা হতো না। যদি এটাকে চিনি বলা হতো তা হলে প্রাচীন কোনো না কোনো গ্রন্থে 'চিনি' শব্দটি পাওয়া যেত। কিন্তু তা নেই, তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে শর্করা শব্দের তদ্ভব হিসেবে

‘শাকর’ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের একেবারে গোড়ার দিকে চীনে প্রথম ‘চিনি’ নামের অতি প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বস্তুটি উৎপন্ন হয়। চীন হতে দ্রব্যটি উপমহাদেশে আসে। চীনে উৎপাদিত চিনি এ দেশেও অভিন্ন উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে তৈরি করা হতো। ‘চীন’ দেশ হতে আগত বলে এর নাম হয় চিনি।

চিরজীবী

যারা চিরদিন বেঁচে থাকেন তারা চিরজীবী। ভারতীয় পুরাণ মতে বিষ্ণু, কাক, মার্কণ্ডেয়, অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম—প্রমুখ চিরজীবী।

চিরুনি-তল্লাশি

চিরুনি ও তল্লাশি এ দুটো শব্দ মিলে চিরুনি-তল্লাশি শব্দের উৎপত্তি। এটি ইংরেজি Combing operation শব্দের অনুবাদ। এর প্রচলিত অর্থ ভালোভাবে কোনো কিছু অনুসন্ধান করা। চিরুনি দিয়ে যেমন অগণিত চুলের রাজ্য থেকে উকুন, ময়লা বা খুশকি বের করে নিয়ে আসা হয় তেমনি এ তল্লাশির মাধ্যমে পুলিশ হাজার হাজার লোকের মধ্য থেকে প্রকৃত অপরাধীকে বের করে নিয়ে আসে।

চেনি

ইর্মদা ও গোদাবরীর মধ্যখানে জব্বলপুরের নিকট অবস্থিত একটি সুন্দর উপশহর।

চোল

কাবেরী নদীর উত্তর তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ দেশ।

একাদশ অধ্যায়

ছ

ছত্রভঙ্গ

'ছত্রভঙ্গ' শব্দের অর্থ—এলোমেলা, বিশৃঙ্খলা, সারি ভাঙা প্রভৃতি। 'ছত্র' ও 'ভঙ্গ' শব্দ দুটির সংযোগে ছত্রভঙ্গ শব্দের উৎপত্তি। তবে মনে রাখা আবশ্যক যে, বাংলা ভাষায় দুটি ছত্র আছে। একটি ছত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে ছাতা, যা রোদ-বৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাথার উপর দেওয়া হয়। সংস্কৃত হতে আগত এ 'ছত্র' রোদ-বৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রীতি-রেওয়াজের কারণেও মাথার ওপর ধরা হয়। এখানে যে 'ছত্র' নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেটি কিন্তু সংস্কৃত ছত্র নয়। এ 'ছত্র' আরবি হতে আগত। আরবি ভাষায় 'সত্র' শব্দের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে আলোচ্য 'ছত্র'। আরবি ভাষায় 'সত্র' শব্দের অর্থ—লাইন, পঙক্তি, সারি ইত্যাদি। ছত্রভঙ্গ মানে—সারি, লাইন বা পঙক্তি ভঙ্গ করা। সুচারুভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য কিংবা সৌন্দর্য বা নানা সুবিধার জন্য সারি, পঙক্তি, লাইন প্রভৃতি করা হয়। কিন্তু কোনো কারণে যখন এ লাইন, সারি বা পঙক্তি ভেঙে যায় তখন নিশ্চয় মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এ জন্য পুলিশ মিছিলের ওপর লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে অবশ্য মিছিলকারীর অসুবিধা হলেও পুলিশের সুবিধা। আসলে কারও অসুবিধাই তো অন্যের সুবিধা। ছত্র ভেঙে গেলে যে অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় শব্দটির মাধ্যমে তা-ই প্রকাশ করা হয়।

ছবি

প্রতিকৃতি, চিত্র, আলেখ্য, প্রতিমূর্তি, আলোকচিত্র প্রভৃতি বোঝাতে 'ছবি' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। আরবি 'শবিহ' শব্দ থেকে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ছবি শব্দের উৎপত্তি। 'শবিহ' শব্দের অর্থ মুখের ছবি। যার অর্থ হলো—চিত্র প্রতিকৃতি, তৈলচিত্র, আঁকা-ছবি, তোলা-ছবি প্রভৃতি। মুখের ছবি আর মুখচ্ছবি এক নয়। মুখের ছবি আর মুখচ্ছবি অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে না। মুখচ্ছবি শব্দের অর্থ—মুখের সৌন্দর্য, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি। 'মুখচ্ছবি' অর্থ মুখের ছবি নয়। আর মুখের ছবি অর্থ হলো মুখের প্রতিকৃতি, মুখের ছবি, মুখের তৈলচিত্র প্রভৃতি। তেমনি রবিচ্ছবি অর্থ—প্রভা, কান্তি, আলোময়, শোভা, সৌন্দর্য ইত্যাদি।

ছাঁৎ

'ছাঁৎ' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—বুকের মধ্যে তীব্র শিহরনের অনুভূতি। হঠাৎ উদ্বেগজনক কিছু দর্শন বা শ্রবণে বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে ওঠে। বাংলায় এটি যুগপৎ ধ্বন্যাত্মক ও ভাবাত্মক শব্দ। ছাঁৎ ধ্বনিটি রান্নাঘরে অহরহ শোনা যায়। শাকসবজি, মাছ-মাংস বা অন্য কিছু কড়াইয়ের তপ্ত তৈলের স্পর্শে আসামাত্র 'ছাঁৎ' ধ্বনিটি উৎপন্ন হয়। মূলত রান্নাঘরে সৃষ্ট এ 'ছাঁৎ' ধ্বনি হতে বাংলায় প্রচলিত 'ছাঁৎ' শব্দের উৎপত্তি। ধ্বনি থেকে শব্দটির জন্ম। তাই এটি একটি ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

ছাত্র

'ছাত্র' শব্দের আভিধানিক অর্থ—শিক্ষার্থী, বিদ্যার্থী বা শিষ্য। এটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃতে শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'যে গুরুর দোষ ঢেকে রাখে, গুরুর কোনো বদনামকে প্রকাশ হতে দেয় না' প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় ছাত্র শব্দের অর্থ—শিক্ষার্থী, বিদ্যার্থী বা শিষ্য। শিক্ষক যাই করুন না কেন, শিষ্য বা শিক্ষার্থীর কাজ হলো তা মেনে নেওয়া, গুরুর সকল কাজকে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে গ্রহণ ও মান্য করে তাঁর প্রশংসা করাই ছাত্রের কাজ। প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক এমনই ছিল। শিষ্য তার আচার-আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে গুরুর প্রশংসা করত। তাই গুরুর কোনো দোষ থাকলেও তা প্রকাশ হতো না, শিক্ষার্থীর প্রশংসার আড়ালে ঢাকা পড়ে যেত। এ কারণে সংস্কৃত ছাত্র তথা

গুরুর দোষ ঢেকে রাখা ব্যক্তিটি বাংলায় 'ছাত্র' তথা শিক্ষার্থী, বিদ্যার্থী বা শিষ্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

ছাত্রী

ছাত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ পুরুষ শিক্ষার্থী, পুরুষ শিষ্য, পুরুষ বিদ্যার্থী। প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নে নিয়োজিত সকল পুরুষই ছাত্র। বাংলায় 'ছাত্র' শব্দের নারীবাচক রূপ হলো ছাত্রী। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে এটি ভুল। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ছাত্র শব্দের স্ত্রীবাচক রূপ হলো 'ছাত্রা'। 'ছাত্রী' শব্দটিও সংস্কৃতে রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় 'ছাত্রী' শব্দের অর্থ—'ছাত্রের পত্নী বা স্ত্রী'। তবে বাংলায় 'ছাত্রী' বলতে এখন 'ছাত্র' শব্দের স্ত্রীবাচক রূপই বোঝায়।

ছিঁচকে চোর

'ছিঁচকে চোর' বাগভঙ্গির আভিধানিক অর্থ—সামান্য চোর, যারা ছোটখাটো চুরি করে প্রভৃতি। ছিঁচকে অর্থ 'ছোট'। সুতরাং 'ছিঁচকে চোর' অর্থ ছোট চোর। পান খাওয়ার জন্য বাঁশের তৈরি হামানদিস্তার মতো ছোট শাবল সদৃশ বস্তু দ্বারা দরজার খিল/ছিটকিনি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে চুরি করে যারা তাদের 'ছিঁচকে চোর' বলা হয়। এরা সিঁধেল চোরের তুলনায় নগণ্য জিনিস চুরি করে, অর্থাৎ সামান্য জিনিস চুরি করে এরা স্থান ত্যাগ করে চলে যায়।

ছিনিমিনি

উচ্চারণ ও বানানে চমৎকার ছিনিমিনি শব্দটির অর্থ 'অনর্থক নষ্ট করা/বেহিসাবিভাবে ব্যয় করা'। নিস্তব্ধ জলাশয় বা পুকুরে শিশুদের একপ্রকার জলখেলার নাম ছিনিমিনি। বস্তুত এ খেলার নাম থেকে ছিনিমিনি বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। এ খেলায় খোলামকুচি অর্থাৎ মাটির হাঁড়ি-পাতিলের ভাঙা টুকরো বা চ্যাপ্টা ঢিল পানিতে এমনভাবে ছোঁড়া হয় যে, ওইটি ক্রমান্বয়ে একবার পানি ছুঁয়ে, একবার শূন্যে ভেসে অদ্ভুত গতিতে জীবন্ত প্রাণীর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকদূর ছুটে যায়। ইংরেজিতে খেলাটির নাম Play at ducks and drakes. খেলাটি একসময় শিশুদের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিল। গ্রামে এখনও 'ছিনিমিনি' নামের এ খেলাটি শিশুরা পরম আনন্দে উপভোগ করে। শিশুরা সাইজমতো খোলামকুচি না-পেলে অনেক সময় বাড়ির ভালো হাঁড়ি-পাতিল ভেঙে টুকরো করে ছিনিমিনি খেলায় মেতে উঠত। খেলার ছলে মূল্যবান কিছু নষ্ট করার শিশুসুলভ প্রক্রিয়াটা শিশুদের হাত থেকে বড়দের মুখের ভাষায় চলে আসে। শুধু এটা নয়, ছোটবেলার খামখেয়ালিপূর্ণ কিন্তু আনন্দ-উৎসারিত সব খেলাকেই 'ছিনিমিনি খেলা' বলা হতো। একে অপরের গায়ে ধুলি ছোড়াছুড়ি করতে দেখে কী করা হচ্ছে প্রশ্নের জবাবে বলা হতো 'ছিনিমিনি' খেলা হচ্ছে।

ছেঁদো

'ছেঁদো' শব্দের অর্থ সাজানো, কপট, তুচ্ছ, মূল্যহীন প্রভৃতি। সংস্কৃত 'ছন্দ' থেকে বাংলা 'ছেঁদো' শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো— অভিপ্রায়, ইচ্ছা, খেয়াল, চাতুর্য, মনোবাঞ্ছা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি। আবার কারও কারও অভিমত সংস্কৃত 'ছন্দঃ' শব্দ হতে বাংলা 'ছেঁদো' শব্দের উৎপত্তি। তবে সংস্কৃত 'ছন্দ' ও সংস্কৃত 'ছন্দঃ' শব্দের অর্থ অভিন্ন হওয়ায় উৎপত্তিগত বিষয় নিয়ে জটিলতা, দ্বিমত কিংবা মতাবলম্বীদের জয়পরাজয়ের কোনো সুযোগ নেই। 'ছন্দ' ও 'ছন্দঃ' উভয় শব্দের অর্থ হচ্ছে—অভিপ্রায়, খেয়াল, ইচ্ছা, চাতুর্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি। তবে এগুলো ছাড়াও 'ছন্দঃ' শব্দের আর একটি অর্থ আছে। সেটি হচ্ছে কবিতার ছন্দ।

বাংলায় 'ছন্দ' ও 'ছন্দঃ' তাদের উৎসাচরণ হারিয়ে দুটোই অভিন্ন হয়ে গেছে। 'সংস্কৃত' ছন্দ শব্দটিই বাংলায় এসে 'ছেঁদো' হয়ে গেছে। 'ছন্দ' শব্দের 'দন্ত-ন' চন্দ্রবিন্দুরূপে 'ছ'-এর মাথায় গিয়ে বসেছে। তবে যদি বলা হয় সংস্কৃত 'ছন্দঃ' শব্দ থেকে বাংলা 'ছেঁদো' শব্দ এসেছে, তা হলেও কেউ প্রশ্ন তুলতে পারবে না। কারণ এখানে দন্ত্য-ন ও

চন্দ্রবিন্দুর বিনিময় খেলা দেখা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

জ ঝ
জ

জগন্নাথ

বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অবতার। বাংলাদেশ, উড়িষ্যা ও ভারতবর্ষের নানা অংশে মহাসমারোহে জগন্নাথ পূজিত হন। উড়িষ্যার পুরী শহরের জগন্নাথ মন্দির বিখ্যাত। জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রার সময় ও আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় তিনি পূজিত হন। প্রথম উৎসবে জগন্নাথকে স্নান করানো হয় এবং দ্বিতীয় উৎসবে জগন্নাথ, তাঁর ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে রথের উপর স্থাপন করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। জগন্নাথের জন্ম সম্পর্কে একটি কাহিনি আছে। এক ব্যাধের তীরবর্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হলে, তাঁর মৃতদেহ একটি বৃক্ষের তলায় পড়ে থাকে। কৃষ্ণের কয়েকজন ভক্ত মৃতদেহ হতে কৃষ্ণের কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে একটি পাত্রে স্থাপন করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামের এক রাজা বিষ্ণুকে পূজা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কিন্তু কী মূর্তিতে পূজা করবেন তা নিয়ে মহা চিন্তায় পড়ে যান। বিষ্ণু বললেন "তুমি আমার সনাতন মূর্তি প্রস্তুত করে সে মূর্তিতে কৃষ্ণের অস্থি রক্ষা করো।" বিশ্বকর্মা মূর্তি প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শর্ত দেন যে, মূর্তি প্রস্তুত সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত কেউ তাঁকে মূর্তির জন্য বিরক্ত করতে পারবে না। কিন্তু পরের দিন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অস্থিরচিত্তে মূর্তি দেখার জন্য বিশ্বকর্মার নিকট উপস্থিত হন। এতে বিশ্বকর্মা ক্রোধান্বিত হয়ে মূর্তির কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যান। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এর বিহিত করার অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা তখন অসম্পূর্ণ মূর্তিতে চক্ষু ও প্রাণ দান করেন এবং নিজে পুরোহিত হয়ে মূর্তি স্থাপনপূর্বক পূজা শুরু করেন।

জগাখিচুড়ি

খিচুড়ি শুনলে অনেকেরই জিভে জল আসে এবং আসাটাই স্বাভাবিক। জগাখিচুড়ি শব্দের প্রথম অংশ যেখান থেকেই আসুক না কেন 'খিচুড়ি' শব্দ থাকাটা অপরিহার্য। চাল ডাল তেল নুন পরিমাণমতো না হলে এই সুখাদ্য কিন্তু অখাদ্য হয়ে যেতে পারে। জগাখিচুড়ি শব্দের অর্থের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। কোনো কিছুর জটপাকানো উপস্থাপনাকে 'জগাখিচুড়ি' বলে। অন্যভাবে বলতে গেলে, অনেক কিছুর বেমানান, বিসদৃশ কিংবা এলোমেলো সমাবেশকে বলা হয়—জগাখিচুড়ি। জগন্নাথ নামের লোককে জগা নামে ডাকতে প্রায়ই শোনা যায়। ভারতের পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে জাতপাতের বালাই নেই। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ গিয়ে অবলীলায় একসঙ্গে পেটপুরে খিচুড়ি খায়। সেই খিচুড়ি সুস্বাদু হোক বা না হোক খেয়ে যে সবাই মজা পায় তা খাদকদের আচরণ দেখেই অনুধাবন করা যায়। কুলীনরা এটাকে ভালো চোখে কখনও দেখেনি। তারাই ব্যঙ্গার্থে 'জগাখিচুড়ি' অভিব্যক্তিটি সৃষ্টি করতে পারে। জগাখিচুড়িকে তুচ্ছার্থে বা নিন্দার্থে ব্যবহার করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মূলত সাহিত্যিকরা এই ধারাটি চালু করেছেন। কোনো শব্দকে জাতে তুলতে অথবা টেনে নামাতে সাহিত্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, বিবিধ তরিতরকারি দিয়ে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে এই খিচুড়ি রান্না করা হয় বলে এর নাম 'জগাখিচুড়ি'। এই খিচুড়ি অত্যন্ত উপাদেয়। উপাদেয় এ খিচুড়ি নানা রকম বস্তু দিয়ে নিয়মনীতি ছাড়া ইচ্ছেমতো রান্না করা হয়। খিচুড়ি রান্নার এ এলোমেলো প্রক্রিয়া থেকে ব্যঙ্গার্থে 'জগাখিচুড়ি' বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি।

জঘন্য

'জঘন্য' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে : ঘৃণিত, গর্হিত, নোংরা, কদর্য। তবে ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শব্দটির মূল অর্থ এমন কদর্য ছিল না। সংস্কৃত 'জঘন' থেকে 'জঘন্য' শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ স্ত্রীলোকের

কটিদেশ, তলপেট, নিতম্ব এবং নিতম্বের সম্মুখভাগ। স্ত্রীলোকের দেহের এ অংশ সাধারণ্যে প্রদর্শন মারাত্মক অসভ্যতা ও চরম লজ্জাকর বিবেচিত ছিল। শুধু স্ত্রীলোক কেন, পুরুষের দেহের এ অংশটিও জনসমক্ষে প্রদর্শন অগ্রহণীয় ও সভ্য সমাজে অসভ্য হিসেবে বিবেচিত। 'জঘন্য' ও 'জঘন' দুটিই সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় জঘন্য শব্দের অর্থ—নিতম্বস্থ, জঘনের মতো বা জঘনতুল্য। যা একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়, তা প্রদর্শন গর্হিত ব্যাপার। তাই যারা এমন কাজ করে তারা জঘন্য। মূলত এ গর্হিত ভাবটি জঘনের মাধ্যমে 'জঘন্য' শব্দে জড়িয়ে পড়ে।

জটিল

'জটিল' শব্দের আভিধানিক অর্থ—দুর্বোধ্য, সমস্যাসংকুল। 'জটিল' একটি তৎসম শব্দ। শব্দটির মূল অর্থ—জটাধারী বা জটাবান। 'জটা' শব্দের উৎপত্তি 'জট' থেকে। না-আঁচড়ানোর ফলে ক্রমাগত জড়িয়ে চুল শক্ত হওয়ার অবস্থাকে 'জটা' বলা হয়। চুলে জটা লাগলে তা সোজা করা সত্যি কঠিন কাজ। তাই কোনো কঠিন, দুর্বোধ্য বা সমস্যাসংকুল বিষয়কে চুলের জট খোলার মতো কঠিন বিবেচনায় 'জটিল' শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

জড়ভরত

বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে, প্রাচীনকালে ভরত নামের এক রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে ঈশ্বরচিন্তায় বনে কালাতিপাত করতেন। এভাবে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। একদিন স্নান করার জন্য নদীতে গেলে এক অসহায় মৃগশিশুকে নদীর জলে ভেসে যেতে দেখেন। ভরত সেটি আশ্রমে নিয়ে এসে পরম যত্নে লালন করতে থাকেন। মৃগশাবকের প্রতি তিনি এতই আসক্ত হয়ে পড়েন যে, তার পূজা, অর্চনা এবং ধ্যানজ্ঞান সব মৃগশিশুকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। ফলে তাঁর সব ধর্মকর্ম লোপ পেয়ে যায়। মৃত্যুকালেও তিনি ঈশ্বর বাদ দিয়ে কেবল মৃগশাবকের কথা ভাবতে ভাবতে মারা যান। ফলে পরবর্তী জন্মে তিনি জাতিস্মর হয়ে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করে পূর্বাশ্রমে কালাতিপাত করতে থাকেন। যথাসময়ে আবার মারা যান এবং জাতিস্মর হয়ে পুনরায় এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে আবার যাতে তার অধোগতি না হয় সেজন্য তিনি সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে দিন কাটাতে থাকেন। তিনি সর্বদা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের ন্যায় আচরণ করতেন। জড়িতস্বরে কথা বলতেন এবং সংসার ও যাবতীয় কর্মে বিমুখ ছিলেন বলে তাঁর নাম হয়ে যায় 'জড়ভরত'। জড়ব্যক্তির ন্যায় থাকলেও তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে যাবতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে ঋদ্ধ একজন ঋষি। সবাই তাঁকে জড়বুদ্ধি ভেবে অপমান করত এবং তাঁকে দিয়ে নামমাত্র মূল্যে নানাপ্রকার কাজ আদায় করে নিত।

ফলে আজও সরল-সোজা, সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন, নিষ্কর্মা লোকজনকে 'জড়ভরত' বলা হয়ে থাকে। আর ওই কারণেই 'জড়ভরত' বাংলা বাগধারায় প্রচলন। উল্লেখ্য, রাজা ভরতের শাস্ত্রজ্ঞান ছিল প্রচুর, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সে-জন্মেই তিনি মোক্ষলাভ করেছিলেন।

জনাব/জনাবা

'জনাব' একটি সম্মানজ্ঞাপক পদ। পুরুষের নামের আগে শব্দটি সম্মান ও ভদ্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। অনেকে মহিলাদের নামের আগে 'জনাব'-এর স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে 'আ' যুক্ত করে জনাবা লিখে থাকেন। কিন্তু 'জনাবা' লেখা আদৌ সমীচীন নয়। কারণ 'জনাবা' শব্দের অর্থ ঋতুমতী নারী। নারীর নামের আগে বেগম লেখা যায়। বেগম অর্থ বেগের স্ত্রী। তবে এখন 'বেগম' বলতে সম্মানিত মহিলা বোঝায়। অভিধানেও এমন উল্লেখ আছে। বাংলা একাডেমির 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' বলা হয়েছে, 'জনাব' শব্দটি নারী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তির নামের আগে ব্যবহার করা যায়। তবে কারও নামের আগে সৈয়দ, খান, খন্দকার বা অন্য কোনো পদবি থাকলে 'জনাব' লেখা সমীচীন নয়। আমরা বাংলাতে কোনো পুরুষকে 'জনাব' বলে সম্বোধন করব, তেমনি কোনো মহিলার নামের আগেও সম্মানসূচক জনাব ব্যবহার করব। তবে কোনো

অবস্থাতে ‘জনাবা’ নয়।

জমিজমা

শব্দটির আভিধানিক অর্থ—সম্পত্তি, ভূসম্পত্তি, জমি প্রভৃতি। এটি বাংলায় এখন বহুল প্রচলিত শব্দ। জমিজমা বলতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাঠ, বিস্তৃত ক্ষেত, দামি জমি, বাড়ি করার ভিটা প্রভৃতি। ফারসি ‘জমিন’ ও আরবি ‘জমা’ শব্দ হতে বাংলা জমিজমা শব্দের উৎপত্তি। ফারসি ‘জমিন’ শব্দের অর্থ ভূমি বা ভূখণ্ড এবং আরবি ‘জমা’ শব্দের অর্থ হলো নগদ যা রয়েছে। সুতরাং জমিজমা শব্দের অর্থ হচ্ছে ভূমি ও হাতে থাকা নগদ টাকা। কিন্তু বাংলা ভাষায় জমিজমা বলতে শুধু ভূখণ্ডকে বোঝায়। অবশ্য নদীতে মৎস্যচাষ করার অধিকারও ভূমির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জমিজমা দিয়ে নগদ টাকা বোঝায় না। তবে যেহেতু জমিই সকল সম্পত্তি ও নগদ টাকার উৎস, সে অর্থে জমিজমা দিয়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষের ভূখণ্ড ও নগদ জমার প্রকাশ বিচক্ষণতার পরিচায়ক বৈকি।

জল

‘জল’ মানে পানি। এটি আগুনের বিপরীত। আগুন বা প্রজ্বলিত কিছু নেভানোর বিষয়ে প্রথমে যে দ্রব্যটির কথা মনে পড়ে সেটি হচ্ছে জল। ‘জল’ ধাতুযোগে গঠিত শব্দে ‘ব-ফলা’ ব্যবহার করা হয় না। যেমন—জলজ্যান্ত, জলযান, জলদস্যু, জলাতঙ্ক, জলোচ্ছ্বাস, জলযোগ, সজল, নির্জলা। জলের জ-য়ে ব-ফলা দিলে জল কিন্তু আগুন (জ্বলা) হয়ে যায়।

জলপানি আর জলপান

‘জল’ ও ‘পানি’ একই পদার্থ। আধা গ্লাস জল পান কিংবা আধা গ্লাস পানি পান একই অর্থ বোঝায়। কিন্তু ‘জল’ আর ‘পানি’ শব্দ-দুটো যদি পরস্পর সেঁটে বসে কিংবা গায়ে গায়ে লেগে যায় তা হলে ‘জল’ ও ‘পানি’ কোনোটাই আর ‘জল বা ‘পানি’ থাকে না— জলপানি হয়ে যায়। এবার দেখা যাক, জলপানি অর্থ কী। অভিধানমতে, জলপানি শব্দের অর্থ—ছাত্রবৃত্তি, স্কলারশিপ, জলযোগের পয়সা। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রকে ‘জলপানি’ পাওয়া ছাত্র বলা হয়। যে ছাত্র ‘জলপানি’ পায় সে মেধাবী। যারা পানিকে ‘জল’ বলতে চান না তারা ‘জলপানি’ শব্দকে ‘পানিপানি’ বলতে পারেন যদিও এটি অর্থহীন শব্দ। পাকিস্তান আমলে ‘জলপানি’ শব্দটা ‘বৃত্তি’ শব্দের আড়ালে হারিয়ে যায়।

‘জলপানি’ লিখতে যদি ‘জলপাণি’ লিখে ফেলেন তা হলে কিন্তু হাতে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নিজ দায়িত্বে। জলপানির একটা অর্থ জলযোগের পয়সা। জলযোগ মানে হালকা খাবার গ্রহণ, সোজা কথায় নাস্তা করা। একে জলপানও বলা যায়। সহজ অর্থে, ‘যে কর্ম নিষ্পত্তিতে জল-প্রয়োগ করতে হয় তা-ই জলযোগ’। জসীমউদদীনের বিখ্যাত ‘নিমন্ত্রণ’ কবিতার সেই লাইন— “আমার বাড়ি যাইও বন্ধু বসতে দেব পিঁড়ে, জলপান যে করতে দেব শাইল ধানের চিঁড়ে” এখনও মনে পড়ে।

জলাঞ্জলি

‘জলাঞ্জলি’ শব্দের অর্থ—বিসর্জন, অপচয়, সম্পূর্ণ পরিত্যাগ প্রভৃতি। ‘জল’ ও ‘অঞ্জল’ শব্দ হতে জলাঞ্জলি শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো—আঁজলাপূর্ণ জল। দুই হাত মোনাজাতের আকৃতি করে জলে ডুবিয়ে যে পরিমাণ জল তোলা যায় সে পরিমাণ জল হচ্ছে জলাঞ্জলি। তবে জলাঞ্জলি শব্দের আভিধানিক অর্থ—পরিত্যাগ, বিসর্জন। যেমন—তিনি শান্তির জন্য সহায়সম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে গ্রাম ছেড়েছেন। আবার খারাপ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—মদ আর মহিলায় তিনি সকল সম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এবার দেখা যাক, শব্দটির অর্থ এমন হলো কেন। হিন্দুধর্মে শবকে দাহ করা হয়। শবদাহ-কার্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় পদ্ধতি ধাপে

ধাপে পর্যায়ক্রমে পালন করা হয়। শবদাহ প্রক্রিয়ার একবারে শেষ ধাপ হচ্ছে অঞ্জলি নিক্ষেপ। শবদাহ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মৃতের আত্মার শান্তি ও চিতা নেভানোর স্মারক হিসেবে এক অঞ্জলি জল হিন্দু ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় চিতায় নিক্ষেপ করা হয়। অঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ স্বজন তাঁর প্রিয় মানুষটিকে চিরতরে পরিত্যাগ করে চলে আসেন। ধর্মীয় এ করুণ আনুষ্ঠানিকতা হতে বাংলা 'জলাঞ্জলি' এমন হৃদয়বিদারক অর্থ ধারণ করেছে।

জাঁদরেল

'জাঁদরেল' শব্দের আভিধানিক অর্থ—জবরদস্ত, নামডাকওয়লা, জমকালো, মস্ত, বিখ্যাত, খ্যাতিমান প্রভৃতি। সামরিক বাহিনীর পদবি ইংরেজি শব্দ 'জেনারেল (General)' হতে বাংলা 'জাঁদরেল' শব্দের উৎপত্তি। জাঁদরেল বাংলা ভাষায় যতই জবরদস্ত হোক না কেন, এটা কিন্তু বাংলা শব্দ নয়। শব্দটি ইংরেজি 'জেনারেল' শব্দ হতে হিন্দি ভাষায় অতিথি হয়ে এসে পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় ঢুকেছে। ইংরেজ আমলে 'জেনারেল' ছিলেন সামরিক বাহিনীর অত্যন্ত ক্ষমতাধর অফিসার। বেসামরিক অফিসারসহ সবখানে তাঁর দাপট ছিল অপ্রতিরোধ্য। জমকালো পোশাকে আচ্ছাদিত জেনারেল যখন তার অনুগত বাহিনী নিয়ে কুচকাওয়াজ করতেন তখন সাধারণ লোকজন হতবাক হয়ে দেখতেন। সৈন্যরা যখন জেনারেলকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিতেন, তা ছিল আরও ক্ষমতার চিহ্ন। সাধারণ কাজেও তাঁর ক্ষমতার দাপট সর্বজনবিদিত ছিল। জেনারেল-এর ক্ষমতার দাপট ও জমকালো পোশাকের জবরদস্ত চেহারা বাংলায় 'জাঁদরেল' হয়ে স্থায়ী আসন গেড়ে নেয়। এখনও সামরিক বাহিনীর কোনো জেনারেল কম জাঁদরেল নয়।

জিত-বিজিত

'জিত' এবং 'বিজিত' যদি বিপরীতার্থক হয়ে থাকে তবে, 'জয়' আর 'বিজয়' সমার্থক কীভাবে হয়? হতে পারে—এটাই শব্দের এবং ভাষার বৈচিত্র্য। 'বিজয়' শব্দটি 'বি' উপসর্গ যোগে গঠিত। বিশেষভাবে জয়লাভ করাই হচ্ছে বিজয়। 'বি' উপসর্গ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—গতি, বিরূপতা, বিশেষ, অভাব, বিপরীত, অবস্থানরত প্রভৃতি অর্থে বাংলায় 'বি' উপসর্গ ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানে 'বিজয়' শব্দে 'বি' উপসর্গটি 'বিশেষ' অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়েছে।

জিলিপি

প্যাঁচবিশিষ্ট প্রায় গোলাকার একধরনের মিঠাই। এটি বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়। প্রত্যন্ত গ্রাম হতে রাজধানীর বস্তি পর্যন্ত সর্বত্র জিলিপির প্রবল চাহিদা ও জিহ্বাপ্রিয়তা রয়েছে। উপমহাদেশের সর্বত্র জিলিপি পাওয়া যায়। তবে জিলিপি ও তার নামের উৎপত্তি বাংলাদেশে নয়। হিন্দি 'জলেবি' শব্দ থেকে বাংলা 'জিলিপি' শব্দের উৎপত্তি। অন্যদিকে ফারসি 'জলব' থেকে হিন্দি 'জলেবি' শব্দের সৃষ্টি। তার মানে 'জলব' শব্দটি ফারসি হতে হিন্দিতে এবং হিন্দি হতে বাংলাদেশে এসে জিলিপি হয়ে গেছে। ফারসি 'জলব' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গোল হতে হতে' বা 'পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলতে থাকা'। জিলিপির প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সঙ্গে গোল হতে হতে বা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলতে থাকা বাগভঙ্গির কার্যপ্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে জড়িত। কাপড়ের ছোট পুঁটলিতে জিলিপির উপকরণ নিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ও পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কড়াইয়ের তপ্ত তেলে ঢেলে জিলিপি তৈরি করা হয়। বিচিত্র প্যাঁচের এ মিঠাইটি তৈরির এ প্যাঁচালো পদ্ধতির জন্য এর নাম হয়েছে 'জিলিপি'।

জুজুৎসু

'জুজুৎসু' জাপানি শব্দ। তবে এখন শব্দটি বাংলাতেও বহুল প্রচলিত। বাংলা একাডেমির 'ব্যবহারিক বাংলা

অভিধানে' এর অর্থ দেওয়া হয়েছ জাপান-দেশীয় মল্লবিদ্যাবিশেষ, কুস্তির প্যাঁচবিশেষ। 'জুজুৎসু' জাপানে অতি জনপ্রিয় একটি শারীরিক কসরৎ ও শক্তিপ্রদর্শনজনিত কুস্তির নাম। জাপানি 'জু' শব্দের অর্থ মৃদু এবং 'জুৎসু' শব্দের অর্থ কৌশল। সুতরাং 'জুজুৎসু' শব্দের অর্থ— মৃদুকৌশল। এ হিসেবে 'জুজুৎসু' শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো মৃদু কৌশলের মাধ্যমে শক্তিসাধ্য কাজ সম্পন্ন করা।

জের

'জের' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—রেশ, সংক্রমণ, অনুবৃত্তি প্রভৃতি। 'জের' ফারসি শব্দ। ফারসি ভাষায় 'জের' শব্দটির অর্থ—নিচে, নিচ, নিম্ন, অধঃ প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'জের' শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে 'ইজা'। এটিও ফারসি শব্দ। তবে ফারসি ভাষায় 'ইজা' শব্দের অর্থ 'জের' নয়। ফারসি ভাষায় 'ইজা' শব্দের অর্থ হচ্ছে : আরও, অধিকন্তু, এতদ্ব্যতীত, এছাড়া প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হিসাবের 'ইজা' বা 'জের' শব্দের সঙ্গে ফারসি ভাষার ইজা বা জের-এর সরাসরি কোনো মিল নেই। তবে হিসাবের খাতায় যখন ইজা বা জের লেখা হয় তখন বোঝা যায় আরও কিছু আছে—যা ফারসি 'জের' বা 'ইজা' শব্দের মূল অর্থকে ইঙ্গিত করে। অতএব ফারসি হতে বাংলায় এলেও শব্দ-দুটো তাদের অস্তিত্বকে পুরোপুরি বিসর্জন দেয়নি।

মূলত 'জের' শব্দটি হিসাবের খাতায় বেশি ব্যবহৃত হয়। শব্দটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে—পূর্বের পাতার শেষ না-হওয়া হিসাব পরের পাতায় ওঠানো। যাকে সাধারণভাবে জের-টানা বলা হয়। 'জের' শব্দটি এখন শুধু হিসাবের খাতায় ব্যবহৃত হয় তা নয়; কৃতকর্মের পরিণাম, ভুলের মাসুল প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তোমার এ অপরিণামদর্শিতার জের তোমাকেই টানতে হবে।

জেরবার

ফারসি 'জের-ই-বার' শব্দ থেকে বাংলা 'জেরবার' শব্দের উৎপত্তি। ফারসি 'জের' মানে নিচে এবং 'বার' মানে বোঝা। সুতরাং 'জেরবার' মানে বোঝার নিচে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। যিনি বোঝার নিচে থাকেন তিনি পর্যুদস্ত না-হয়ে থাকতে পারেন না।

জ্বালাতন

আরবি 'জালা-ওয়তন' শব্দ থেকে 'জ্বালাতন' শব্দের উৎপত্তি। আরবি 'জালা' শব্দের অর্থ নির্বাসন এবং 'ওয়তন' শব্দের অর্থ দেশ। সুতরাং 'জালাতন' শব্দের অর্থ 'দেশ থেকে নির্বাসন'। দেশ থেকে নির্বাসনের মতো কষ্ট খুব কমই আছে। যাকে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে সে জানে এটি কত কষ্টের। আসলেই নির্বাসন খুবই দুঃখজনক এবং অন্তরে আগুন জ্বলার মতো কষ্ট দেয়। তাই জালা-য়তন = জালাতন শব্দটি বাংলায় এসে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে জ্বালাতন রূপ ধারণ করেছে। যার অর্থ পীড়ন। এই পীড়নের অর্থকে সার্থক করে তোলার জন্য 'জলা' হয়ে উঠেছে 'জ্বালা'।

ঝ

ঝটিকা-সফর

'ঝটিকা-সফর' শব্দের আভিধানিক অর্থ—হঠাৎ ভ্রমণ, আকস্মিক যাত্রা, পূর্ব-ঘোষণা ছাড়া কোথাও যাত্রা বিরতি বা পরিদর্শন, হঠাৎ অল্পসময়ের জন্য কোথাও এসে অল্পক্ষণ অবস্থান করে আবার চলে যাওয়া, পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া কোথাও অল্পসময়ের জন্য যাত্রাবিরতি প্রভৃতি। 'ঝটিকা' ও 'সফর' শব্দের মিলনে 'ঝটিকা-সফর' শব্দের উৎপত্তি। 'ঝটিকা' সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ—ঝড়, বাত্যা, ঘূর্ণিবায়ু প্রভৃতি। 'সফর' আরবি শব্দ, এর অর্থ—ভ্রমণ,

দেশ পর্যটন, যাত্রা প্রভৃতি। ঝটিকা বা ঝড় কোনোরূপ পূর্ব-ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে যায়। তেমনি কোনো ব্যক্তিবিশেষের এমন পূর্ব-ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ কোথাও ভ্রমণ বা যাত্রাবিরতিকে 'ঝটিকা-সফর' বাগভঙ্গি দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ট ঠ ড ঢ
ট

টানাপড়েন

'টানাপড়েন' শব্দের আভিধানিক অর্থ পুনঃপুন ক্লান্তিকর কোনো কিছুর মধ্যে ঝুলে থাকা, সংকটের মধ্যে থাকা। বস্তুত কাপড় বোনার তাঁত ও এর একটি নিপুণ কার্যক্রম থেকে টানাপড়েন শব্দটির উৎপত্তি। তাঁতের ফ্রেমে বাঁধা দৈর্ঘ্যের সুতোকে বলে 'টানা' এবং প্রস্থের সুতোকে বলে 'পড়েন'। পড়েনের সুতো মাকুতে জড়ানো থাকে। তাঁতির হাতের দক্ষ সঞ্চালনে মাকু এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করতে করতে কাপড় বোনার কাজ চলতে থাকে। তবে কাজটি সহজ নয়। তাঁতি দক্ষ হাতের নিপুণ টানের অপূর্ব কৌশলে মাকুর পড়েন-সুতো তাঁতের টান-এর সুতোর সঙ্গে গেঁথে দিতে থাকে। টানা ও পড়েনের গ্রন্থনই হচ্ছে কাপড় বোনা। টানা-পড়েনের সুতোয় সামান্য এদিক-ওদিক হলে কাপড় বোনা বন্ধ করে দিতে হয়। তাই কাজটি শুধু বিরক্তিকর নয়, কষ্টকরও বটে। টানা সুতোর সঙ্গে পড়েনের সুতোর একঘেয়েমি শব্দ ক্লান্তিরকরভাবে অনবরত একই কাজ করে যাওয়ার বিষয়কে জীবনযাত্রার টানাপড়েন অর্থে ব্যবহার করা হয়।

টিটকারি

'টিটকারি' একটি মর্মবিদারক শব্দ। প্রাচীন এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ—ঠাট্টা, উপহাস, ধিক্কার, বিদ্রূপ, অশালীন মন্তব্য, অপমানজনক শব্দ প্রভৃতি। কোনো শব্দ যা অন্য কাউকে হেয় বা অপমানিত করার জন্য কিংবা উপহাস, ধিক্কার বা বিদ্রূপ হানার জন্য করা হয় তা-ই 'টিটকারি'। টিটকারির শব্দ কেবল মুখ দিয়ে বের হয় তা কিন্তু নয়, এটি নাক, হাতের আঙুল বা অন্য কোনোভাবেও হতে পারে। রাখাল বা চাষির গৃহপালিত পশু তাড়নোর চিরায়ত শব্দ থেকে 'টিটকারি' বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। পশু তাড়ানোর সময় রাখাল বিভিন্ন শব্দ করে। বিশেষ করে জমি চাষের সময় পশুকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণের জন্য চাষি মুখে টিট-টিট শব্দ করে। এ টিট-টিট শব্দ থেকে টিটকারি শব্দটির উৎপত্তি। পশুকে টিটকারি দিলে পশু লজ্জা পায় কিনা বোঝা যায় না কিন্তু ঠিক পথে এগিয়ে যায়। তবে মানুষকে টিটকারি দিলে লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, রাগে ফুলে ওঠে। টিটকারির আবার বিভিন্ন মাত্রা ও পরিমাত্রা আছে। মশকরা সম্পর্কের আত্মীয়দের মধ্যে টিটকারি লজ্জার হলেও বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য। দুলাভাই ও শালা-শালী কিংবা দাদা ও নাতি-নাতনির মধ্যে টিটকারি একটা পর্যায় পর্যন্ত অম্লমধুর বলা যায়। তবে অন্যক্ষেত্রে তা ভীষণ মর্মঘাতী। কখনো কখনো টিটকারির আঘাত শারীরিক আঘাতের চেয়েও জঘন্য হয়ে যেতে পারে। সম্পর্ক ছাড়াও লিঙ্গবিশেষে টিটকারির প্রতিক্রিয়া ভয়ানক। একই টিটকারি সমলিঙ্গে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিপরীত লিঙ্গ হলে তা সাংঘাতিক পর্যায়ে চলে যেতে পারে। একজন ছেলে আর-একজন ছেলেকে যে টিটকারি দিয়ে উপহাস করার চেষ্টা করে সেই একই টিটকারি যদি একজন মেয়েকে দেওয়া হয় তা হলে ফল হয়ে যেতে পারে মারাত্মক।

টিপ্পনী

শব্দটির আভিধানিক অর্থ—ফোড়ন-কাটা, বিরূপ মন্তব্য করা, অশালীন উক্তি করা, আলোচনায় বিদ্রূপাত্মক বাক্য ব্যবহার, কথাবার্তায় মনঃকষ্টদায়ক মন্তব্য প্রভৃতি। এ ছাড়া বাংলা ভাষায় আর একটা টিপ্পনী আছে। সেটি হচ্ছে টীকা-টিপ্পনী। কোনো পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থের জন্য টীকা-টিপ্পনী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এ টীকা-টিপ্পনী বাগভঙ্গি থেকে টিপ্পনী শব্দের উৎপত্তি। টীকা শব্দের অর্থ হচ্ছে দুরূহ ও জটিল শব্দের ব্যাখ্যা এবং টিপ্পনী হচ্ছে

টীকার ব্যাখ্যা। সুতরাং উভয় শব্দ প্রায় সমার্থক বলা যায়। এ জন্য টিপ্পনী শব্দটি টীকা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। টিপ্পনী দ্বারা গ্রন্থে দুরূহ ও জটিল শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পাণ্ডুলিপিতে এ ব্যাখ্যা শোভনীয় ও আবশ্যক হলেও আলোচনা বা কথাবার্তায় এটি শোভনীয় না-ও হতে পারে। কোনো বিষয়ে অতিরিক্ত কথা বললে শ্রোতৃবর্গের অনেকের মধ্যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে। তাই তাঁরা এরূপ অতিরিক্ত কথা বা টীকার ব্যাখ্যা বা টিপ্পনীকে বিরূপ মন্তব্য বা অশালীন উক্তি হিসেবে ধরে নিতে পারেন। অধিকন্তু মানুষ নানাক্ষেত্রে খুব স্পর্শকাতর হয়। একজনের কাছে যে কথা স্বাভাবিক ও শোভনীয় তা অন্যের কাছে মনঃকষ্টের হতে পারে। তাই আলোচনা বা কথাবার্তায় অতিকথন তথা ব্যাখ্যাকে বিরূপ বা অশালীন মন্তব্য গণ্য করা হয়। গুরুগৃহ থেকে টিপ্পনী শব্দটি এমন কষ্টকর অর্থ ধারণ করে। গুরুগণ তাঁদের পাণ্ডুলিপি বা গ্রন্থে অসংখ্য টিপ্পনী দিলেও শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কোনো টিপ্পনী শুনতে আগ্রহী ছিলেন না। কোনো শিক্ষার্থী এরূপ টিপ্পনী দেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে অশালীন, বিদ্রূপ বা বিরূপ মন্তব্য বলে থামিয়ে দেওয়া হতো। মূলত এ কারণে পাণ্ডুলিপির আবশ্যক ব্যাখ্যাময় টিপ্পনী কথাটি বাঙালির বাগভঙ্গিতে এসে ফোড়ন-কাটা, বিরূপ মন্তব্য করা, অশালীন উক্তি করা, আলোচনায় বিদ্রূপাত্মক বাক্য ব্যবহার প্রভৃতি অর্থ ধারণ করে।

টেক্কা

'টেক্কা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—অতিক্রম করা, ছাড়িয়ে যাওয়া, টক্কর দেওয়া, পাল্লা দেওয়া, মোকাবেলা করা প্রভৃতি। তাসখেলা গভীর একাগ্রতায় মগ্ন থাকার মতো একটি খেলা। এ তাসখেলা থেকে 'টেক্কা' বাগভঙ্গির উৎপত্তি। যে তাসে একটি ফোঁটা থাকে সেটি হচ্ছে তাসের টেক্কা। তাসখেলায় টেক্কা হচ্ছে ক্ষমতাবান তাস। এটা যে পায় তার জয় বহুলাংশে নিশ্চিত হয়ে যায়। টেক্কা ফেলে পিঠ নেওয়া হলো আসল টেক্কা-মারা। টেক্কা মারলে জয়, টেক্কার এ নিশ্চিত জয়কে বাঙালিরা প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় নিয়ে এসেছে। 'টেক্কা মেরে' জয়লাভ করার অর্থ হচ্ছে, অন্যকে কুপোকাত করে নিজের আসন স্থায়ী করে নেওয়া।

ট্যান্ডল

'ট্যান্ডল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—অনুচর, চামচা, দালাল। মালয়লাম শব্দ 'টনডল' থেকে ট্যান্ডল শব্দের উৎপত্তি। মালয়লাম ভাষায় জাহাজের খালাসিদের সর্দারকে 'টনডল' বলা হয়। প্রায় সবখানে এ পদে কর্মরত কর্মচারীগণ মালিকের একান্ত অনুগত লোক হয়। তারা সর্বদা মালিকের পক্ষ নিয়ে কাজ করে এবং নিরীহ শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার করে। 'টনডল' পদে সে লোককে নিয়োগ দেওয়া হতো যিনি মালিকের অত্যন্ত অনুগত এবং বিনা বাক্যব্যয়ে মালিকের সব আদেশ-নির্দেশ মেনে নেয়। 'টনডল' মালিকের নির্দেশমতো কাজ করত এবং অন্যান্য খালাসিদের ওপর অত্যাচার করত। টনডলের এমন আচরণ থেকে শব্দটি অনুচর, চামচা বা দালাল অর্থ ধারণ করে।

ঠ

ঠুনকো

'ঠুনকো' শব্দের আভিধানিক অর্থ—ভঙ্গুর। যা সহজে ভেঙে যায় তা-ই ঠুনকো। নিম্নমানের সম্পর্ক, চারিত্রিক নিকৃষ্টতা প্রভৃতি অর্থেও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। 'ঠুন' শব্দ থেকে ঠুনকো বাগভঙ্গির উৎপত্তি। কাচ, চিনামাটির তৈজসপত্র, কাচের গ্লাস প্রভৃতি পড়ে গেলে ঠুন শব্দে ভেঙে যায়। পতনের পর যে সব বস্তু 'ঠুন' শব্দ করে ভেঙে যায় সেগুলো হলো ঠুনকো জিনিস। 'ঠুন' শব্দ হতে পাওয়া ঠুনকো শব্দ এখন শুধু কাচের বা

চিনামাটির তৈজসপত্রের জন্য ব্যবহৃত হয় না; যে সব জিনিস সহজে ভেঙে যায়, বা নষ্ট হয়ে যায় সে সব জিনিসের ক্ষেত্রে বাগভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়। শুধু তাই নয়, মানুষের মানবিক অনুভূতির প্রকাশেও 'ঠুনকো' শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—ঠুনকো ভালবাসা, ঠুনকো সম্মান, ঠুনকো চরিত্র প্রভৃতি।

ঢ

ঢালাও

'ঢালাও' বা 'ঢালাওভাবে' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—বাছবিচার না করে কোনো কিছু করা, বিস্তৃত, প্রশস্ত, নির্বিশেষে, বিবেচনাবোধহীন প্রভৃতি। 'ঢালা' ক্রিয়া থেকে 'ঢালাও' বা 'ঢালাওভাবে' শব্দের উৎপত্তি। 'ঢালা' ক্রিয়ার অর্থ—পাত্র বা সংরক্ষণ স্থান হতে কোনো কিছু উপড়ে দেওয়া, ছিটিয়ে দেওয়া, বিছিয়ে দেওয়া, ঢেলে দেওয়া বা ছুঁড়ে দেওয়া। গিন্নি শুধু রান্নার পাত্রে তৈল ঢালেন না, মাঝে মাঝে রেগে গেলে তৈলপাত্র উপুড় করে সারা মেঝেয় ঢেলে দিতেও দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো নিজের ব্যবহারের প্রিয় রূপ-সজ্জার জিনিসপত্রও ঢেলে দেন। প্রথমটি আবেগের, দ্বিতীয়টি রাগের। দুটোই কিন্তু ঢালা। মানুষ যখন কোনো পাত্র হতে কিছু ঢালেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশি ঢালুন বা কম ঢালুন কোনটি ঢালবেন বা কোনটি ঢালবেন না তা নিয়ে কোনো বাছবিচার করেন না। অবশ্য ঢালার আগে তা যথার্থভাবে করাও সম্ভব নয়। তাই পাকা ফল পাড়তে গেলে কাঁচা ফলও পড়ে যায়। ঢালার পর প্রয়োজন হলে বাছবিচার শুরু করেন। ব্যবসায়ী বা কৃষক উৎপন্ন ফসল আগে তোলেন, তারপর শুরু করেন বাছাই—ভালো-মন্দ, উৎকৃষ্ট-মাঝারি প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্তকরণ। শস্যদানা থেকে ছিটা বাছা গ্রামবাংলার একটি প্রাচীন রেওয়াজ। তবে ছিটা বাছার আগে শস্যকে ঢেলে নিতে হয়। ঢালার সময় কোনো বাছবিচার করা হয় না, ভালো-মন্দ নির্বিশেষে পুরোটাই ঢেলে দেওয়া হয়। ঢালার পর শুরু হয় বাছবিচার বা ছিটা বাছার কাজ। রাগের বশে কেউ যখন কোনো বস্তু ঢেলে দেন তখন কোনো বাছবিচার থাকে না। ঢালার পর রাগ কমে গেলে শুরু হয় বোধ, এটি চেতনা বা বাছবিচারের অনুভূতি। তখন আফসোস হয়, ঢেলে দেওয়া বস্তু হতে যতটুকু সম্ভব উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়। পুলিশ অনেক সময় ঢালাওভাবে গ্রেফতার করেন। তারপর শুরু করেন বাছবিচার। ঢালার কাজটা বাছবিচারহীনভাবে করা হয়। এ বাছবিচারহীন 'ঢালা' থেকে বাংলা বাগভঙ্গি 'ঢালাও' বা 'ঢালাওভাবে' শব্দের উৎপত্তি।

ঢি ঢি

নিন্দার্থে ব্যবহৃত শব্দটির আভিধানিক অর্থ—ব্যাপক জানাজানি। ঢোল ও ঢোলের আওয়াজ থেকে বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। এটি অব্যয় পদ। ঢেঁড়া এক প্রকার ঢোল। একসময় বাংলাদেশের সর্বত্র এর বহুল প্রচলন ছিল। পেটালে ঢেঁড়া হতে বিকট শব্দে ঢি ঢি ধ্বনি বের হয়ে আসত। চারদিকের লোকজন শুনতে পেত ঢেঁড়া ঢোলের ঢি ঢি আওয়াজ। আগে প্রচারের জন্য এত আধুনিক মাধ্যম ছিল না। জমিদার, রাজা বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কিছু ঘোষণা বা জানান দেওয়ার প্রয়োজন হলে ঢেঁড়া পেটানো হতো। ঢেঁড়ার শব্দে চারদিক থেকে লোকজন জড়ো হলে ঘোষক সমবেত লোকদের ঘোষণাটি শুনিয়ে দিত। এভাবে কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অল্পসময়ের মধ্যে লোকমুখে ছাড়িয়ে পড়ত। ঢেঁড়া পিটিয়ে ঢি ঢি শব্দের মাধ্যমে লোকজন জড়ো করে ঘোষণা প্রচারের প্রাচীন রেওয়াজ থেকে ঢি ঢি শব্দটি মানুষের বাগভঙ্গিতে উঠে আসে। এখন অবশ্য ঘোষণা প্রচারকে ঢি ঢি পড়ে গেছে বলা হয় না। বাগভঙ্গিটি নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়। কারও বদনাম বা খারাপ কিছু ছড়িয়ে পড়লে, বা খারাপ কিছু ঘটলেই কেবল ঢি ঢি পড়ে। ভালো কোনো কিছুর জন্য ঢি ঢি পড়ে না।

ঢিমেতাল

ধীরগতি, অতি ধীর, মন্থরগতি প্রভৃতি। ধ্রুপদী ও উচ্চাঙ্গসংগীতে ঢিমেতাল প্রয়োজন হয়। 'ঢিমে' ও 'তাল' শব্দের সমন্বয়ে 'ঢিমেতাল' শব্দের উৎপত্তি। 'ঢিমে' শব্দের অর্থ ধীর, মন্থর এবং 'তাল' শব্দের অর্থ সংগীতের তাল। 'ঢিমেতাল' হচ্ছে ধীর বা মৃদুলয়ে গেয়ে যাওয়া বা বাজিয়ে যাওয়া একটি তাল। এ ঢিমেতাল থেকে বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। তাল রক্ষার জন্য অনেক সময় ধ্রুপদী বা উচ্চাঙ্গসংগীতের শিল্পীকে গান বা বাজানার কিছু অংশ ঢিমেতালে গাইতে হয় বা বাজাতে হয়। ঢিমে ত্রিতাল ও ঢিমে একতাল অতি ধীর ও মন্থরগতিতে গেয়ে যাওয়া হয় বা বাজিয়ে যাওয়া হয়। ঢিমেতালের এ মৃদু ও মন্থরগতিটি সংগীতজগৎ হতে মানুষের বাগভঙ্গিতে চলে এসেছে। কোনো অফিসে যদি ধীর বা মন্থরগতিতে কাজ হয় তা হলে তাকে 'ঢিমেতালে কাজ চলছে' বলা হয়। এটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঢুঁ-মারা

'ঢুঁ-মারা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ খোঁজখবর নেওয়া। কোনোরূপ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোথাও যাওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা যায় কোনো কাজ ছিল না, তবু বাজারে একটু ঢুঁ-মেরে এলাম। ঢুষ মারা থেকে ঢুঁ-মারা বাগভঙ্গির উৎপত্তি। এবার ঢুষ কে মারে দেখা যাক। গরু-ছাগল, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু প্রায়শ সুযোগ পেলেই কোনোরূপ ইশারা-ঈঙ্গিত ছাড়াই হঠাৎ ঢুষ মেরে বসে। গৃহপালিত পশুর ঢুষ মারার কোনো উদ্দেশ্য আসলে থাকে না। ইচ্ছে হলো এবং সুযোগ পেল, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে একটা মেরে দিল—এই আর কী! এরূপ ঢুষ মারা মূলত গৃহপালিত পশুর ক্ষণিকের আনন্দ। মানুষ যখন গরু-ছাগলের ঢুষ মারার মতো উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোথাও যায় তখন তাকে বলা হয় ঢুঁ-মারা। গরু-ছাগলের শিং আছে বলে তাদের ঢুষে চন্দ্রবিন্দু নেই। কিন্তু মানুষের যেহেতু শিং নেই এবং কপালে শিং লাগানোরও কোনো সুযোগ নেই, তাই বাধ্য হয়ে ঢুঁ-মারা বাগভঙ্গিতে চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে গরু-ছাগলের উদ্দেশ্যবিহীন কাজটাকে আরও সার্থক ও একনিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে।

ঢেলে সাজা

নতুনভাবে শুরু করা, পুরনো বিষয়কে নতুন করে শুরু করা, কোনো কাজের মূল বিষয় অক্ষুণ্ণ রেখে পদ্ধতিগত বিষয়ের পুরো পরিবর্তন প্রভৃতি অর্থে 'ঢেলে সাজা' বাগভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়। তামাক ও হুঁকো থেকে ঢেলে সাজা বাগভঙ্গিটি এসেছে। একবার তামাক খাওয়া শেষ হওয়ার পর পুনরায় তামাক সেবন করতে হলে পুনরায় তামাক সাজাতে হয়। এ পর্যায়ে কল্কে উপুড় করে পোড়া-তামাক, ছাই ইত্যাদি ফেলে আবার নতুন তামাক ভরে নতুনভাবে আগুন দিয়ে কল্কে সাজাতে হয়। যদিও হুঁকো অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য মাঝে মাঝে হুঁকোর পানিও পরিবর্তন করতে হয়। কল্কে সাজানোর এ প্রক্রিয়াটি বাগভঙ্গি হিসেবে মানুষের বাক্যে চলে এসেছে। প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগত কারণে তামাক-সেবন করা সম্ভব না-হলে পুনরায় কল্কে ঢেলে সাজিয়ে সেবনের উপযোগী করা হয়। তেমনি কোনো কাজ বা পরিকল্পনা নানা-কারণে বাস্তবায়নে বিভ্রাট বা অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। তেমন অবস্থায় ওটি কল্কে ঢেলে সাজানোর ন্যায় ঢেলে সাজিয়ে উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

ত থ
ত

তখত তাউস বা তখতে তাজ

আরবি 'তাউস' শব্দের অর্থ—ময়ূর বা এমন কোনো যন্ত্র যার মুখ ময়ূরের মতো। মোগল আমলে রাজা-বাদশাহদের সিংহাসনে ময়ূরের নকশা থাকত। তাই সে সিংহাসনকে বলা হতো তখত তাউস বা তখতে তাজ। ইতিহাসে আজও ময়ূর সিংহাসনের উল্লেখ রয়েছে, যা নাদির শাহ দিল্লি দখলের সময় লুট করে নিয়েছিল। কিন্তু 'তখত তাউস' শব্দটি বাংলা ভাষায় পাকাপাকিভাবে থেকেই গেল।

তনয়

'তনয়' শব্দের আভিধানিক অর্থ—পুত্র, নন্দন, ছেলে, সন্তান প্রভৃতি। 'তনয়' সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় তনয় শব্দের অর্থ হচ্ছে বংশবিস্তারক, বংশবিস্তারকারী। বস্তুত যার মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটে সংস্কৃত ভাষায় তাকে বলা হয় 'তনয়'। তনয় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ তনয়া। তনয় ও তনয়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটে। তাই তনয় শব্দের বাংলা অর্থ 'পুত্র' এবং তনয়া অর্থ 'কন্যা'। অবশ্য তনয় বা তনয়া দ্বারা বংশবিস্তার না-ও ঘটতে পারে। তাই বর্তমানে তনয় বা তনায়া শব্দের সঙ্গে বংশবিস্তারের কোনো সম্পর্ক নেই। এখন 'তনয়' বলতে পুত্র এবং 'তনয়া' বলতে কন্যাকে বোঝানো হয়।

তন্নতন্ন

'তন্নতন্ন' শব্দের অর্থ—পুঙ্খানুপুঙ্খ, কোনো কিছু বাদ না-দিয়ে, সবিস্তারে প্রভৃতি। তন্নতন্ন সংস্কৃত হতে আগত এবং বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। 'তন্নতন্ন' শব্দের 'তন্ন' হচ্ছে সংস্কৃত, 'তৎ ন' বাগভঙ্গির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ 'তা নয়'। সুতরাং এ হিসাবে 'তন্নতন্ন' শব্দের অর্থ হচ্ছে তা নয়—তা নয়। কোনো কিছু খুঁজতে গেলে লক্ষ্যবস্তু ছাড়া অনেক কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু লক্ষ্যবস্তু ছাড়া অন্য যা-ই কিছু পাওয়া যাক না কেন, বলা হয় তা নয়, আবারও অপ্রয়োজনীয় কিছু এসে যায় এবং বলা হয় তা নয়। বারবার এমন ঘটে। তাই বারবার উচ্চারিত হয়—তা নয়, তা নয়। মানে যা খোঁজা হচ্ছে তা পাওয়া যাচ্ছে না। আরও খুঁজতে হবে। কীভাবে খুঁজতে হবে? 'তা নয়' করে করে সবিস্তারে এবং যা নয় সেটিও বাদ না-দিয়ে। আসলে কোনো কিছু খুঁজতে গেলে কোনো কিছু বাদ দেওয়া যায় না। তা-নয়, তা-নয় করে সব কিছু দেখতে হয়। এভাবে 'তা-নয়' শব্দটি হয়ে গেল কোনো কিছু বাদ না-দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে—তন্নতন্ন করে—দেখা।

তফাত

'তফাত' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—পার্থক্য, দূরত্ব প্রভৃতি। আরবি 'তাফাওয়াত' শব্দ থেকে বাংলা 'তফাত' শব্দের উৎপত্তি। আরবিতে শব্দটির অর্থ 'বিরতি'। বিরতি মানুষের জীবনের একটি অনিবার্য কাল। এটি কখনো আসে ইচ্ছাকৃতভাবে, আবার কখনো আসে আকস্মিক। যেভাবে আসুক না কেন, বিরতি বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পর দূরত্ব সৃষ্টি করে। মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন কাজের মাঝখানে একটু বিরতি চায়। এ বিরতি পূর্বতন কাজ থেকে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি করে। আবার কেউ যখন বাধ্যতামূলক কর্মবিরতি পায় তখন আরও বেশি দূরত্ব ঘটে। কর্মকালীন জীবনধারার সঙ্গে বিরতি বা কর্মবিহীন জীবনের যেমন পার্থক্য রয়েছে তেমনি রয়েছে দূরত্ব। তাই আরবি 'তাফাওয়াত'-এর মূল অর্থ বাংলায় এসে পরিবর্তন হয়েছে সংগতকারণেই।

তর্জনী

'তর্জন-গর্জন' শব্দের 'তর্জন' অংশ থেকে তর্জনী শব্দের উৎপত্তি। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমার মধ্যকার আঙুলটির নাম তর্জনী। আঙুলটির যেমন দৈহিক উপযোগিতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভাষিক উপযোগিতা। কাউকে কলা দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয় বুড়ো আঙুল কিন্তু কাউকে দেখে নেওয়ার জন্য বা হুমকি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় তর্জনী। তর্জনী নাড়ানোর ভঙ্গি দেখে মেজাজ বোঝা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমার মাঝখানের আঙুল নেড়ে তর্জনগর্জন করা হয় বলেই এই আঙুলের নাম হয়েছে 'তর্জনী'।

তাণ্ডব

'তাণ্ডব' শব্দের আভিধানিক অর্থ—প্রলয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর, উদ্দাম-নৃত্য প্রভৃতি। ভারতীয় পুরাণের অন্যতম দেবতা শিব বা মহাদেবের সঙ্গে 'তাণ্ডব' শব্দের ব্যুৎপত্তি জড়িত। মহাদেব জটাজুটের বাঁধন খুলে রুদ্র নটরাজরূপে নৃত্য করতেন। তাঁর এ নৃত্যকে বলা হতো তাণ্ডব। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, মহাদেব ধ্বংস ও প্রলয়ের দেবতা। মহাবিশ্বের মহাপ্রলয়ের পূর্বেও তিনি রুদ্রমূর্তি ধারণ করে নৃত্য করবেন। এ নৃত্যে পুরো বিশ্ব মহাকম্পনে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ নৃত্যকেও 'তাণ্ডব নৃত্য' বলা হয়। মহাদেবের এ প্রলয় নৃত্য থেকে বাংলা 'তাণ্ডব' শব্দের উৎপত্তি।

তামাশা

'তামাশা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—কৌতুক, মজা, পরিহাস, ঠাট্টা, মশকরা, খেলা, ক্রীড়া, বাজি প্রভৃতি। ফারসি 'তামাশা' শব্দ থেকে বাংলা তামাশা শব্দের উৎপত্তি। তবে ফারসি তামাশা শব্দের অর্থ নাট্যশালা। নাট্যশালায় নাটকের মাধ্যমে কৌতুক, মজা, পরিহাস, ঠাট্টা, মশকরা, বাজি, ক্রীড়া প্রভৃতি বহুমুখী বিষয় উপভোগ করা যায়। নাটক জীবনের চিত্র। মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের ধরাবাঁধা একঘেঁয়েমি থেকে আনন্দ নিতে নাট্যশালায় যায়। তাই ফারসি নাট্যশালা বাংলায় এসে কৌতুক, মজা, পরিহাস, ঠাট্টা, মশকরা, খেলা, ক্রীড়া, বাজি প্রভৃতি অর্থ 'তামাশা'র মধ্যে ধারণ করেছে।

তালকানা

যার তাল কানা, সে-ই তালকানা। 'তাল' থেকে তালকানা পদের উৎপত্তি। এ 'তাল' কিন্তু গাছের 'তাল' নয়; ঝগড়াঝাঁটি করার জন্য অন্যকের দেওয়া কুমন্ত্রণাপ্রসূত তালও নয়। এ তাল গীত, বাদ্য ও নৃত্যের তাল। পুরনো তালের রস খেয়ে যে বেতালা হয় তাকে কিন্তু তালকানা বলে না। তালকানা শব্দের অর্থ—যার তাল ও লয় জ্ঞান নেই। কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্থেও 'তালকানা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যার তাল ও লয়বোধ নেই তার গান বেসুরো হয়ে শ্রোতৃবৃন্দের কণ্ঠে সুধার পরিবর্তে বিরক্তি সৃষ্টি করে। তাই তালকানার সঙ্গীত সর্বত্র পরিত্যাজ্য ও বিরক্তিকর। তবে তালকানা ব্যক্তি বলতে শুধু তাল-লয় জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে বোঝায় না। যার কথাবার্তা, আচার-আচরণ অস্বাভাবিক, বিরক্তিকর ও অন্যকে বিব্রত করে, তাকেও 'তালকানা' বলা হয়।

তালপাতার সেপাই

'তালপাতার সেপাই'-এর ভাবার্থ হলো—দুর্বল লোক। সেপাই মানে সৈনিক বা সিপাহি। অর্থাৎ তালপাতার মতো কৃশকায়/পাতলা/রোগা যে লোক, রূপকার্থে তাকে তালপাতার সৈনিক বলা হয়েছে। অন্য অর্থে নির্ঝঞ্ঝাট ব্যক্তি। যে অন্যায় এড়িয়ে চলে তাকে দুর্বল বলে। একসময় শিশুরা তালপাতা দিয়ে তৈরি পুতুল নিয়ে খেলত। সে পুতুলের আকৃতি খানিকটা বর্মপরা সৈনিকের মতো ছিল। পুতুলগুলো ছিল পাতলা, কৃশকায় এবং খুব দুর্বল। তালপাতার তৈরি এই পুতুল থেকে 'তালপাতার সেপাই' কথাটির উৎপত্তি।

তিনকুল

'তিনকুল' শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—তিন বংশ। তিন ও কুল মিলে তিনকুল। কুল মানে বংশ। আর তিন কুল হচ্ছে যথাক্রমে পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। এ তিন বংশে যার কোনো আত্মীয়স্বজন থাকে না তাকে বলা হয় তিনকুলহীন বা নিরাশ্রয়।

তিলোত্তমা

দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমরত্ব প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা বলেন যে, পরস্পরের হাতেই এদের মৃত্যু হবে, অন্য কারও হাতে নয়। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে বলেন। ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম জিনিস তিল তিল করে সংগ্রহ করে বিশ্বকর্মা এ সুন্দরীর সৃষ্টি করেছিলেন, ফলে এর নাম হয়—তিলোত্তমা। তাঁকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারদিকে চারটি মুখের সৃষ্টি হয় এবং ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু সৃষ্টি হয়। সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং একে অন্যকে নিহত করে। বাংলা একাডেমির 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' তিলোত্তমার অর্থ বলা হয়েছে হিন্দু পুরাণমতে সুন্দ ও উপসুন্দকে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সৃষ্টির সকল প্রকার সৌন্দর্য থেকে তিল তিল করে আহৃত উৎকৃষ্ট অংশ দ্বারা সৃষ্ট অপ্সরাবিশেষ/স্বর্গের পরমাসুন্দরী অপ্সরা।

তুঙ্গস্থান

প্রত্যেকটি গ্রহের একটি করে উচ্চ (exalted) বা তুঙ্গক্ষেত্র আছে। রবির তুঙ্গস্থান মেষরাশি; চন্দ্রের তুঙ্গস্থান বৃষরাশি; এভাবে, মঙ্গলের তুঙ্গস্থান মকর; বুধের তুঙ্গস্থান কন্যা; বৃহস্পতির তুঙ্গস্থান কর্কট; শুক্রের তুঙ্গস্থান মীন; শনির তুঙ্গস্থান তুলা; রাহুর তুঙ্গস্থান মিথুন ও কেতুর তুঙ্গস্থান ধনু। রাশির জন্য গ্রহ তুঙ্গে থাকা শুভফলপ্রদ। বৃহস্পতি (শুভগ্রহ) কর্কট রাশিতে অবস্থান করলে এ রাশির জাতক বলতে পারে 'বৃহস্পতি আমার এখন তুঙ্গে'।

তুবড়ি

'তুবড়ি' শব্দের আভিধানিক অর্থ—অনর্গল কথা বলা, বিরামহীন কথা প্রভৃতি। তুবড়ি হলো এক প্রকার আতশবাজি। দেখতে অনেকটা বড় আকারের ভারতীয় পেয়াজের মতো। তুবড়ির মুখে অগ্নিসংযোগ করার কয়েক সেকেন্ড পর বিরামহীন ফোয়ারার মতো চারপাশে আগুনের স্ফুলিঙ্গ প্রবল বেগে ছড়িয়ে পড়ে। একবার অগ্নিসংযোগ করার পর তুবড়ির মুখ থেকে স্ফুলিঙ্গ বের হলে নিজে নিজে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে আর থামানো যায় না। কিছু কিছু লোক আছে যারা একবার কথা বলা শুরু করলে নিজে নিজে বন্ধ না-করা পর্যন্ত তাদের কোনোভাবে থামানো যায় না। এমন লোকদের কার্যক্রমের সঙ্গে তুবড়ির মিল আছে বলে বাংলা ভাষায় বিরামহীন কথা বলাকে 'তুবড়ি' বাগভঙ্গিতে আবদ্ধ করে দিয়েছে।

তুলকালাম

'তুলকালাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ—তুমুল ঝগড়া, প্রচণ্ড কলহ, দীর্ঘ আলোচনা প্রভৃতি। তুলকালাম শব্দটি আরবি হতে আগত বাংলা ভাষার মেহমান। আরবি 'তুল' শব্দের অর্থ বিস্তার এবং 'কালাম' শব্দের অর্থ কথা বা বাক্য। অতএব তুলকালাম শব্দের অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ বাক্য। দীর্ঘ বাক্য মানে দীর্ঘ আলোচনা। আর দীর্ঘ আলোচনা করতে হলে যে দীর্ঘ বাক্য প্রয়োজন তা বাঙালির চেয়ে আর বেশি কে জানে। অতএব 'তুলকালাম' শব্দের অর্থ 'বাগবিস্তার'। এ থেকে এসেছে কথা কাটাকাটি, হৈচৈ, চিৎকার, চেঁচামেচি প্রভৃতি। ঝগড়াঝাঁটির প্রধান উপাদান কথা। কথা যত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয় ঝগড়া তত প্রবল ও প্রচণ্ড হয়। আরবি 'তুলকালাম' তথা বাগবিস্তারের মাধ্যমে বাংলা ঝগড়া প্রবল হয়ে ওঠে। তাই আরবি দীর্ঘ বাক্য বাংলায় এসে তুলকালাম বা 'তুমুল ঝগড়া' অর্থ ধারণ করেছে।

তৃণমূল

'তৃণমূল' শব্দের অর্থ—অরাজনৈতিক সামাজিক স্তর। শব্দটি বাংলা হলেও এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। ইংরেজি grass roots বাগভঙ্গিটিকে বাংলায় 'তৃণমূল' করে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ইংরেজিতে grass roots বলতে যা বোঝায়, তৃণমূল শব্দ দিয়ে বাংলায়ও তা প্রকাশ করা হয়। grass roots কথার উদ্ভব হয় আমেরিকায়। খনিবিদ্যায় ব্যবহারের জন্য শব্দটির প্রচলন হয়েছিল। মাটির প্রথম স্তরকে বলা হতো grass root। পরবর্তীকালে শব্দটির জন্মান্তর ঘটে এবং তা রাজনীতিক অঙ্গনে প্রবেশ করে। তখন এর অর্থ দাঁড়ায় গ্রামের সাধারণ ভোটার —যাঁরা প্রাচীন মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে আছেন এবং যাঁদের ওপর শহরের জীবনযাত্রার প্রভাব পড়েনি। ক্রমান্বয়ে ইংরেজিভাষী সকল অঞ্চলে কথাটি ছড়িয়ে পড়ে এবং অর্থ সামান্য পরিবর্তন হয়ে নতুন অর্থ দাঁড়ায়—রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে দূরে থাকা অরাজনৈতিক মানুষ।

তেল

তেল বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি অতি প্রয়োজনীয় চর্বিজাতীয় পানীয়। বিশেষ ধরনের উদ্ভিজ্জ দানা বা শস্য হতে এ তরলটি তৈরি করা হয়। মূলত খাদ্য তৈরিতে তেল-এর অধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। তিল, সরিষা, নারিকেল, তিসি, সয়াবিন, বাদাম, কদুর প্রভৃতিসহ আরও অনেক কিছু হতে তেল তৈরি হয়। মূলত তেল নামটি এসেছে 'তিল' হতে। একসময় আমাদের দেশে তিলই ছিল তেল তৈরির জনপ্রিয় উৎস। তাই তিলের নির্যাস তৈল নামে পরিচিতি পায়। এ অনুষঙ্গে যে উদ্ভিদেরই নির্যাস থেকে পদার্থটি তৈরি হোক না কেন, তা-ও তেল নামে পারিচিত।

তেলেবেগুনে

'তেলেবেগুনে' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—খুব রেগে যাওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া, প্রচণ্ড রাগ দেখানো। মানুষ রেগে যায়, রাগকে যতই পাশব বলা হোক না কেন, ক্রোধ একটি রিপু হওয়ায় মানুষ না-রেগে পারে না। তবে প্রত্যেক রাগের পেছনে কোনো না কোনো উৎস থাকে। এ যেমন তেলেবেগুনে। 'তেল' ও 'বেগুন' শব্দের সহযোগে তেলেবেগুনে বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। এর পেছনে একটি কারণ থাকতে পারে, আবার অনেক কারণও থাকতে পারে। তেল আর বেগুনের মিলন হয় রান্নাঘরে। সুতরাং তেলেবেগুনে জবলে ওঠা বাগধারাটি রান্নাঘর থেকে এসেছে। কাটা বেগুনের টুকরো তপ্ত কড়াইয়ের গরম তেলে ছেড়ে দিলে অকস্মাৎ যে ধরনের শব্দ ও দৃশ্যের সৃষ্টি হয়, তা হঠাৎ রেগে যাওয়া মানুষের অবয়বকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তেলেবেগুনে সংযোগের সময় তপ্ত তেল ছিটকে পড়তে পারে। এটি শরীরের যেখানে পড়ে সেখানে জ্বালা শুরু হয়। এরূপ প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ মানুষের সামনে যেই পড়ুক তারও রাগের আগুনে অপদস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রান্নাঘরে তেলেবেগুনের এ অনুষঙ্গ থেকে 'তেলেবেগুনে' বাগধারাটির উৎপত্তি।

তোঘলকি

শব্দটির আভিধানিক অর্থ—গোঁয়ার্তুমি, সৃষ্টিছাড়া, অপরিকল্পিত, অদূরদর্শিতা প্রভৃতি। এটি একটি ঐতিহাসিক নাম থেকে সৃষ্ট বাগভঙ্গি। দিল্লির সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনের ওপর ভিত্তি করে বাগভঙ্গিটি তৈরি হয়েছে। তিনি ১৩২৫ হতে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত অগ্রগামী ও পরিবর্তন মননশীলতার অধিকারী একজন আধুনিক মনের সৃজনশীল মানুষ। মধ্যযুগের সুলতান হলেও তার দৃষ্টি ছিল সুদূর ভবিষ্যতের আরও সুদূরে। শাসনকার্যে আধুনিকতা ও সাধারণ মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে তিনি অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন। তাঁর এ পরিবর্তনের মধ্যে শাসনকার্যে উলেমাদের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা অন্যতম। এছাড়া তিনি দোয়াব অঞ্চলে করবৃদ্ধি, দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, মুদ্রাসংস্কার ও তামার নোট প্রচলন করেন। তাঁর এ পরিবর্তন আধুনিকমনস্কতার পরিচায়ক হলেও যাদের জন্য তিনি এসব

করেছিলেন তারা ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রাচীন ধ্যান-ধারণায় আবদ্ধ সংকীর্ণ মনের অধিকারী। ফলে তাঁর পরিবর্তন ধর্মান্ধ ও পশ্চাৎপদ মানসিকতার অধিকারী জনগণ গ্রহণ করতে পারেনি। সমকালীন ইতিহাসবেত্তাদের অনেকে তাঁকে পাগল রাজা বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুহম্মদ বিন তুঘলকের এমন কার্যক্রম ও কাণ্ড থেকে 'তোঘলকি' বাগধারাটির উৎপত্তি।

তোড়জোড়

'তোড়জোড়' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—আয়োজন, উদ্যোগ, প্রস্তুতি প্রভৃতি। তোড়জোড় শব্দটি হিন্দি ভাষা হতে মেহমান হিসেবে বাংলায় এসেছে। 'তোড়' শব্দের অর্থ ছেঁড়া এবং 'জোড়' শব্দের অর্থ জোড়া দেওয়া। হিন্দি ভাষায় 'তোড়জোড়' শব্দটির অর্থ—ছেঁড়া জিনিস জোড়া দেওয়া। মানুষ যে সকল জিনিস ব্যবহার করে তা প্রথম অবস্থায় নতুন থাকে এবং এসব জিনিস এনেই কার্যক্রম শুরু করে। কিন্তু ব্যবহারের ফলে আস্তে আস্তে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কখনো ছিঁড়ে যায়, কখনো-বা ভেঙে যায়। এরূপ ভাঙা বা ছেঁড়া জিনিস ফেলে দেওয়া হয় না, বরং জোড়া লাগানোর মাধ্যমে আবার নতুনভাবে কাজে লাগানো হয়। কাজের জিনিস ছিঁড়ে গেলে বা ভেঙে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জোড়া লাগানোর মাধ্যমে বা মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার প্রয়াস হচ্ছে বন্ধ কাজ শুরু করার উদ্যোগ। ভাঙা বা ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে সাময়িক থেমে থাকা কোনো কিছুকে জোড়া লাগানোর মাধ্যমে পুনরায় কাজ শুরুর আয়োজন করা হয়। এ অনুষঙ্গে ছেঁড়া জিনিস জোড়া দেওয়ার কর্মটি আয়োজন, উদ্যোগ ও প্রস্তুতির সমার্থক হয়ে যায়।

তোতা পাখি আর টিয়া পাখি

পাখির নাম হিসেবে আমাদের বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'তোতা পাখি' আর 'টিয়া পাখি' খুব সাধারণ দুটো নাম হলেও এরা কিন্তু ঠিক এক বিষয় নয়। জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসবিদ্যায় Psittaciformes বর্গের অন্তর্ভুক্ত পাখিদের সাধারণভাবে টিয়া পাখি বা Parrot ডাকা হয়, এ বর্গটিতে ৩৭২টি প্রজাতি ও ৮৬টি গণ রয়েছে। কিন্তু এই বর্গের অনেকগুলো প্রজাতির পাখিদের একনামে তোতা পাখি বা Parakeet নামে ডাকা হয়—যারা আকারে ছোট থেকে মাঝারি হয়ে থাকে এবং সেই সঙ্গে যাদের লেজের পালক লম্বা হয়। যেমন—ব্রাজিলের 'স্কারলেট ম্যাকাও' যদিও টিয়া পাখি, কিন্তু তোতা পাখি নয়।

তোয়াক্কা

'তোয়াক্কা' শব্দের অর্থ পরোয়া, গ্রাহ্য প্রভৃতি। আরবি 'তাওয়াক' শব্দ থেকে বাংলা তোয়াক্কা শব্দের উৎপত্তি। আরবি ভাষায় শব্দটির অর্থ—নির্ভরতা, ভরসা, প্রত্যাশা প্রভৃতি। আরবি তাওয়াক শব্দের ব্যবহার শালীন ও নমনীয়, কিন্তু বাংলায় তোয়াক্কা শব্দের ব্যবহার অশালীন না-হলেও অবশ্যই নমনীয় নয়। এর মধ্যে একটা উদ্ধত ভাব থেকে যায়। বাংলায় এটি প্রতিপক্ষের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার আস্ফালন হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

তোলপাড়

'তোলপাড়' শব্দের আভিধানিক অর্থ—ওলটপালট, গণ্ডগোল, আলোড়ন, আন্দোলন, অস্বাভাবিক অবস্থা প্রভৃতি। 'তোলা' ও 'পাড়া' শব্দের সংযোগে তোলাপাড়া শব্দ গঠিত এবং 'তোলা পাড়া' শব্দদ্বয় থেকে তোলপাড় শব্দের উৎপত্তি। 'তোলা' শব্দের অর্থ উঁচু করা বা উঠানো এবং 'পাড়া' শব্দের অর্থ নামিয়ে আনা বা নামানো। সুতরাং 'তোলাপাড়া' শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হয়—উঠানো-নামানো। উঠানো ও নামানো গতিশীল কর্ম। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় এ গতি চোখে পড়ার মতো নয় এবং চোখে পড়ার মতো হলেও উঠানো-নামানোর লক্ষ্যে সৃষ্ট-গতি কারও অকাম্য নয়। কিন্তু উঠানো-নামানোর গতি যখন প্রচণ্ডভাবে অস্বাভাবিক হয়ে যায় তখন সবার চোখে

বিস্ময় আনে, চারদিকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বস্তুত এ অনুষঙ্গে উঠানো-নামানো অর্থে ব্যবহৃত 'তোলপাড়' শব্দটি ওলটপালট, গণ্ডগোল, আলোড়ন, আন্দোলন, অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে পড়েছে।

ত্যাঁদড়

'ত্যাঁদড়' শব্দের আভিধানিক অর্থ—নির্লজ্জ, বেয়াড়া, বেয়াদব, ধূর্ত প্রভৃতি। ফারসি 'তোন্দরোও' শব্দ থেকে বাংলা 'ত্যাঁদড়' শব্দের উৎপত্তি। ফারসি ভাষায় তোন্দরোও শব্দের অর্থ—গতিশীল, দ্রুতগামী, উগ্র, ক্ষিপ্র, চরমপন্থী, উগ্রপন্থী প্রভৃতি। বাংলায় এসে শব্দটি তার প্রাক্তন অর্থ হারিয়ে যে-অর্থ ধারণ করেছে তা হুবহু অভিন্ন না-হলেও খুব বেশি ভিন্নতা নেই। গতিশীল, দ্রুতগামী, উগ্র বা চরমপন্থী—যে কেউ হতে পারে না। এমন কার্যক্রম দেখাতে হলে কিছুটা ধূর্ততা আর কিছুটা নির্লজ্জতা এবং কিছুটা আদব-কায়দার বরখেলাপ প্রয়োজন। এটা চিন্তা করে বাঙালির হুজুগে মন ফারসি দ্রুতগামী, উগ্র ও চরমপন্থীদের নির্লজ্জ, বেয়াড়া, বেয়াদব ও ধূর্ত বানিয়ে দিয়েছে। চরমপন্থী তো সর্বত্র বেয়াড়া, ধূর্ত ও বেয়াদব বলে পরিচিত। ত্যাঁদড় শুধু নেতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করা হয় না। ইতিবাচক ও স্নেহজ্ঞাপক পদ হিসেবেও এর ব্যবহার লক্ষণীয়। পিতামাতা অনেক সময় ছেলের দুষ্টুমি ও বেয়াড়া স্বভাব দেখে খুশিতে উদ্বেল হয়ে বলেন ছেলেটা আমার বড় ত্যাঁদড়।

ত্রিশঙ্কু

'ত্রিশঙ্কু' শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনিশ্চিত অবস্থা। আগেও যেতে পারে না আবার পেছনেও হটে যেতে পারে না—এমন অনিশ্চিত অবস্থাকে বাংলায় ত্রিশঙ্কু দশা, ত্রিশঙ্কু অবস্থা কিংবা ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলে থাকা—প্রভৃতি বাগভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়। ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত বিখ্যাত সূর্যবংশীয় খ্যাতিমান রাজা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা থেকে বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। কথিত হয়, রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে তার ইচ্ছা পূরণের ব্যবস্থা নেওয়ার প্রার্থনা করেন। কুলগুরু তা অসাধ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেন। বশিষ্ঠের পুত্রগণের নিকট ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার সহায়তা পেলেন না। এ অবস্থায় তিনি অন্যত্র সহায়তার জন্য গমনের সিদ্ধান্ত নেন। তাতে গুরুপুত্র বৃন্ধ তাকে চণ্ডালে পরিণত হওয়ার অভিশাপ দেন। এ অবস্থায় ত্রিশঙ্কু বিখ্যাত ঋষি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র তপোবলে রাজা ত্রিশঙ্কুকে আকাশপথে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু স্বর্গে বসবাসকারী দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে ঢুকতে না-দিয়ে মর্ত্যপথে ঠেলে দেন। ইন্দ্র বলেন, "যেহেতু ত্রিশঙ্কু গুরুশাপে অভিশপ্ত, তাই তিনি স্বর্গে বাস করতে পারবেন না।" ত্রিশঙ্কু নিচে পতিত হতে থাকেন। বিশ্বামিত্র পতনোন্মুখ ত্রিশঙ্কুকে 'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ' বলে আবার আকাশপথে স্বর্গের দিকে ঠেলে দেন। ঊর্ধ্বালোকে বসে স্বর্গের দেবতারা আবার ত্রিশঙ্কুকে মর্ত্যপথে ঠেলে দেন। এভাবে একের পর এক ত্রিশঙ্কুর শুধু আসা-যাওয়া চলতে থাকে। দেবতা আর বিশ্বামিত্রের পরস্পর ঠেলাঠেলির কারণে বেচারা ত্রিশঙ্কু কোথাও স্থির হতে পারছিলেন না। অবস্থা ক্রমশ করুণ হতে করুণতর হয়ে ওঠে। এদিকে বিশ্বামিত্র দক্ষিণাকাশে অন্য এক সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেন। তাঁর সৃষ্টজগতে তিনি দেবতা ও নতুন ইন্দ্রের সৃষ্টিতেও তৎপর হয়ে ওঠেন। এতে দেবতারা ভীত হয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে নিজেদের মান রক্ষার আবেদন জানান। এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যেতে না-পারলেও বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলে থাকবেন এবং তার মধ্যে নিম্নশির ত্রিশঙ্কুও অবস্থান করবেন। ত্রিশঙ্কুর একবার স্বর্গে ও আর একবার মর্ত্যে যাওয়া-আসা এবং উভয়স্থানের কোথাও স্থির হতে না-পারার ঘটনা থেকে বাংলা বাগভঙ্গি 'ত্রিশঙ্কু অবস্থা' সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রুটি

'ত্রুটি' শব্দের আভিধানিক অর্থ—দোষ, অপরাধ, অভাব, প্রমাদ প্রভৃতি। শব্দটির মূল অর্থ ছিল—ছিন্ন, কর্তিত, অল্প, সামান্য, সংশয় প্রভৃতি। কালক্রমে শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। বস্তুত কোনো কিছু ছিন্ন বা কর্তন করা

ভালো নয়, অল্প বা সামান্য জিনিস দিলে কারও মন ভরে না। কোনো বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হলে গোলমাল শুরু হয়। অর্থাৎ ছিন্ন করা, কর্তন করা প্রভৃতি অপরাধমূলক এবং দোষণীয়। অন্যদিকে 'সামান্য' তো অভাব এবং 'সংশয়' প্রমাদের লক্ষণ। এতৎবিশ্লেষণে এটি প্রতীয়মান হয় যে, 'ত্রুটি' শব্দের মূল অর্থ ও প্রচলিত অর্থের বাহ্যিক আবরণে পরিবর্তন হলেও নতুন বোতলে পুরাতন মদের মতো মৌলিক বিষয় অভিন্ন রয়ে গিয়েছে।

থ

থ হয়ে গেলাম

কোনো কারণে আমরা যখন থ মেরে যাই কিংবা থ হয়ে পড়ি, তখন আমরা অনেক কিছুই হই, যেমন—অভিভূত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতভম্ব, স্তম্ভিত, নির্বাক, অবাক ইত্যাদি। প্রচুর অর্থ বহন করলেও আমরা জানি থ একটি বর্ণ মাত্র—ব্যঞ্জন বর্ণমালার সপ্তদশ এবং ত বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ। কিন্তু আমরা যখন থ হই, তখন বর্ণমালার অক্ষরবৎ থ হই না—হই শব্দভাণ্ডারের একটি শব্দস্বরূপ থ এবং সেই থ শব্দটির অর্থ হলো—পর্বত। পর্বত অর্থে থ শব্দের ব্যবহার অন্ত্যমধ্যযুগের বাংলা কবিতায় শেষবারের মতো দেখতে পাওয়া যায়। তারপর থেকে শুরু হয় থ শব্দের আলঙ্কারিক বা উপমাঘটিত প্রয়োগ। ঘটনাচক্রে পড়ে আমরা অতি সংক্ষেপে থ হওয়া শিখি। এই শিক্ষাটা আমরা পাই থ অর্থাৎ পর্বতের নিকট থেকে। থ যেমন নিশ্চল-নিশ্চুপ হয়ে থাকে, তার এই ভাবটিই আমরা গ্রহণ করি বিশেষ পরিস্থিতিতে—যখন আমাদের মুখে আর কথা সরে না, আমরা হয়ে থাকি পর্বতবৎ মৌন ও নিশ্চল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ

দক্ষ

দক্ষ একজন প্রজাপতি। তাঁর জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হতে তাঁর জন্ম। তাই তাঁর নাম দক্ষ। তিনি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন।

দক্ষযজ্ঞ

শব্দটির আভিধানিক অর্থ—হট্টগোল, হইচই, লণ্ডভণ্ড, ওলটপালট প্রভৃতি। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড, দক্ষযজ্ঞ বাধানো প্রভৃতি বাগভঙ্গি এসেছে ভারতীয় পুরাণ থেকে। দক্ষ ছিল ব্রহ্মার পুত্র। দক্ষের কনিষ্ঠ কন্যা সতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে হয়। কথিত হয়, এক ঋষির যজ্ঞে শিব শ্বশুরকে অভিবাদন না-করায় দক্ষ অত্যন্ত রুষ্ট হন। শিবকে জব্দ করার জন্য দক্ষ নিজেই এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। ওই যজ্ঞে শিব ছাড়া সব মুনি-ঋষিদের আমন্ত্রণ করা হয়। দক্ষের কন্যা বিনা আমন্ত্রণে সে যজ্ঞে উপস্থিত হন। কন্যাকে দেখে দক্ষ শিবের নিন্দা করতে শুরু করেন। স্বামীর নিন্দা সহ্য করতে না-পেরে পতিব্রতা সতী দেহত্যাগ করেন। পত্নীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে ক্ষুব্ধ শিব সদলবলে যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত হন এবং যজ্ঞক্ষেত্রের সমুদয় জিনিস তছনছ করে দেন। দক্ষ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যে কাণ্ড ঘটান সেটিই 'দক্ষযজ্ঞ'।

দক্ষিণ

'দক্ষিণ' একটি দিকবিশেষ, উত্তর দিকের বিপরীত, ডানদিক প্রভৃতি। সংস্কৃত হতে আগত শব্দটির মূল অর্থ শুধু উত্তরের বিপরীত নয়। এ ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির আরও অনেক অর্থ আছে। তন্মধ্যে চতুর, দক্ষ, নিপুণ, সৎ, প্রীতিপরায়ণ, বশংবদ, অকপট, বাৎসল্য প্রভৃতি অন্যতম। বাংলায় এসে দক্ষিণ শব্দটি দিক ছাড়া আর সব অর্থ হারিয়ে বসেছে। বাঙালিরা নিজেদের হাতকেও জাতপাতের বেড়াজালে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাদের চোখে বাম হাতের চেয়ে ডান হাত দক্ষ, নিপুণ ও অনুপম। ডান হাতের প্রতিভূ হচ্ছে দক্ষিণ হাত; এটি তাদের চতুরতা, দক্ষতা, নিপুণতা, সততা, প্রীতিপরায়ণতা প্রভৃতির নিদর্শন। এ জন্য প্রিয় ও কাছের বশংবদ ব্যক্তিকে বলা হয় 'দক্ষিণহস্ত'। দক্ষিণ হাত তথা ডান হাত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভালো কাজ করা হয়।

দণ্ডায়মান

শব্দটির অর্থ—খাড়া, দাঁড়িয়ে আছে এরূপ। দণ্ড থেকে দণ্ডায়মান শব্দের উৎপত্তি। দণ্ড সোজা ও সটান। দণ্ডায়মান অর্থ দণ্ডের মতো সোজা ও সটান। একটি দণ্ডকে খাড়া করে রাখলে যে অবস্থা হয় সেটিই দণ্ডায়মান অবস্থা। কোনো মানুষ যদি দণ্ডের মতো সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেটিই হচ্ছে দণ্ডায়মান। 'দণ্ড' শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে—'দমন সাধন, দমন কার্য সম্পাদন।' যে বস্তু দিয়ে দমন করা যায় সেটি হচ্ছে দণ্ড। 'দণ্ড' হচ্ছে দীর্ঘ কিন্তু সোজা ও শক্ত অথচ সহজে বহনযোগ্য একটি সরল অস্ত্র, যদ্দবারা আঘাত করা যায় এবং আঘাত করলে সহজে আঘাতপ্রাপ্ত জীব দমিত হয়। এটি সাধারণভাবে সবার কাছে 'লাঠি' নামে পরিচিত। এ লাঠি মানুষের আদি অস্ত্র। লাঠি দিয়ে মানুষ প্রথমে সহজে আঘাত করতে শেখে, দমন করতে শেখে মানুষ হয়ে মানুষকে কিংবা অন্য জীবকে। তাই বস্তুটির নাম হয় 'দণ্ড'। এ জন্য দণ্ড অর্থে সাজা বা শাস্তিও বোঝায়। একসময় এ লাঠি দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সাজা দেওয়া হতো। তাই এর নাম 'দণ্ড' এবং সাজাপ্রাপ্তকে বলা হয় 'দণ্ডিত'। যদিও এখন দণ্ড বা দণ্ডিত বলতে লাঠির কথা মনে পড়ে না, মনে পড়ে সাজা ও সাজাপ্রাপ্তের কথা। এ দণ্ড হতে ক্রমান্বয়ে উৎপত্তি হয় নানা দণ্ডযুক্ত শব্দ। যেমন—অর্থদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড, কারাদণ্ড, নির্বাসনদণ্ড। দণ্ডের দণ্ডদানের ক্ষমতার

জন্য রাজা বা শাসক কিংবা ক্ষমতাবানদের বলা হতো 'দণ্ডধর'। ভারতীয় পুরাণে যমের অপর নাম দণ্ডধর। কারণ তার দায়িত্ব প্রাণহরণ। বলা হয় যার লাঠি তার মাটি, বা যার দণ্ড তার ভাণ্ড। প্রাচীনকালে রাজা-বাদশার লাঠির ক্ষমতার ওপর তার প্রভাব নির্ভর করত।

দধীচি

মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী, অথর্ব মুনির ঔরসে এবং কর্দমকন্যা শান্তির গর্ভে দধীচি জন্মগ্রহণ করেন। দধীচি সবসময় কঠিন ধ্যান ও গভীর তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। বৃত্রাসুরের (অর্থাৎ বৃত্র নামের অসুর) আক্রমণে উৎপীড়িত ও স্বর্গচ্যুত দেবতারা জানতে পারেন, কেবল দধীচির অস্থি-নির্মিত অস্ত্র দিয়েই বৃত্রকে নিপাত করা যাবে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র দধীচির নিকট গিয়ে সবিনয়ে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করেন। পূর্বে একবার তপোভঙ্গ করার কারণে ইন্দ্র দধীচির বিরাগভাজন হয়েছিলেন। সেবার দধীচির তপস্যায় ভীত হয়ে তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র অলম্বুষা নামের এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেছিলেন। অলম্বুষার রূপ দেখে দধীচির বীর্য সরস্বতীর জলে পতিত হয়। সরস্বতী নদী তা উদরস্থ করে সারস্বত নামের এক পুত্রের জন্ম দেন। উদারচেতা দধীচি ইন্দ্রের পূর্বের শত্রুতায় বিস্মৃত হয়ে দেবতাদের উপকারের লক্ষ্যে প্রাণবিসর্জন দেন। ইন্দ্র মৃত দধীচির শরীর থেকে অস্থি নিয়ে বজ্র নির্মাণ করে নিরানব্বইবার বৃত্রদের নিহত করে স্বর্গালোক উদ্ধার করেন।

দমকা

'দমকা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—সহসা প্রবল-বেগে আগত, ঝটিকাবেগ, আকস্মিক সংঘটিত প্রভৃতি। বাতাস বা হাওয়ার গতিবেগ প্রকাশে শব্দটির অধিক ব্যবহার লক্ষণীয়। বস্তুত ফারসি 'দমগাহ' শব্দ থেকে বাংলা 'দমকা' শব্দের উৎপত্তি। ফারসি ভাষায় 'দমগাহ' একটি যন্ত্রের নাম। বাংলায় এ যন্ত্রটি 'হাপর' নামে পরিচিত। কর্মকার ও স্বর্ণকারগণ 'হাপর' ব্যবহার করেন। হাপরের কাজ হাওয়া/বাতাস উদগীরণ করে কয়লার আগুনকে আরও তপ্ত করে তোলা। হাপরে চাপ পড়লে ফস করে হঠাৎ বাতাস বেরিয়ে কয়লার আগুনে অক্সিজেন সরবরাহ করে। ফলে আগুন আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। এটি করার জন্য হাপরের হাতলকে বারবার উঠানামা করাতে হয়। ফারসি 'দমগাহ' নামক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে আসা হাওয়াকে বাঙালিরা 'দমকা' শব্দের মাধ্যমে 'আকস্মিক' অর্থে ব্যবহার করতে শুরু করেন। এভাবে দমগাহ শব্দটি বাংলায় যান্ত্রিক রূপ হারিয়ে সহসা প্রবল-বেগে আগত, ঝটিকাবেগ, আকস্মিক সংঘটিত প্রভৃতি অর্থ ধারণ করে।

দম্পতি

'দম্পতি' শব্দের অর্থ 'স্বামী-স্ত্রী'। কিন্তু প্রারম্ভে শব্দটির অর্থ 'স্বামী-স্ত্রী' ছিল না। অর্থগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শব্দটি অবশেষে স্বামী-স্ত্রীর যুগলরূপে বাঁধা পড়েছে। দম্পতিকে আজ আমরা যুগলমূর্তিরূপে দেখে অভ্যস্ত, কিন্তু একথা কি বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে যে, একসময় দম্পতি ছিল একক ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তিটি ছিল পুরুষ? বৈদিক সংস্কৃত 'দম' শব্দের অর্থ ছিল গৃহ। সংস্কৃত 'দম' আর লাতিন 'domus' একার্থক। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণির লোকদের আবাসস্থলের নাম ছিল 'domus', রোম সাম্রাজ্যের প্রধান নগরগুলোতে 'domus' দেখা যেত। আধুনিক ইংরেজির 'domestic' শব্দটি লাতিন 'domesticus' থেকে আগত। আর 'domus' থেকেই 'domesticus' শব্দের উদ্ভব। প্রাচীন সংস্কৃতে 'দম' শব্দটির অর্থ যেহেতু 'গৃহ' সুতরাং 'দম্পতি'র অর্থ দাঁড়ায় 'গৃহপতি' বা 'গৃহস্বামী।' মোট কথা, বৈদিক যুগে গৃহের অধিপতিই ছিলেন দম্পতি। পরবর্তীকালে 'দম' শব্দটি পত্নী অর্থ ধারণ করে এবং 'দম্পতি' পত্নী ও পতির দ্বৈতরূপে আবির্ভূত হয়। এভাবেই ভাষাগত বিবর্তনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে শব্দটি এক সময়ের দাম্পত্য সম্পর্কের মধুর বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। 'দম্পতি'র প্রতিশব্দ জায়াপতি।

দম্ভোদ্ভব

'দম্ভোদ্ভব' মহাভারতে বর্ণিত একজন রাজা। নিজের শক্তি নিয়ে তাঁর প্রচণ্ড অহঙ্কার ছিল। তিনি মনে করতেন, ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর মতো শক্তিশালী রাজা আর নেই। নিজের শক্তি নিয়ে প্রায়শ তাঁকে দম্ভোক্তি করতে শোন যেত। একদিন রাজ্যের ব্রাহ্মণগণ তাঁকে বললেন যে, গন্ধমাদন পর্বতে সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনে রত নর ও নারায়ণের শক্তির তুলনায় তাঁর শক্তি অতি নগণ্য। দম্ভোদ্ভব এ কথা শুনে অপমানিত বোধ করলেন এবং নিজের শক্তি প্রমাণের জন্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে নর ও নারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওনা দিলেন। প্রথমে নর ও নারায়ণ দম্ভোদ্ভবকে যুদ্ধ হতে নিবৃত রাখার চেষ্টা করেন। নিজের শক্তির প্রতি প্রচণ্ড আস্থাশীল গর্বিত দম্ভোদ্ভব যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দেন। এ অবস্থায় নর ও নারায়ণ একমুঠো ঘাস তীরের মতো দম্ভোদ্ভবের দলের দিকে নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত ঘাসে পুরো আকাশ সাদা হয়ে যায়। দম্ভোদ্ভব-পক্ষের সকল সেনা ও অন্যদের চোখ, কান ও নাকে ঘাস প্রবেশ করতে শুরু করল। এ অবস্থায় দম্ভোদ্ভব নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করে কোনোরকমে রক্ষা পেয়ে নিজ দেশে ফিরে আসেন। দাম্ভিকদের পরিণতি ও পতন সম্পর্কে জ্ঞাত করার জন্য মহাভারতে এ গল্পটি করা হয়।

দর্পণ

'দর্পণ' শব্দের প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—মুকুর, আরশি, আয়না প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত শব্দ। এর মূল অর্থ হচ্ছে যা হৃষ্ট বা আনন্দ দান করে। সংস্কৃতে যা হৃষ্ট বা আনন্দিত বা পুলকিত করে তা-ই হচ্ছে দর্পণ। একসময় দর্পণ বা আয়না ছিল না। নিজের মুখ দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। নিজের মুখ দেখতে হলে স্বচ্ছ ও ঢেউহীন স্তব্ধ জলের প্রয়োজন হতো। এমন জলও সহজে পাওয়া যেত না। কেউ নিজের মুখ দেখলে অজানাকে জানার আনন্দে বিমোহিত হয়ে পড়ত। বাংলায় দর্পণ নামে পরিচিত বস্তুটা এ কাজটি করায় তাই এর নাম হয় দর্পণ।

দর্শন

হিন্দু দর্শনশাস্ত্র ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা কপিলকৃত সাংখ্য, পাতঞ্জলিকৃত যোগ, কণাদকৃত বৈশেষিক, গৌতমকৃত ন্যায়, জৈমিনীকৃত পূর্ব-মীমাংসা বা মীমাংসা ও বেদব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত।

দশহরা

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে মঙ্গলবারে হস্তানক্ষেত্র গঙ্গা স্বর্গ হতে মর্ত্যে নেমে আসেন। এ জন্য দিনটি অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যময়। এ তিথি নানা রকম পাপ ক্ষয় করে এবং এ তিথিতে স্নান ও দান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এ তিথিতে গঙ্গা দশবিধ পাপ ও দশ-জন্মার্জিত পাপ হরণ করেন বলে এর নাম 'দশহরা'।

দশা

সহজ অর্থে 'দশা' হচ্ছে—রাশির ওপর গ্রহের প্রভাব। কোনো গ্রহ রাশিতে প্রবেশ করলে তার প্রভাবের মেয়াদকে দশাকাল বলে। প্রতিটি গ্রহের জন্য একটি দশাকাল নির্দিষ্ট আছে। সেগুলো হলো—কেতু ৭ বছর, শুক্র ২০ বছর, রবি ৬ বছর, চন্দ্র ১০ বছর, মঙ্গল ৭ বছর, রাহু ১৮ বছর, বৃহস্পতি ১৬ বছর, শনি ১৯ বছর ও বুধ ১৭ বছর। 'শনির দশা' মানে ১৯ বছর কঠিন দুর্গতি।

দশাশ্বমেধ

কাশীতে গঙ্গা নদীর একটি ঘাটের নাম। এটি একটি তীর্থস্থান। ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্যে দশটি অশ্বমেধযজ্ঞ করেছিলেন। কাশীর যে স্থানে এ বিশাল যজ্ঞ হয়েছিল—তার নাম দশাশ্বমেধ।

দাঁও

‘দাঁও’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ—সুযোগ, সুবিধা, সহজে প্রচুর লাভ, সুযোগ বুঝে লাভজনক কিছু অর্জন করা প্রভৃতি। ‘দাও’ ফারসি শব্দ। ফারসি ভাষা থেকে এটি বাংলায় এসেছে। ফারসি ভাষায় শব্দটির উচ্চারণ হচ্ছে ‘দাও’। ফারসি ভাষায় ‘দাও’ শব্দের অর্থ হলো শতরঞ্জ বা পাশা খেলায় ঘুঁটি ফেলে সুবিধাজনক অবস্থান পাওয়া।

দাদখানি

‘দাদখানি’ অতি উৎকৃষ্ট মানের একপ্রকার চাল। কথিত হয়, বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ খানের (১৫৭৩-১৫৭৬) আমলে বঙ্গদেশে এ চালের চাষাবাদ শুরু হয়। সুলতানের দরবারে এ চালের বেশ চাহিদা ছিল। দাউদ খান নিজেও এ চাল পছন্দ করতেন। তাই এর নাম হয়ে যায় দাউদখানি চাল > দাদখানি চাল। দাউদখান কীভাবে দাদখানি হয়ে গেলেন এটাই বিস্ময়। অবশ্য বাংলায় এমন আরও অনেক শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন—আকবর থেকে আকবরি। শিশুকালে-পড়া কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ; ১২ কার্তিক ১২৭৩ বঙ্গাব্দ — ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ; ১২ আষাঢ় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)-এর লিখিত ‘কাজের ছেলে’ কবিতায় বর্ণিত ‘দাদখানি চাল’ এখনও স্মৃতিকে উদ্বেল করে তোলে।

দাম/দরদাম

মহাবীর আলেকজান্ডারের আমলে গ্রিকদের একপ্রকার রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল ‘দ্রাখমে’। তিনি ভারতে আসার পর উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিশাল একটা এলাকা গ্রিক বা যবনদের দখলে ছিল। তখন দ্রাখমে দিয়ে দ্রব্যাদির মূল্য পরিশোধ করা হতো। এ ‘দ্রাখমে’ শব্দটির বানান ও উচ্চারণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃতে ‘দ্রক্ষ’-রূপ ধারণ করে। এ ‘দ্রক্ষ’ শব্দ থেকে আসে দম্ম। দম্মের প্রাকৃত রূপের মধ্য দিয়ে আসে ‘দাম’। যার অর্থ মূল্য। আবার ‘দর’ শব্দের অর্থও মূল্য। ‘দাম’ শব্দের পূর্বে ‘দর’ যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে ‘দরদাম’। গ্রিক শব্দ হতে আগম ‘দাম’ এখন সংস্কৃত ‘মূল্য’ শব্দের চেয়ে অধিক জনপ্রিয়।

দায়ভাগ

হিন্দু উত্তরাধিকার-আইন। জীমুতবাহন এ আইন বাংলাদেশে প্রচলন করেন।

দাম্ভিক

‘দাম্ভিক’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—অহঙ্কারী। সংস্কৃত হতে আগত শব্দটির মূল অর্থ ছিল—কপটভাবে ধর্মপালনকারী ব্যক্তি। যে সকল ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কপটভাবে ধর্মকর্ম করে তাদের প্রকাশের জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হতো। তবে বাংলায় অতিথি হয়ে শব্দটি এর মূল অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। এখন দাম্ভিক বলতে কোনো বকধার্মিক বা বিড়াল তপস্বীকে বোঝায় না, দাম্ভিক বলতে অহঙ্কারী, দর্পী, অশালীন আচরণকারী প্রভৃতি লোকদের বোঝায়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যারা পালন করত তারা ছিল স্বার্থপর, তাদের সিংহভাগ মৃত্যুর পরও নিজেদের আনন্দময় মনোবৃত্তি পূরণ এবং নরকের ভয়ে ও স্বর্গের লোভে ধর্ম পালন করত। ধর্মকর্ম পালন করত বলে তারা নিজেদের পরবর্তী জীবনে স্বর্গের একমাত্র অধিকারী ও ঈশ্বরের অতি প্রিয় দাবিতে দাম্ভিকতা প্রকাশ করত।

দিকবিদিক

‘দিকবিদিক’ শব্দের অর্থ—দিক ও কোণ, চারদিক, সবদিক, হিতাহিত, ন্যায়-অন্যায়, বাহ্যজ্ঞান প্রভৃতি। ‘দিক’ ও

‘বিদিক’ নিয়ে দিকবিদিক শব্দের উৎপত্তি। ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত পার্শ্বনির্ধারক দশটি দিক রয়েছে। এর মধ্যে চারটি হলো ‘দিক’ এবং বাকি ছয়টি হলো ‘বিদিক’। দিকগুলো হচ্ছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এবং বিদিকগুলোর নাম ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈর্ঋত, ঊর্ধ্ব ও অধঃ। যিনি এ সকল দিক ও বিদিক সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন তিনি চারপাশের বিষয়বস্তু ও প্রকৃতি নিয়ে সচেতন—এমনটি নিঃসন্দেহে বলা যায়। দিকবিদিক-জ্ঞান আধুনিক যুগেও লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর অন্যতম উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে যারা দিকবিদিক জ্ঞান রাখে না, তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। অতএব সফলতার জন্য দিকবিদিক-জ্ঞান আবশ্যক।

দিগগজ

‘দিগগজ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—মহামূর্খ, হস্তিমূর্খ (ব্যঙ্গার্থে)। অষ্টদিক ও অষ্টকোণ রক্ষাকারী হস্তিগণকে দিগগজ বলা হতো। অষ্টদিক ও অষ্টকোণ হচ্ছে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, নৈর্ঋত, ঈশান, অগ্নি ও বায়ু। অষ্টদিক ও অষ্টকোণ রক্ষাকারী হস্তিগণ হচ্ছেন ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পাদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতী। এ হস্তিগণ দিক রক্ষা করেন, দিকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং দিকসমূহের যাবতীয় বিষয় দেবতাগণকে জানিয়ে দেন। দিগগজগণ সকল দিক ও সকল কোণসমূহের সকল সংবাদ রাখতেন, জানতেন ও বুঝতেন। এ জন্য তাঁদের মহাপণ্ডিত হিসেব গণ্য করা হতো। দিগগজগণের এ সর্বজ্ঞ বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলা ভাষায় ‘দিগগজ’ শব্দটি মহাপণ্ডিত অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তবে সংস্কৃত ভাষার দিগগজ বাংলায় প্রবেশ করে তার অর্থ ধরে রাখতে পারলেও মান ধরে রাখতে পারেনি। বাংলা ভাষায় দিগগজ বলতে মহাপণ্ডিত বোঝালেও তা ব্যঙ্গার্থে প্রকৃতপক্ষে মহামূর্খকেই ইঙ্গিত করে।

দুরন্ত

শব্দটির প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ—অশান্ত, দামাল, ভীষণ ও প্রখর প্রভৃতি। দুঃ ও অন্ত শব্দের সমন্বয়ে দুরন্ত শব্দটি গঠিত। ‘দুঃ’ শব্দের অর্থ—খারাপ, ক্লেশ, কষ্টকর, অসহনীয় প্রভৃতি আর ‘অন্ত’ শব্দের অর্থ শেষ। সুতরাং ‘দুরন্ত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে—যার শেষটা কষ্টকর বা যার শেষ জীবন কষ্টদায়ক। কিন্তু শব্দটি বাংলায় এসে তার মূল ও আদি অর্থ হারিয়ে চমৎকার একটা শোভনীয় অর্থ ধারণ করে বসে আছে। এর কারণ আছে। একসময় বাংলায় যারা অশান্ত, দামাল, ভীষণ কিংবা প্রখর প্রকৃতির বা প্রচণ্ড একরোখা প্রকৃতির হতো তাদের শেষ জীবন কষ্টে যেত। কথায় বলে বাঘের বল বারো বছর। এ রকম চরিত্রের মানুষরা যৌবনকালে অনেককে কষ্ট দিত বা তাদের আচরণকে অনেকে অশোভনীয় মনে করত। ফলে শেষ বয়সে তারা কারও স্নেহ-সহানুভূতি পেত না। তাই ‘দুরন্ত’ শব্দটি বাংলায় এসে তার অর্থ হারিয়ে অশান্ত, দামাল, ভীষণ ও প্রখর প্রভৃতি অর্থ ধারণ করে। অবশ্য এখন দুরন্তদের শেষকাল কষ্টে যায় না। যাদের দুরন্ততা সমাজ ও মানুষের কল্যাণ করে তারা শেষ বয়সেও মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালবাসায় মনোরম জীবনযাপন করে।

দুষ্মন্ত

পুরুবংশীয় এক বিখ্যাত রাজা। একদিন বনে হরিণ-শিকারকালে মালিনী নদীর তীরে অবস্থিত কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। কণ্বমুনি অনুপস্থিত থাকায় মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলা রাজাকে যথাসম্মানে অভ্যর্থনা জানান। দুষ্মন্ত শকুন্তলার পরিচয় জানতে চাইলে শকুন্তলা তাঁর পরিচয় ব্যক্ত করেন। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র নিজে মেনকা নামের এক অপ্সরাকে দায়িত্ব দেন। বিশ্বামিত্র অপ্সরার রূপে মুগ্ধ হয়ে তপস্যা ভঙ্গ করে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে, মেনকার গর্ভে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। কন্যাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে দিয়ে মেনকা স্বর্গে গমন করেন। স্নান করতে গিয়ে কণ্বমুনি কন্যাকে শকুন্ত (পাখি) দ্বারা রক্ষিত হতে দেখে নিজের আশ্রমে এনে কন্যার মতো লালন-পালন করতে থাকেন। শকুন্ত-রক্ষিত কন্যা বলে তার নাম হয় শকুন্তলা। রাজা দুষ্মন্ত

শকুন্তলার পালিত পিতা কণ্বমুনির অপেক্ষা না-করেই গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিয়ে করতে চান। শকুন্তলা বিবাহে সম্মতি প্রকাশের আগে এ প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন যে, শকুন্তলার ঔরসজাত সন্তানই হবে রাজ্যের পরবর্তী রাজা। শকুন্তলার গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ছয় বছর বয়স হতেই সে বালক সকল প্রকাল জন্তু-জানোয়ার দমন করতে পারতেন। এ জন্য তার নাম হয় 'সর্বদমন'। সর্বদমন যুবক হওয়ার পর রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পুত্রসহ চতুরঙ্গ সৈন্যের দ্বারা রাজ্যে নিয়ে আসেন। রাজসভায় শকুন্তলা রাজাকে পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর সন্তানকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করার প্রার্থনা করেন। দুষ্মন্ত পূর্বপ্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও বিস্মৃতির অজুহাত তুলে শকুন্তলাকে যেথা-খুশি-সেথা চলে যেতে বলেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে তিরস্কার করে সভাস্থল ত্যাগ করতে চাইলে দৈববাণী হয় যে, দুষ্মন্তই শকুন্তলার পুত্রের পিতা এবং তিনি যেন দুষ্মন্তকে লালন-পালন করেন ও 'ভরত' নাম রাখেন। তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তার পুত্রকে গ্রহণ করেন। আসলে দুষ্মন্ত দৈববাণীর মাধ্যমে রাজসভায় শকুন্তলা ও তার পুত্রের আসল পরিচয় বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপনের কৌশল হিসেবে বিস্মৃতির ভাব ধরেছিলেন। যথাকালে ভরত রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। আর এই ভরতের নামানুসারে এদেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। দুষ্মন্তের অপর স্ত্রী লক্ষণার গর্ভজাত পুত্রের নাম জনমেজয়।

দেখভাল

হিন্দি 'দেখনা-ভালনা' শব্দ হতে বাংলা 'দেখভাল' শব্দের উৎপত্তি। এটি বাংলায় আগত নতুন শব্দ। 'দেখনা' মানে দেখা এবং 'ভালনা' মানে ভালোভাবে দেখা। দুটো প্রায় সমার্থক সহচর শব্দ। এ শব্দ-দুটোর মিলনে গঠিত হয়েছে 'দেখভাল'।

দেবর্ষি

স্বর্গীয় ঋষি। এদের স্থান স্বর্গে। এ সব ঋষি পৃথিবীতে উন্নত জীবন-যাপন করার মাধ্যমে দেবতার শ্রেণিভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। এমন ঋষির মধ্যে নারদ অন্যতম।

দৈত্য

কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষরাজের কন্যা দিতির গর্ভজাত বংশধরগণ দৈত্য নামে পরিচিত। দেবতাদের সঙ্গে ছিল এদের চিরন্তন বিরোধ ও যুদ্ধ। দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যের অসংখ্য যুদ্ধ ও জয়পরাজয়ের কাহিনি মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত আছে। 'দানব' হচ্ছে প্রায় দৈত্য শ্রেণিভুক্ত।

দোর্দণ্ড

সংস্কৃত 'দোর্দণ্ড' শব্দের বাংলা অর্থ—প্রবল প্রতাপ। সংস্কৃত 'দোঃ' ও 'দণ্ড' মিলে 'দোর্দণ্ড' শব্দের উৎপত্তি। 'দোঃ' শব্দের অর্থ বাহু ও 'দণ্ড' শব্দের অর্থ লাঠি। সুতরাং দোর্দণ্ড শব্দের অর্থ—দণ্ডরূপ বাহু বা দৃঢ়বাহু। ব্যবহারগতভাবে শব্দটির আদি অর্থ ছিল বলশালী ব্যক্তি। পরে শব্দটির অর্থের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। এখন শব্দটি আর বাহুবল হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। বস্তুত আধুনিক যুগে লাঠির শক্তি শেষ। এখন কারও প্রভাব, শাসন, প্রতাপ বা পরাক্রমশীলতা প্রভৃতি যখন প্রতাপান্বিত হয়, তখন তাকে দোর্দণ্ড বলা হয়।

দ্বারকা

গুজরাটের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান। কৃষ্ণের নির্দেশে বিশ্বকর্মা এই শহর নির্মাণ করেন। কংসবধের পর কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ ও অসুর কালযবনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে নিয়ে দ্বারকায় আসেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর যাদব-নারীদের নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুর যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে প্লাবিত হয়ে যায়। দ্বারকা হিন্দুদের পরম তীর্থস্থান।

দ্বিগু

‘দ্বি গো যার বা যাকে গোদ্বয়ের বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছে অথবা যার দুটো গরু আছে’—তাকে দ্বিগু বলা হয়। শব্দটির ব্যবহার ব্যাকরণ পাঠের সময় ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে দুটো গো (যা যায়) জোড়া হয় যে সমাসে, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন—‘ত্রি’ আর ‘ভুবন’ এ দুটো হলো গো। দ্বিগু সমাস এ দুটো গো-কে অক্ষত রেখে ‘ত্রিভুবন’ শব্দ গঠিত হয়েছে।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ধ

ধনঞ্জয়

অর্জুনের অন্য নাম ধনঞ্জয়। সমস্ত জনপদ জয়পূর্বক প্রচুর ধন-সম্পদ সংগ্রহ করে তার মধ্যে বসবাস করতেন বলে অর্জুন 'ধনঞ্জয়' নামে পরিচিত।

ধন্য

'ধন্য' শব্দের আভিধানিক অর্থ—কৃতার্থ, সাধু, প্রশংসনীয়, সৌভাগ্যবান প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষা থেকে 'ধন্য' শব্দটি বাংলায় এসেছে। ধন্য শব্দের আদি অর্থ—ধনশালী। যার প্রচুর ধন রয়েছে তিনি ধন্য। কিন্তু বাংলা ভাষায় ধন্য শব্দের অর্থ ধনবান না-বোঝালেও অন্তর্নিহিত অর্থ অনেকটা অভিন্ন। কারণ বাংলা ভাষায় তিনিই ধন্য যিনি সৌভাগ্যবান, ধনের অধিকারী না-হলেও নানা কৃতিত্বের অধিকারী। আবার যিনি ধনের অধিকারী তিনিও ধন্য। কারও প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সময় বলা হয় 'ধন্যবাদ', অর্থাৎ যিনি কৃতার্থ করেছেন তাঁকে প্রশংসামূলক ধন্য বা ভাগ্যবান আখ্যায়িত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আবার 'ধন্য' শব্দের সঙ্গে মিল রয়েছে 'ধান'-এর। এজন্য কবি গেয়েছেন ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা...। দেখা যায়, সংস্কৃত হতে বাংলায় এসে শব্দটির অর্থের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে কিন্তু মূল অর্থ অন্তর্নিহিত অনুভব বিবেচনায় রয়ে গেছে অভিন্ন।

ধন্বন্তরি

'ধন্বন্তরি' শব্দের অর্থ—অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন ঔষধ বা চিকিৎসক। ভারতীয় পুরাণের একটি ঘটনার সঙ্গে 'ধন্বন্তরি' শব্দটির অর্থ ও ব্যুৎপত্তি যুক্ত। সত্যযুগে দেবতা ও অসুরগণ সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা অমৃত পান করে অমর ও নিরাময় হবেন। অমৃত লাভের জন্য তাঁরা মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও নাগরাজ বাসুকীকে মন্থনরজ্জু হিসাবে নির্ধারণ করে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করতে শুরু করেন। মন্থনকালে লক্ষ্মী, অপ্সরাসহ আরও অনেক কিছুর সঙ্গে অমৃত ভান্ড হস্তে ধন্বন্তরি সমুদ্রগর্ভ হতে আবির্ভূত হন। পরে দেবতারা তাঁকে দেব-চিকিৎসক মনোনীত করেন। দেবতাগণের চিকিৎসক 'ধন্বন্তরি'র নামানুসারে বাংলা 'ধন্বন্তরি' শব্দের উৎপত্তি।

ধর্ম

যমের অন্য নাম ধর্ম। তিনি মৃতদের ধর্মাধর্মের বিচার করেন বলে তাকে ধর্মরাজ বলা হয়। ধর্মরাজের বাহন হচ্ছে মহিষ ও আয়ুধ দণ্ড।

ধর্মঘট

সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু করা বা করা হতে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখা অর্থে 'ধর্মঘট' শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে ধর্মঘট শব্দের ব্যুৎপত্তির সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত অর্থের মিল নেই। 'ধর্মঘট' অর্থ—লৌকিক দেবতা ধর্ম ঠাকুরের উদ্দেশে নিবেদিত ঘট। ধর্ম ঠাকুরকে সাক্ষ্য রেখে প্রতিবছর বৈশাখ মাসে গঙ্গাজলে পূর্ণ করে এ ঘট স্থাপন করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রতিজ্ঞা করা হতো। ধর্ম ঠাকুরের উপাসকদের বিশ্বাস ছিল, কোনো অধার্মিকের পক্ষে ধর্মঘট উত্তোলন বা ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। ধর্মঘট স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধিলাভের জন্যই ধর্মঘট শব্দটি ক্রমান্বয়ে ধর্ম ছেড়ে দাবি আদায়ের আন্দোলনে চলে আসে। মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় ধার্মিক শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'ধর্মঘটি' শব্দ প্রচলিত ছিল।

এখন ধর্মঘট বলতে ধার্মিক বোঝায় না, যারা ধর্মঘট করেন তাদের বোঝায়। যারা ধর্মঘট করেন তাঁরা নিজেদের দাবি ন্যায্য-গণ্যে উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার প্রতিজ্ঞা করেন। অন্যদিকে প্রতিপক্ষরা ধর্মঘটীদের অন্যায্য ও সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে প্রতিহত করার প্রয়াস নেন।

ধর্মপুত্র

যুধিষ্ঠিরের অপর নাম ধর্মপুত্র। দুর্বাসার মন্ত্র-প্রভাবে কুমন্তী ধর্মকে (যম) আকর্ষণ করেন। যমের ঔরসে ও কুমন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়।

ধর্মশাস্ত্র

এটি হিন্দুদের ধর্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ। এটাকে আইনগ্রন্থও বলা হয়। পূর্বে প্রধানত মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্রভৃতিকে ধর্মশাস্ত্র বলা হতো। পরে ভগবান হতে ঋষিদের প্রাপ্ত যে সকল বিধান স্মৃতি হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তা ধর্মশাস্ত্র নামে পরিচিতি পায়। এ ধর্মশাস্ত্র তিনটি গুণবিশিষ্ট ছিল। যথা আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত।

ধস্তাধস্তি

'ধস্তাধস্তি' শব্দের অর্থ—পরস্পর বলপ্রয়োগ, টানা-হ্যাঁচড়া প্রভৃতি। শব্দটি এখন বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি এসেছে ফারসি ভাষা হতে। মূলত ফারসি 'দস্ত ওয়া দস্ত' বাগভঙ্গির সঙ্গে ই-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ধস্তাধস্তি' শব্দের উৎপত্তি। ফারসি ভাষায় 'দস্ত ওয়া দস্ত' বাগভঙ্গির অর্থ হচ্ছে—'হাতে-হাতে' অথবা 'হাতে হাত রাখা' বা 'হাতের উপর হাতের চাপ প্রদান' ইত্যাদি। উল্লেখ্য ফারসি 'দস্ত' শব্দের অর্থ হাত। এর দ্বারা ফারসি ভাষায় সহযোগিতা, দ্রুততা, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সৌহার্দ্য, সৌজন্য প্রভৃতি প্রকাশ করা হতো। তবে বাংলায় ফারসি এ বাগভঙ্গিটি তার উচ্চারণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও অন্তর্নিহিত ভাবেরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। হাতে হাত রাখলে বাংলাদেশে আন্তরিকতা বোঝায় কিন্তু ফারসি ভাষায় হাতে হাত রাখলে আন্তরিকতা না-বুঝিয়ে বরং বলপ্রয়োগ বোঝায়। ফারসি 'দস্ত ওয়া দস্ত' বা হাতে হাত বাংলায় সহযোগিতা বোঝায় না, বরং হাতকে প্রচণ্ড চাপ দেওয়া কিংবা ধাক্কা দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফারসি সৌজন্যময় করস্পর্শ বাংলায় এসে 'ধস্তাধস্তি' বা প্রবল হস্তচাপ ও ধাক্কাধাক্কিতে রূপ নিয়েছে।

ধান

'ধান' এক প্রকার খাদ্যশস্য। বাংলাভাষী সবার কাছে এটি অতি পরিচিত ও প্রিয় একটি শস্য। পৃথিবীর সব দেশে সব মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় 'ধান' নামক এ শস্যটি সৃষ্টির সূচনা হতে মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অনুপমতায় জড়িয়ে। তবে ধান শব্দটি বাংলা নয়। সংস্কৃত 'ধান্য' শব্দ হতে বাংলা 'ধান' শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃতে 'ধান্য' শব্দের অর্থ—যাহা পোষণ করে। সে অর্থে যে সকল শস্য দেহ পোষণ করে সেগুলো—ধান্য। সংস্কৃত 'ধান্য' শব্দের এ অর্থ বিবেচনায় গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতিও ধান্য। কিন্তু বাংলায় 'ধান' বলতে কেবল যার থেকে চাল বের করা হয় সেটাকে বোঝায়। সংস্কৃত ভাষায় ধান্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা শালি, ব্রীহি, শূক, শিম্বি ও ক্ষুদ্র। শালি হলো সে-ই শস্যদানা বাংলা ভাষায় যাকে ধান বলা হয়। এ শস্যদানা সতুষ অবস্থায় ধান, নিষ্তুষ করলে চাল এবং সিদ্ধ করলে ভাত হয়। ব্রীহিধান্য হলো তিল; শূকধান্য হলো যব ও গম; শিম্বিধান্য হলো কলাই এবং ক্ষুদ্র ধান্য হলো কাউন। সংস্কৃত ভাষায় ধান্য বলতে যা-ই বোঝানো হোক না কেন, বাংলা ভাষায় ধান বলতে কেবল শালিধান্যকে বোঝায়—যার থেকে চাল বের করে সিদ্ধ করলে ভাত হয়। এটিই আমরা তরি-তরকারি দিয়ে মনের সুখে খাই।

ধুন্ধুমার কাণ্ড

‘ধুন্ধুমার’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—গণ্ডগোল, ভীষণ গণ্ডগোল, মহা তোড়জোড়, তুমুল কাণ্ড, মহা কোলাহল, মহা বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি। মহাভারতে বর্ণিত বনপর্বের একটি মহা প্রকাণ্ড কাণ্ড থেকে ‘ধুন্ধুমার কাণ্ড’ বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। ধুন্ধু নামের এক ভয়ঙ্কর দানব প্রবল ও একনিষ্ঠ তপস্যার বলে ব্রহ্মের নিকট থেকে বিশাল এক বর পেয়ে বসেন। এ বরের কারণে তিনি দেব-দানব ও রাক্ষস সবার অবাধ্য হয়ে ওঠেন। সমুদ্রের তলদেশে বালুকাময় একটি স্থানে ধুন্ধু বাস করতেন। ধুন্ধুর বাসস্থানের নিকট অন্য একটি স্থানে মহর্ষি উতঙ্কের আশ্রম ছিল। ধুন্ধু প্রায় সময় উতঙ্কের আশ্রমে নানাবিধ উপদ্রব করে আশ্রমের শান্তি ও মর্যাদার বিঘ্ন ঘটাত। বিরক্ত উতঙ্ক ধুন্ধুর অত্যাচার হতে রেহাই পাওয়ার জন্য অযোধ্যার রাজা কুবালেশ্বরের শরণাপন্ন হন। কুবালেশ্বর তাঁর একুশ হাজার পুত্র ও অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ধুন্ধুকে বধ করার জন্য অভিযান শুরু করেন। এক সপ্তাহ ধরে বালুকাপূর্ণ সমুদ্র খনন করার পর ধুন্ধুকে পাওয়া যায়। ধুন্ধু তখন গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে ক্রুদ্ধ ধুন্ধু তার মুখনিঃসৃত অগ্নির প্রবল তাপে কুবালেশ্বরের সকল পুত্র ও সৈন্য-সামন্তকে ভস্ম করে দেন। কুবালেশ্বর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে ধুন্ধুকে বধ করেন। ধুন্ধুকে মারার জন্য কুবালেশ্বর ‘ধুন্ধুমার’ নামে পরিচিতি পান। ধুন্ধুকে বধ করার জন্য যে মহা আয়োজন ও কর্মযজ্ঞ হয়েছিল তা-ই মূলত এ ‘ধুন্ধুমার কাণ্ড’ বাগভঙ্গিটিতে উঠে এসেছে।

ধুরন্ধর

মানুষের মতো শব্দও মাঝেমধ্যে দুর্গতির মধ্যে পড়ে, তা রোধ করা যায় না। টাউট, শয়তান, ধড়িবাজ লোককে আমরা এখন বলি—ধুরন্ধর। অথচ ষাট-সত্তর বছর আগেও ‘ধুরন্ধর’ শব্দটার এমন দুর্গতি ছিল না। তখন নেতা থেকে শুরু করে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে অনায়াসে ধুরন্ধর বলা যেত। আগে যেকোনো দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ—সবাই ধুরন্ধর বিবেচিত হতো। অনেক গুণ না থাকলে ধুরন্ধর হওয়া যায় না। তাই বহু গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকেও ধুরন্ধর বলা যেত। উপাচার্য, অধ্যক্ষ, মহাপরিচালক, অধ্যাপক, নায়ক, লেখক সবাইকে তখন অনায়াসে ধুরন্ধর বলা সম্ভব ছিল।

‘ধুরন্ধর’ শব্দের সেদিনের সেই গৌরবের কথা মনে রেখে আজ যদি কেউ সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় অতি ধুরন্ধর নেতা আপনাদের সামনে এখন ভাষণ দেবেন, তাহলে তার পরিণতি কী হবে, তা ভেবে বলা যায়, না ভেবেও বলা যায়। একালের ধুরন্ধরেরা হয়তো তখন ঘোষককে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেবেন।

‘ধুরন্ধর’ শব্দের মূল অর্থ হলো—ভারবাহী বা ভারবাহক। প্রাচীনকালে ঘোড়া, গাধা, হাতি প্রভৃতিই ছিল ধুরন্ধর বা ভারবাহক। কারণ, তারা তখন মানুষের ভারী বোঝা বহন করত। কিন্তু মানুষ গাধা-ঘোড়াকে ধুরন্ধর শব্দের ভার দীর্ঘদিন বইতে না দিয়ে নিজেরাই একদিন ধুরন্ধরকে পিঠে তুলে নেয়। শুরু হয় ধুরন্ধর শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ। যিনি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কোনো দায়িত্ব অনায়াসে বহন করতে পারেন, তিনি হন ধুরন্ধর। পরিতাপের কথা, একালে এসে ধুরন্ধর শব্দটা অর্থগত ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। চতুর, ধড়িবাজ ও ঘড়েলরা হয়ে পড়েছে ‘ধুরন্ধর’।

সপ্তদশ অধ্যায়

ন

নখদর্পণ

'নখদর্পণ' শব্দটি কোনো বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান বা সবিস্তার উপলব্ধি বোঝাতে প্রয়োগ করা হয়। নখ ও দর্পণ শব্দ মিলে নখদর্পণ বাগভঙ্গির উৎপত্তি। এর অন্যান্য অর্থ হলো অলৌকিক শক্তিবলে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নিজের নখে প্রতিবিম্বিত করে দেখানো; ২. (আল.) নিখুঁত ও সুস্পষ্ট জ্ঞান। নখদর্পণ = নখ দর্পণ যার। নখ-এর আর একটি অর্থ—ইন্দ্রিয় নেই যার। তবে নখদর্পণ শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে—নখই দর্পণ যাতে, দর্পণতুল্য প্রতিবিম্বিত অভীষ্ট বিষয়ের দর্শন করে যা, কোনো বিষয়ের ঘটনাবলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে যাতে—তাকেও নখদর্পণ বলা যায়। নখদর্পণ যখন বাগধারা তখন এর অর্থ—সবিশেষ অবগত বিষয়। হাত মানবশরীরের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। হাতের ব্যবহার মানে আঙুলের ব্যবহার। আর আঙুলের ব্যবহার করতে গেলে নখ সবার আগে যায়। নখের প্রাণ নেই বলে এর ব্যবহারে শরীরের অন্য অংশের চেয়ে ভয় কম। ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও কম। অচেনা-অজানা বস্তুকে মানুষ সবার আগে নখ দিয়ে ছুঁয়ে, আঁচড়ে দেখে।

তার মানে হাতওয়ালা প্রাণী দৈহিকভাবে কারও সঙ্গে কোনো আচরণ করতে গেলে সবার আগে নখ ব্যবহার করে। নখ দিয়ে দেখলে কোনো অচেনা-অজানা বিষয়ের সব বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায় যা সাধারণত চোখ দিয়ে দেখে বলা বা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। একটা জিনিস নরম নাকি শক্ত তা তো আর চোখ দিয়ে বোঝা যায় না। তা জানার জন্য নখ দিয়ে দেখতে হয়। তার মানে নখেরও চোখ আছে। দর্পণে যেমন কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় নখ দিয়েও। অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্বের বাইরের বস্তুসমূহের বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান সবার আগে লাভ করে নখ। 'নখ' আর 'দর্পণ' শব্দদ্বয়ের সম্মিলনে নখদর্পণ। দর্পণ মানে দেখা। একজন মানুষের নখ তার কাছে সবচেয়ে ভালোভাবে এবং সহজে দেখার বিষয়। শরীরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানা থাকে নখ সম্পর্কে। তাই নখদর্পণ মানে ভালোভাবে দেখা হয়েছে বা জানা আছে এমন কোনো বিষয়। তবে এটি 'নখদর্পণ' শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমন বিষয় যা কারও সম্পূর্ণ জ্ঞান বা আয়ত্তে আছে। যেমন—বাংলা বানান-রীতি তার নখদর্পণে।

নখদর্পণ সম্পর্কে বাংলা একাডেমি 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' (২০১৪) লিখেছে 'বি. ১. নখরূপ দর্পণ বা নখই দর্পণ; যাতে মুখ দেখা যায়। ২. বিদ্যাবিশেষ—এ বিদ্যা বলে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি নখরূপ দর্পণে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় দেখতে পায়। ৩. (আল.) পূর্ণরূপে জ্ঞাত (তাস খেলায় এরা সব ঘুণ) কোন হাতে কী তাস আছে সব এদের নখদর্পণে।

নখরূপ দর্পণে পৌরাণিক মুনি-ঋষিগণ বিশ্বদর্শন করতেন। কথিত হয়, প্রাচীনকালে একপ্রকার গুণিন ছিলেন। তাঁদের কাছে কেউ কোনো কিছু জানার জন্য গেলে গুণিন তাঁর বুড়ো আঙুলের নখে তেল মাখিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে আগত ব্যক্তিকে নখের দিকে তাকিয়ে অভীষ্ট বিষয় দেখাতেন। তখন নখটি আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে আগত ব্যক্তির ভূত-ভবিষ্যতের প্রতিফলন ঘটাত। এ সকল অনুষঙ্গে 'নখদর্পণ' বাগভঙ্গিটি এমন অর্থ ধারণ করে।

নগর

নগর শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—বড় শহর। 'নগ' শব্দের অর্থ পাহাড় বা পর্বত। বস্তুত 'নগ' শব্দ থেকে নগর শব্দের উৎপত্তি। বড় শহরে সাধারণত পর্বত-উঁচু দালান দেখা যায়। নগর শব্দের মূল অর্থ—যেখানে বাড়িঘর 'নগ' অর্থাৎ পর্বতের সমান উঁচু। অতএব ব্যাকরণগতভাবে এ 'নগ' শব্দের সঙ্গে 'নগর' শব্দের সম্পর্ক

অবিচ্ছেদ্য। সংগতকারণে শব্দের অর্থটাও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নটরাজ/তাণ্ডবনৃত্য

নৃত্যকলার উদ্ভাবক হিসেবে মহাদেবের আর এক নাম 'নটরাজ'। কথিত হয়, তিনি নৃত্যের মাধ্যমে বিশ্বকে ধ্বংস করবেন। বিশ্বধ্বংসকালীন এ নৃত্যকে 'তাণ্ডবনৃত্য' বলা হয়। গজাসুর ও কালাসুর নিধন করেও মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যে রত হয়েছিলেন। অন্য মতে, উত্তেজক দ্রব্য পান করার পর তিনি স্ত্রীর সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্যে রত হন।

নন্দ

শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা নন্দগোপাল। মথুরার অপরদিকে অবস্থিত গোকুল গ্রামে গোপজাতীয় নন্দের বাস ছিল। সে সময় কংস মথুরার রাজা ছিলেন। নন্দের স্ত্রীর নাম যশোদা। যে রাতে যশোদার গর্ভে মহামায়া কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, সে রাতে শ্রীকৃষ্ণও মথুরার কারাগারে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেবের স্ত্রী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের হাতে কংসের মৃত্যু হবে—এরূপ দৈববাণী ছিল। কংসের ভয়ে বসুদেব জল-ঝড়পূর্ণ মধ্যরাতে কৃষ্ণকে নন্দের বাড়িতে নিদ্রিতা যশোদার কোলে রেখে দেন এবং গোপনে যশোদার কন্যা মহামায়াকে এনে দেবকীর কোলে রেখে দেন। মহামায়ার জন্মের সময় তাঁর মায়াতে সকলেই আচ্ছন্ন ছিল। এজন্য বসুদেবের এ সন্তান-পরিবর্তন কেউ টের পায়নি। এদিকে কংস কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত জানতে পেরে তাঁকে বধ করার জন্য গোকুলে ছদ্মবেশী চরদের পাঠান। নন্দ ভীত হয়ে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যান। একদিন কংসের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে নন্দ কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরায় যান। সেখানে কৃষ্ণ কংসকে বধ করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন।

নন্দিগ্রাম

অযোধ্যা হতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ ভরত অযোধ্যায় না-গিয়ে এখানে বসবাস করে রাজ্যপালন করতেন। লঙ্কাজয়ের পর চতুর্দশ বর্ষে বনবাস শেষ হলে, রাম এ স্থানে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হন এবং অযোধ্যায় ফিরে আসেন।

নবগ্রহ

ভারতীয় পুরাণমতে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু 'নবগ্রহ'।

নাক উঁচু

'নাক উঁচু' কথাটির আভিধানিক অর্থ—গর্বিত, আত্মাভিমানী, অসহ্য রকমের পছন্দপ্রবণ। তবে এর ব্যাকরণগত অর্থ অন্যরকম। নাক ও উঁচু শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে 'নাক উঁচু' বাগ্ধারটির সৃষ্টি। ঘটনাচক্রে নাকের একটি অনৈচ্ছিক আচরণ থেকে কথাটির উৎপত্তি। কোনো কিছু দেখে অবজ্ঞায় নাক সিঁটকালে নাকের ডগার দুপাশ সামান্য উঁচু হয়ে যায়। নাকের এ বিকৃত উঁচু-ভাবটাই বাংলা বাগভঙ্গিতে 'নাক উঁচু' কথায় স্থান করে নিয়েছে।

নাকানিচুবানি

অসহায়ভাবে অপমানিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া বা করা। 'নাকানি' ও 'চুবানি' শব্দ দুটোর সংযোগে নাকানিচুবানি শব্দের উৎপত্তি। নাক পর্যন্ত যে পানি তার এককথায় প্রকাশ হলো—নাকপানি। অন্যদিকে চুবানি শব্দের অর্থ হচ্ছে—পানিতে ডোবানো ও ভাসানো। সুতরাং 'নাকানিচুবানি' শব্দের অর্থ হচ্ছে—নাক পর্যন্ত পানিতে ডোবানো ও ভাসানো। নাক পর্যন্ত কাউকে পানিতে ডোবালে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়। আবার ভাসালে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার নাক পর্যন্ত ডোবালে আবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এভাবে কাউকে বারবার পানিতে নাক পর্যন্ত ডোবানো ও ভাসানো হলে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কষ্টে তার অবস্থা কাহিল

হয়ে পড়ে। এটি খুব কষ্টকর অবস্থা। ব্যক্তিজীবনে মানুষ যখন কোনো কারণে এমন কষ্টকর অবস্থায় পড়ে সেটি প্রকাশের জন্য 'নাকানিচুবানি' বাগভঙ্গি ব্যবহার করা হয়।

নাগর

অবৈধ প্রেমিকা, গোপন প্রণয়ী, প্রগলভ প্রণয়ী প্রভৃতি অর্থে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। এককালে 'নাগর' বলতে বোঝাত নগরবাসী বা নাগরিক। তাছাড়া বিদগ্ধ, শান্তশিষ্ট, সভ্য, ভদ্র, রসিক প্রভৃতি অর্থে 'নাগর' শব্দটির বহুল প্রচলন ছিল। এখন 'নাগর' শব্দটি এ সকল অর্থ হারিয়ে সত্যিকার অর্থে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। মধ্যযুগে এসে নাগর শব্দটি তার এমন মোহনীয় অর্থ হারিয়ে নায়ক, প্রিয়া, বঁধু প্রভৃতি অর্থ ধারণ করে। পরবর্তীকালে শব্দটির আরও ব্যাপক অর্থাবনতি ঘটতে থাকে এবং এরূপ ঘটতে ঘটতে অবৈধ প্রেমিকা, গোপন প্রণয়ী, প্রগ্লভ প্রণয়ী প্রভৃতি অর্থে স্থিতি পায়। এর কারণ রয়েছে। মূলত সভ্য, ভদ্র, রসিকলোকদের চাহিদা প্রেম-সমাজে অধিক। তাই এককালের নাগর তথা শান্তশিষ্ট, সভ্য, ভদ্র ও রসিক প্রমুখ আধুনিক যুগে এসে নাগর তথা অবৈধ প্রেমিকা হয়ে যায়।

নাভিশ্বাস

শব্দটির আভিধানিক অর্থ—শেষ অবস্থা, চরম অবস্থা। নাভি ও শ্বাস মিলে 'নাভিশ্বাস' বাগভঙ্গির সৃষ্টি। এবার দেখা যাক নাভিশ্বাস কী। মৃত্যুর প্রাক্কালে নাভিদেশ হতে ঊর্ধ্বমুখী যে শ্বাসটান দেখা যায় সেটাকে নাভিশ্বাস বলে। মানুষের জীবনের শেষ মুহূর্তে এমন ঘটনা ঘটে। নাভিশ্বাস উঠলে বুঝতে হবে তার এখন শেষ অবস্থা। জীবন হতে সে চরম মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নাভিশ্বাস ঘটনার এ অনুষঙ্গটি বাংলা বাগভঙ্গিতে শেষ অবস্থা বা চরম অবস্থা প্রকাশ করে। তবে বাগভঙ্গির এ নাভিশ্বাস মৃত্যুকালীন নাভিশ্বাস নয়। মানুষ যখন কোনো বিষয় বা কাজে বা কোনো কারণে চরম বিপদে অসহায় হয়ে পড়ে তখন তার নাভিশ্বাসের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়। সেটা বোঝাতে এ বাগভঙ্গিটি প্রয়োগ করা হয়।

নারী

নারী শব্দের অর্থ ছিল নেত্রী। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'নারী' শব্দের একটা দুর্দান্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভাষাবিদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার। 'ভারতী' সাময়িকীতে (১৩২০ সন আশ্বিন সংখ্যায়) বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "বেদের ভাষার মধ্যে যাহা প্রাচীনতম সেই ভাষার স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল 'নারী'। এই নারী শব্দ 'নর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নহে। 'নর' শব্দটি সুপ্রাচীন বেদসংহিতায় প্রচলিত নেই। যে যুগে 'নর' শব্দ ছিল না, কিন্তু 'নৃ' শব্দ ছিল, সে যুগে স্ত্রী শব্দ প্রকাশের জন্য নারী শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল এবং নারী শব্দের অর্থ ছিল নেত্রী, পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগ বিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না।" বোঝাই যাচ্ছে নর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হবার পর থেকেই নারী জাতির অবনতি শুরু।

নাস্তানাবুদ

'নাস্তানাবুদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—দুর্দশা, বিপর্যয়কর অবস্থা প্রভৃতি। ফারসি 'নিস্ত ওয় নাবুদ' বাগভঙ্গি থেকে বাংলা শব্দ 'নাস্তানাবুদ'-এর উৎপত্তি। 'নিস্ত ওয় নাবুদ' বাগভঙ্গির অর্থ হচ্ছে 'নাই, ছিলও না'। যার বর্তমানে কিছু নেই এবং অতীতেও কিছু ছিল না সে নিতান্তই হতভাগা। সে-ই 'নিস্ত ওয় নাবুদ'। এমন লোকের কোনো কিছু করার, চাওয়ার বা পাওয়ার থাকে না। সংগতকারণে সে নিতান্তই দুর্দশাগ্রস্ত। বাংলায় এদের বলা হয় —নাস্তানাবুদ।

নিথুয়া

‘নিথুয়া’ শব্দটি বাংলা একাডেমির অভিধানে নেই। এটি একটি আঞ্চলিক শব্দ। ব্যবহারও বিরল। থুয়ে (থুয়ে অ-ক্রি. রেখে) থেকে থুয়া। এ থুয়া শব্দের সঙ্গে নি উপসর্গ যুক্ত হয়ে নিথুয়া শব্দ গঠিত হয়েছে। এর সম্প্রসারিত অর্থ যেকোনো কিছু থুয়ে (রেখে) যায় না, নিষ্ঠুর, সর্বনাশা, বিশাল, যার ক্ষুধার শেষ নেই, নিষ্ঠুরতার অন্ত নেই প্রভৃতি। প্রয়োগ নিথুয়া পাথারে, নেমেছি বন্ধুরে/ধরো বন্ধু আমার কেহ নাই। এখানে নিথুয়া শব্দটি দিয়ে নিষ্ঠুর সাগরের কথা বলা হয়েছে—যে-সাগর সবকিছু নিয়ে যায় কিছুই রেখে যায় না, মহা রাক্ষস।

নিমগ্ন

শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—আচ্ছন্ন, নিবিষ্ট, একাগ্র, অনন্যমনা প্রভৃতি। ‘নিমগ্ন’ শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ হচ্ছে—নিচে মগ্ন। মূলত যা জলের নিচে বা জলে ডুবে রয়েছে তাকে ‘নিমগ্ন’ বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে ‘নিমগ্ন’ শব্দ জলের নিচে ডুবে থাকা অর্থে প্রয়োগ করা হয় না। কেন অর্থের এ পরিবর্তন, এর কি কোনো যৌক্তিক কারণ আছে? আগে জলের নিচে নিমগ্ন বিষয়টি এখন চিন্তায় বা চিন্তার নিচে ডুবে থাকা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। একটি জলের নিচে আর একটি হচ্ছে চিন্তার নিচে। অতএব অর্থের পরিবর্তন হলেও অন্তর্নিহিত ভাব অভিন্ন রয়ে গেছে।

নিমেষ

‘নিমেষ’ শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—খুব কম সময়, মুহূর্ত প্রভৃতি। ‘নিমেষ’ শব্দের ব্যাকরণগত অর্থ—পলক, চোখের পাতার স্পন্দন, চোখের পাতা ফেলার মধ্যবর্তী সময়। পর পর দুবার চোখের পাতা ফেলতে সাধারণত যে সময় লাগে তাকে বলা হয় ‘পলক’ এবং এ পলক হচ্ছে ‘নিমেষ’। ‘পলক’ ফারসি শব্দ। ফারসি পলক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে নিমেষ। নিমেষ বলতে এখন চোখের পলক বোঝায় না, এর দ্বারা খুব স্বল্প সময়কে প্রকাশ করা হয়।

নিরানব্বইয়ের ধাক্কা

টাকা জমানোর ঝোঁক, সম্পদ গড়ে তোলার অতিরিক্ত প্রবণতা, লোভ, লালসা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে বাগধারাটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রচলিত একটি গল্প থেকে বাগধারাটির উৎপত্তি। এক কৃপণ ব্যবসায়ীর মাত্রাতিরিক্ত খরচকারী এক ছেলে ছিল। ছেলেটি আজেবাজে খরচে ছিল খুব ওস্তাদ। একদিন কৃপণ ব্যবসায়ী গোপনে নিরানব্বই টাকার একটা থলে এমনভাবে এমন জায়গায় রেখে আসে যাতে থলেটি তার ছেলের হাতে পড়ে এবং পিতার কারসাজির মর্মে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। ছেলে টাকার থলেটি বাড়ি এনে গুনে দেখে নিরানব্বই টাকা রয়েছে। ছেলেটি নিরানব্বই টাকার সঙ্গে এক টাকা যোগ করে একশ টাকা করে। একসঙ্গে একশ টাকা দেখে ছেলের মধ্যে টাকা সঞ্চয় ও সংগ্রহের লোভ সৃষ্টি হয়। অতঃপর টাকা জমানোর নিমিত্ত সে প্রায় সকল খরচ বন্ধ করে দেয়। তার জমা টাকার পরিমাণ যত বাড়তে থাকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে লোভ। কৃপণ পিতা ছেলের উন্নতি দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও ছেলের সঞ্চয়-প্রবণতা ও আগের স্বভাব ত্যাগ করে অতিরিক্ত কঞ্জুসতায় কিছুটা হতভম্বও হয়ে যায়। এ ঘটনার অনুষঙ্গে ‘নিরানব্বইয়ের ধাক্কা’ কথাটি প্রচলিত।

নিরীহ

অসহায়, শান্ত, গোবেচারা, আলাভোলা প্রভৃতি অর্থ ‘নিরীহ’ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ‘নিরীহ’ সংস্কৃত শব্দ। এর আদি ও মূল অর্থ কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত অর্থ হতে ভিন্ন। মূলত যার ‘ঈহা’ বা ‘ইচ্ছা’ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যার ইচ্ছা বলতে আর কিছু নেই, যার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা তিরোহিত হয়ে গেছে তাকে বলা হতো ‘নিরীহ’। এখন কিন্তু এমন লোককে নিরীহ বলা হয় না, বরং আশা-আকাঙ্ক্ষা তিরোহিত হওয়ার কারণে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া প্রকাশে

নিরীহ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। আসলে যার ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তিরোহিত হয়ে যায় সে স্বাভাবিকভাবে ও সংগতকারণে অসহায়, শান্ত এবং গোবেচারা হয়ে পড়ে। হয়তো এজন্য 'নিরীহ' শব্দের এমন রূপান্তর বাঙালিরা সহজে মেনে নিয়েছে।

নির্ঘাত

'নির্ঘাত' শব্দের অর্থ—প্রবল, প্রচণ্ড, ভয়ানক, কঠোর, অব্যর্থ, অবশ্যই প্রভৃতি। এটি একটি তৎসম শব্দ। এর আদি ও মূল অর্থ— বজ্রপাত, ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মূলত বায়ুর সঙ্গে বায়ুর প্রচণ্ড সংঘর্ষে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগকে 'নির্ঘাত' শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করা হতো। সংস্কৃত 'নির্ঘাত' তথা বাংলা বজ্রপাত, ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রভৃতি নিঃসন্দেহে ভয়ানক। এগুলো মানুষের জানমাল ও সহায়সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি করে। এমন নির্ঘাতের ভয়ঙ্করতা হতে রক্ষার জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রয়াস ও আত্মসমর্পণ ভয়ঙ্কর স্মৃতি ও নৃশংস ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে আছে। তাই সংস্কৃত 'নির্ঘাত' বাংলায় প্রচণ্ড, ভয়ানক, কঠোর প্রভৃতিরূপে স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছে।

নিশিকুটুম্ব

'নিশি' ও 'কুটুম্ব' শব্দ নিয়ে 'নিশিকুটুম্ব'। নিশি অর্থ গভীর-রাত এবং কুটুম্ব মানে আত্মীয়। সুতরাং 'নিশিকুটুম্ব' মানে গভীর রাতের আত্মীয়। বাহ্যিক অর্থ রাতের আত্মীয় বোঝালেও 'নিশিকুটুম্ব' প্রকৃতপক্ষে গভীর রাতে আগত কোনো আত্মীয় বা কুটুম্ব নয়। তস্কর, চোর প্রভৃতি বোঝাতে নিশিকুটুম্ব শব্দটি ব্যবহার করা হয়। চোর, তস্কর, চুরি-করা প্রভৃতি শব্দ অশালীন গণ্যে অনেকে উচ্চারণ করতে চান না। এজন্য বলে নিশিকুটুম্ব। চক্ষুদান অর্থ চুরি করা। অনেকে 'চুরি করা' বাগভঙ্গি ব্যবহার না-করে বলেন 'চক্ষুদান'। অশালীন শব্দের এমন ব্যবহারকে 'মঞ্জুভাষণ' বলা হয়। রাত্রিবেলা যে লোক চুরি করার জন্য আত্মীয়ের (ব্যঙ্গার্থে) মতো এসে গোপনে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায় সে-ই নিশিকুটুম্ব। অবশ্য দিনের বেলাতেও চুরি হয়, তাকেও 'নিশিকুটুম্ব' বলা হয়। কারণ নিশিকুটুম্ব মানেই চোর। চোর সাধারণত রাতের বেলা আসে বলে শব্দটি 'নিশিকুটুম্ব'।

নিষাদ

অনার্য জাতি। কোশল রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে এদের রাজ্য এবং শৃঙ্গবেরপুর এদের রাজধানী ও রামসখা গুহক ছিলেন এদের রাজা। রামায়ণে বর্ণিত আছে, নিষাদরাজ মৎস্য, মাংস ও মধু উপহার নিয়ে ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অগ্নিপুরাণে বর্ণিত—একবার রাজা বেণের ঊরু মথিত হতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে এক কৃষ্ণবর্ণ ও খর্বাকৃতির পুরুষের জন্ম হয়। জন্মমাত্র ভীত অবস্থায় কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে থাকে। তখন সবাই একে বলে 'নিষাদ', অর্থাৎ উপবেশন কর। সে হতে এ পুরুষ নিষাদবংশের প্রতিষ্ঠাতা হয়। মনুসংহিতায় আছে—এ জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

নেপথ্য

রঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্তী স্থান, রঙ্গালয়ের সাজঘর বা সজ্জাঘর, নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীর দেহসজ্জা প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে 'নেপথ্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সহজ-সরল ভাষায় 'নেপথ্য' হচ্ছে এমন একটি আড়াল-স্থান যেখান থেকে একজন ব্যক্তি অনুচ্চস্বরে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংলাপের খেই ধরিয়ে দেয়। এ ছাড়া যে আড়াল-স্থান থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ অভিনয়ের পূর্বে বা চরিত্রের কারণে মাঝে মাঝে সাজগোজ করে সেটিও 'নেপথ্য'। এটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় নেপথ্য শব্দের অর্থ— নায়কের গমনীয় পথ। নায়কের গমনীয় পথ হচ্ছে গোপনীয় এবং আড়ালকৃত। নাটকের স্বার্থে তার পথকে গোপন রাখা হয়। যে পথ দিয়ে নায়ক রঙ্গালয়ে

আরোহণ করে সেটি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। এ অনুষঙ্গে বর্তমানে ‘নেপথ্য’ শব্দটি রঙ্গমঞ্চ হতে উঠে সমাজের সর্বস্তরের আড়ালে থাকা ব্যক্তিকেও নির্দেশ করে। ঘটনার নেপথ্যে কে? নেপথ্যে থেকে কে রাজনীতির কলকাঠি নাড়ছে তা জনগণ জানতে চায় প্রভৃতি বহুল প্রচলিত বাক্যে ‘নেপথ্য’ শব্দের অর্থপরিবর্তনের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায়।

নৈমিষারণ্য

গোমতী নদীর নিকটবর্তী ঋষি ও মহর্ষিদের পবিত্র আবাসস্থল। গৌরমুখ মুনি এখানে নিমেষকালমধ্যে অসুর-সৈন্য ভস্মীভূত করেছিলেন। তাই এ স্থানের নাম নৈমিষারণ্য। এ অরণ্যে সমবেত ঋষিবর্গের সম্মুখে সৌতি মহাভারত পাঠ করেছিলেন। বর্তমানে স্থানটি উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর জেলায় ‘নিমসার’ নামে পরিচিত।

ন্যাকা

ভণ্ড, ভদ্রতার আড়াল, সততার ভানকারী প্রভৃতি। ফারসি ‘নেক’ শব্দ থেকে বাংলা ‘ন্যাকা’ শব্দের উৎপত্তি। ফারসি ভাষায় নেক শব্দের অর্থ—পুণ্য, মঙ্গল, ভালো, কল্যাণ প্রভৃতি। ধর্মভীরু মানুষকে বাংলায় এখনও নেক মানুষ বা নেক বান্দা বলা হয়। যারা পুণ্যকর্মে নিবেদিত, ধর্মীয় আচারে নিষ্ঠ তারাও নেক বান্দা। কিন্তু নেক থেকে সৃষ্ট ন্যাকা বাংলায় সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ ধারণ করে বসে আছে। সমাজে এমন কিছু ভদ্র, শিষ্ট ও পুণ্যবান লোক রয়েছে যারা প্রকৃত অর্থে ভেতরে ও বাইরে অবিকল। তারাই নেক। কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যারা বাইরে সৎ দেখালেও ভেতরে ভেতরে অসৎ। সততার ভান করে তারা অসৎ কাজে মগ্ন থাকে। ‘নেক’-এর আড়ালে যারা গোপনে গোপনে নেকহীন কর্মে আচ্ছন্ন তাদেরকে প্রকাশের জন্য ‘ন্যাকা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প

পঞ্চকন্যা
ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত বিখ্যাত নারীচরিত্র। যথা : অহল্যা, দ্রৌপদী, কুমন্তী, তারা ও মন্দোদরী। প্রত্যহ এঁদের স্মরণ করলে সকল পাপ দূর হয়। সংখ্যায় পাঁচ জন, তাই এঁদের নাম—পঞ্চকন্যা।

পঞ্চতপা
চতুর্দিকে অগ্নি এবং উপরে সূর্য—এ পঞ্চ উত্তাপের মধ্যে যে তপস্যা করে তাকে পঞ্চতপা বলা হয়।

পঞ্চতীর্থ
কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর।

পঞ্চদেবতা
গণেশ, গৌরী, আদিত্য, রুদ্র ও কেশব-কে একত্রে পঞ্চদেবতা বলা হয়।

পঞ্চপর্ব
পাঁচটি তিথিকে আশ্রয় করে হিন্দুদের পর্বদিন নিরূপণ করা হয়। সে পাঁচটি তিথি হচ্ছে অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি।

পঞ্চপাণ্ডব
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এ পাঁচজনকে একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়।

পঞ্চপিতা
জন্মদাতা, ভয়ত্রাতা, দীক্ষাদাতা, অন্নদাতা ও শ্বশুর—এ পাঁচজন একজন মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এদের পঞ্চপিতা বলা হয়।

পঞ্চপ্রাণ
হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত দেহস্থ পঞ্চবায় হলো—প্রাণ, আপান, সমান, উদান ও ব্যান।

পঞ্চবট
অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী এ পাঁচটি পবিত্র বৃক্ষকে একত্রে পঞ্চবট বলা হয়।

পঞ্চবটী
গোদাবরী নদীর উৎসস্থানের নিকটবর্তী ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত এক অনুপম অরণ্য। এখানে রাম নির্বাসনের কয়েক বছর আশ্রম নির্মাণ করে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। এ পঞ্চবটীবন থেকে সীতাকে অপহরণ করা হয়েছিল। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকী—এ পাঁচটি পবিত্র বৃক্ষের সমন্বয়ে বনটি গঠিত বলে এর নাম পঞ্চবটীবন। বর্তমান নাসিক শহর পঞ্চবটী নামে কথিত ছিল। কারণ এখানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকা কর্তন করেছিলেন।

পঞ্চবৃক্ষ
স্বর্গের পাঁচটি বৃক্ষ, যথা মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন। এ পাঁচটি মহামূল্যবান বৃক্ষকে একত্রে পঞ্চবৃক্ষ বলা হয়।

পঞ্চভূত
পৃথিবীর অনিবার্য উপাদান—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এ পঞ্চ উপাদানের একটি কম হলেও পৃথিবীর স্বাভাবিকতা আর থাকবে না।

পঞ্চযজ্ঞ
ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদপাঠ, নৃযজ্ঞ বা অতিথিসৎকার, পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধতর্পণাদি, দেবযজ্ঞ বা দেবপূজা, ভূতযজ্ঞ বা ইতরপ্রাণীর সেবা। এগুলো পুণ্যের কাজ। তাই এ পাঁচটি যজ্ঞকে একত্রে 'পঞ্চযজ্ঞ' বলা হয়।

পঞ্চরত্ন
নীলকান্ত, হীরক, পদ্মরাগ, মুক্তা ও প্রবাল।

পঞ্চলক্ষণা
পুরাণের পাঁচটি বিশেষ লক্ষণ। এ লক্ষণগুলো হচ্ছে স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত।

পটভূমি
চালচিত্র, পারিপার্শ্বিকতা, পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতি। 'পটভূমি' শব্দের মূল, আদি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো সেই দৃশ্য যাকে পেছনে রেখে অভিনয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মুখ্য বিষয়ে ফুটিয়ে তোলার জন্য বা আরও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে কোনো চিত্রের পেছনে যে অংশ অঙ্কন করা হয় সেটাও পটভূমি। পটভূমির কাজ ছিল মুখ্যচিত্র বা কলাকুশলীদের অভিনয়কে আরও মোহনীয় করে তোলা। চালচিত্র, পারিপার্শ্বিকতা বা পরিপ্রেক্ষিত থেকে কোনো বিষয়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাওয়া যায়; তেমনি পটভূমি দেখে চিত্র কেমন সুন্দর হবে, অভিনয় কতটুকু উপভোগ্য হবে তা অনুধাবন করা যেত। তাই শব্দটির প্রাচীন অর্থের বাহ্যিক বা অবয়বগত পরিবর্তন হলেও অন্তর্গত কোনো পরিবর্তন হয়নি।

পটল তোলা
'পটল তোলা' বাগভঙ্গির আভিধানিক অর্থ—মরে যাওয়া, অক্কা পাওয়া, মৃত্যু, মরণ, পরলোকগমন প্রভৃতি। পটল থেকে পটল তোলা বাগভঙ্গির উৎপত্তি। পটল শব্দের অর্থ—রাশি, অধ্যায়, সমূহ, চোখের পাতা, চোখের এক ধরনের রোগ, ঘরের চাল, সবজি বিশেষ। তবে পটলের যত অর্থই থাকুক, পটল বলতে যেটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি হচ্ছে অনেকটা চোখের আকৃতির একটি ছোট সবজি। পটল মাঠ থেকে তুলে কৃষকরা বাড়ি নিয়ে যায়, নিজেরা খায়, বাজারে বিক্রিও করে। অহরহ পটল তোলা হচ্ছে, পটল তুলে দিব্যি আরামে পটল নিয়ে ক্ষেত ত্যাগ করেন কিন্তু পটল তোলার পর দেহত্যাগ করেছেন এমন ঘটনা খুবই বিরল। অথচ 'পটল তোলা'র অর্থ মারা যাওয়া, কিন্তু কেন এমন অর্থ! অথচ পটলের সঙ্গে জীবনাবসান বা অক্কাপাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। পটল শব্দের একটি অর্থ—চোখের পাতা। মানুষ মরলে চোখের পাতা উপরে উঠে যায়। এ জন্য অনেকে মনে করেন চোখের পাতা বা চোখের পাতা অর্থ-প্রকাশকারী 'পটল' থেকে 'পটল তোলা' বাগভঙ্গির উৎপত্তি। অর্থাৎ চোখের পাতা তোলা বা চোখের পাতা উপরে উঠে যাওয়া। আবার কেউ কেউ মনে করেন ঘরের চাল হতে পটল তোলা শব্দের উৎপত্তি। এর সপক্ষে তারা বিভিন্ন গানের কলির কথা উল্লেখ করে থাকেন। যেমন

—অনেক গানে আছে ভবের পটল তুলতে হবে মন, আজ বাদে কাল...। এখানে 'পটল' বলতে গৃহ বা চালা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নিবাস তোলা। মানুষ যখন অক্কা পায় তখনই কেবল বাস তোলে, বা চালা তুলে চিরতরে ভবের পটল গুটিয়ে যায়। অনেকে মনে করেন, পটল তোলা শেষ হলে পটল গাছ মরে যায়, তাই 'পটল তোলা' অর্থ মারা যাওয়া। কিন্তু এটি ভিত্তিহীন। কারণ শুধু পটল নয়, অনেক সবজি আছে যেগুলো তোলা শেষ হলে ওই সবজি গাছ মারা যায়।

পাঞ্চাল

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। পাঞ্জাবকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল বলা হয়। তবে হস্তিনাপুরের নিকটবর্তী কিছু অঞ্চলও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। পণ্ডিতগণের মতে, দিল্লি থেকে উত্তর ও পশ্চিমে বিস্তৃত স্থান, যা হিমালয়ের পাদমূল থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত প্রসারিত তা পাঞ্চাল অঞ্চল। এটি রাজা দ্রুপদের রাজ্য ছিল। দ্রৌপদী ছিল পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যা। তাই তাঁকে পাঞ্চালী বলা হয়।

পাড়া

'পাড়া' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—ছোট গ্রাম, গ্রামের অংশ, খণ্ডগ্রাম প্রভৃতি। ফারসি 'পারা' থেকে বাংলা 'পাড়া' শব্দের উৎপত্তি। ফারসি 'পারা' শব্দের অর্থ—অংশ, বিভাগ, খণ্ড প্রভৃতি। ফারসি 'পারা' শব্দের অংশ, বিভাগ বা খণ্ড যেকোনো কিছুর হতে পারে কিন্তু বাংলা 'পাড়া' বলতে কেবল গ্রামের অংশকে বোঝায়। পাড়া হচ্ছে গ্রামের অংশ বা গ্রামের একটি বিভাগ বা খণ্ড। পৌরনীতির ভাষায় কয়েকটি পাড়া মিলে একটি গ্রাম। এজন্য ফারসি 'পারা' বাংলায় এসে গ্রামের অংশ বা খণ্ড বা বিভাগ হিসাবে 'পাড়া'-রূপ ধারণ করে।

পাতঞ্জল দর্শন

ভারতীয় পুরাণ মতে পতঞ্জল মুনি 'পাতঞ্জল দর্শন'-এর প্রবক্তা। তাই তাঁর নামানুসারে এ দর্শনকে পাতঞ্জল দর্শন বলা হয়। পতঞ্জলি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে মানুষের পরিত্রাণ সাধনের লক্ষ্যে 'যোগশাস্ত্র' প্রবর্তন করেন। পাতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর নিজের ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করে জগৎ সৃষ্টি করেন। অতএব তাকে একরূপ সাকারবাদী বলা যায়। মানুষের বিভিন্ন প্রকার চিত্তবৃত্তি রয়েছে। এ সব বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নির্ধারিত আছে। যেমন—দর্শনের বিষয় রূপ, শ্রবণের বিষয় শব্দ, ঘ্রাণের বিষয় গন্ধ প্রভৃতি। মনকে এ সকল বিষয় হতে নিবৃত করে পরমেশ্বরের ধ্যান করাকে 'যোগ' বলা হয়। এ যোগের আটটি অঙ্গ। যেমন—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমস্ত পুণ্যফলদায়ক 'সমাধি'।

পাততাড়ি

প্রথমে বলে রাখা ভালো—তালপাতার তাড়ি থেকে পাততাড়ি। এটি একটি অনবদ্য শব্দ, অপূর্ব ইতিহাস। মানুষের সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে পাততাড়ির অবদান অসামান্য। পাততাড়ি শব্দের আধুনিক অর্থ সমুদয় জিনিস, জিনিসপত্র। একসময় শব্দটির অর্থ ছিল পাতার তাড়া/তাড়ি বা গুচ্ছ। এ পাততাড়ি ছিল তালপাতার তাড়ি যা শিক্ষার্থীদের হাতে থাকত। এ দেশে যখন কাগজের প্রচলন ছিল না, তখন পাঠশালায় তালের পাতায় লেখালেখি করা হতো। পাঠশালা বা গুরুগৃহে দিনের লেখাপড়া শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা তাদের তালপাতার তাড়ি ভালো করে গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরত। পাততাড়ি গুছিয়ে বাড়ি ফেরার প্রাচীন এ অনুষঙ্গ থেকে 'পাততাড়ি' শব্দের উৎপত্তি। বর্তমানে এর অর্থ ভিন্ন হয়ে গেলেও মূল অভিব্যক্তি আগের মতো অভিন্ন রয়েছে।

পাতাল

পৃথিবীর নিচে অবস্থিত স্থান। পাতাল সাতটি স্তরে বিভক্ত। দেবী-ভাগবতে উল্লেখ আছে যে, অন্তরীক্ষের

অধোদেশে পৃথিবী শত যোজন বিস্তৃত। এ পৃথিবীর অধোদিকে সাতটি বিবর রয়েছে। এদের পাতাল বলা হয়। এ সপ্ত পাতাল স্বর্গের চেয়েও সুখকর স্থান। এখানে দৈত্য, দানব ও সর্পরা পরিবার-পরিজন নিয়ে সুখে বাস করে। এ সাতটি স্তর হচ্ছে যথাক্রমে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল।

পাদোদক

পাদ + উদক শব্দের অর্থ—পূজনীয় ব্যক্তির পা ধোয়া জল। পাদোদক = পাদ + উদক। বঙ্গীয় শব্দকোষে দুটি অর্থ দেওয়া আছে (১) পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল, (২) চরণামৃত অর্থাৎ (১) 'পা ধোওয়া হয় যে জলে' এবং (২) এ ঠিক পা-ধোওয়া জল-টল নয়, এ হলো 'চরণামৃত'। কিন্তু কী এই চরণামৃত? 'উদক' এসেছে 'উন্দ' ক্রিয়া থেকে। 'উদক'-এর স্বরূপ দু-রকমের—(১) বাহ্যিক, (২) মানসিক। (১) বাহ্যিকভাবে দেখলে আপনি ভূমিতে একটা কোদালের কোপ মারলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফিনিক দিয়ে জল আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—একেই বলে 'উদক'; 'আর্টেজিয় কূপ'-এ এরকম জল দেখা যায়। শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে অর্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ করে তাঁকে উদক-দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর (২) মানসিকভাবে দেখলে এর স্বরূপ হলো—উপর দিকে উঠে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়া যে কোনো দৈহিক বা মানসিক তৃষ্ণা-নিবারক বিষয় বা বস্তুই হলো 'উদক'। প্রসঙ্গত 'তর্পণ'-এ যে জলের কথা বলা হয় তাও হলো 'উদক'।

তাহলে, বলা যায় 'পাদোদক' হলো এমন ধরনের 'উদক' যা কারও 'পাদ' থেকে বা 'পাদন' করা (পা ফেলে ফেলে এগোনো) থেকে উৎসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেভাবেই উদক-পানকারীদের কাছে আসে। তার মানে এই পাদোদক আসলে উৎ-পাদন করা বস্তু বা বিষয়। মনীষী-পদবাচ্য রসিক ও জ্ঞানীজনেরা পদে পদে বা চরণে চরণে তাঁদের যে রসের কথার ও জ্ঞানের কথার উৎ-পাদন করেন, সে পাদোদককে 'চরণামৃত' বলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা ও গানের চরণে চরণে বা পদে পদে যে পাদোদক দিয়ে গিয়েছেন, আমরা বাংলাভাষীরা কি রবীন্দ্রনাথের সে চরণামৃত বা পাদোদক নিত্য পান করি না? সর্বোপরি স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি এ বিশ্বজগতের সর্বত্র, সমস্ত পদে পদে তাঁর সমস্ত কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্নের মাধ্যমে যে 'পাদোদক' বা চরণামৃত দিয়ে রেখেছেন, সেসব কথা বরং উত্তম-অধিকারীদের জন্য তোলা থাক।

পার/পাড়

'পার' ও 'পাড়' অনেক সময় একই অর্থ বোঝালেও প্রায়োগিক ধরন ভিন্ন। নদী, সমুদ্র ইত্যাদির তীর বোঝাতে 'পার' কিন্তু পুকুর, দিঘি, সরোবর ইত্যাদির তীর অর্থে 'পাড়' ব্যবহার করা হয়। আবার 'পার' অর্থ নদীর বিপরীত তীর (নদীর এ-পার ও-পার)। নিষ্কৃতি (পার পাওয়া) অর্থেও পার ব্যবহৃত হয়। যেমন—'অনেক কষ্টে বিপদ থেকে পার পাওয়া গেল।' আবার প্রান্তদেশ (শাড়ির পাড়) বোঝাতে 'পাড়' ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণত বৃহৎ জলাশয়ের তীর বোঝাতে 'পার', ছোট জলাশয়ের তীর বোঝাতে 'পাড়'। যেমন—'নদীর পার, সাগরের পার কিন্তু পুকুরের পাড়।' আসলে কি এ ব্যাখ্যা যথার্থ?

'পার' সংস্কৃত শব্দ। 'পার' বলতে বোঝায় নদীর বিপরীত তীর বা কূল। এছাড়াও শব্দটি আরও বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যখন বলা হয়, গগন পারে সূর্য হাসে; তখন এর অর্থ প্রান্তভাগ। যখন বলা হয়, মাঠের পারে মাঠ, তার পারে হাট; তখন 'পার' অর্থ বোঝায় সীমানা। যদি বলা হয়, কৌশলটা কাজে লাগলে পার পাওয়া যাবে; এখানে 'পার' অর্থ প্রতিকার পাওয়া। আবার নিষ্কৃতি, উদ্ধার, রেহাই প্রভৃতি অর্থেও 'পার' ব্যবহার করা হয়। যেমন—'দয়াল পার কর আমারে, এ ভব সিন্ধুপারে।' এখানে 'পার' অর্থ পরিত্রাণ। 'সপ্তপাতাল ভেদ করি বাণ হল পার, শত্রুরা কম্পমান, রেহাই নাহি আর।' এখানে 'পার' বলতে এক পাশ ভেদ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে যাওয়া। উত্তীর্ণ হওয়া অর্থেও 'পার' শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন—'পরীক্ষার কঠিন বৈতরণী কোন প্রকারে পার করলাম।' নিষ্কৃতি অর্থেও 'পার' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

‘পাড়’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—নদীর তীর, প্রান্ত, তট বা কূল, উঁচু জায়গা। সংস্কৃত পার, পাট বা পাটক থেকে শব্দটির উৎপত্তি। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, পুকুর, জলাশয় বা কুয়োর চারপাশের বেষ্টনী, ক্ষেতের আল প্রভৃতি হচ্ছে ‘পাড়’। পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ বোঝাতেও ‘পাড়’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ ‘পাড়’ শব্দটির উৎস সংস্কৃত ‘পট্টি’। আবার পায়ের চাপ দেওয়াও ‘পাড়’; যেমন ঢেঁকিতে পাড়। পায়ের ‘পাড়’ এসেছে সংস্কৃত ‘পাত’ ধাতু থেকে।
অভিধান অনুসারে নদীর বিপরীত তীর হচ্ছে ‘পার’। তাহলে অন্য তীর ‘পাড়’। যদি কেউ বলেন, মমিন নদীর পার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, এর অর্থ মমিন নদীর ওপার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আবার যদি বলা হয়, মমিন নদীর ‘পাড়’ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, অর্থ হয় মমিন নদীর এপার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলায় ‘পার’ ও ‘পাড়’ শব্দ দুটো এ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। লেখা হয়, এপার থেকে ওপার যাব, কেউ লেখে না ‘এপাড় থেকে ওপার যাব’। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস’। ওপরের আলোচনা হতে এটি প্রতীয়মান হলো নদী বা জলরাশির তীর বোঝাতে ‘পার’ ও ‘পাড়’ শব্দের যে অর্থ দেওয়া হয়েছে তা অস্পষ্ট।

পাষণ্ড

‘পাষণ্ড’ একটি ঐতিহাসিক শব্দ। সংস্কৃত হতে আগত শব্দটির বর্তমান অর্থ—নিষ্ঠুর, অত্যাচারী বা নরপিশাচ। তবে এর মূল অর্থ ছিল পাপচিহ্নধারী। এ শব্দ দিয়ে বেদবিরোধী ধর্মসম্প্রদায় যেমন বৌদ্ধ ও জৈনদের বোঝানো হতো। প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণের পাষণ্ড-দলন ছিল একটি নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মীয় কৃত্য। সেকালে পাষণ্ড-দলন কথাটির অর্থ ছিল—বৌদ্ধদমন। প্রাচীন ভারতের যে সকল অঞ্চল বৌদ্ধ সম্রাটদের অধিকারে ছিল, সে সব অঞ্চলের বৌদ্ধরা আবার হিন্দুদের বলত ‘পাষণ্ড’। বাংলায় শব্দটি প্রথমে অধার্মিক, বিধর্মী, নাস্তিক ইত্যাদির প্রতিশব্দরূপে প্রবেশ করে। পরে শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটে। এখন ‘পাষণ্ড’ বলতে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। এখন ধর্মীয় দলন-পীড়নের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

পিকেটার

ধর্মঘট, হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ প্রভৃতি পালনের অনুরোধ করার লক্ষ্যে রাস্তা, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো জনবহুল স্থানে অবস্থানকারী। সাধারণত হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদিসহ বিভিন্ন রাজনীতিক আন্দোলন বা কর্মসূচি পালনের জন্য সমর্থকবৃন্দ রাস্তায় যানবাহন চলাচলে বাধা প্রদান করে থাকেন অথবা দলবদ্ধভাবে রাস্তায় বা প্রকাশ্যস্থানে অবস্থানপূর্বক স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে কর্মসূচি বা আন্দোলনের অনুকূলে দাবি জানানোকে ‘পিকেটিং’ বলে। যারা পিকেটিং করে তারাই ‘পিকেটার’। পিকেটিং ও পিকেটার দুটোই ইংরেজি শব্দ। মূলত ‘পিকেট’ শব্দ হতে ইংরেজি পিকেটিং ও পিকেটার শব্দের উৎপত্তি। তবে ‘পিকেট’ ইংরেজি শব্দ নয়, এটি ফরাসি শব্দ। পিকেট সামরিক বাহিনীর নিজস্ব গন্ডীতে ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ। শত্রুপক্ষের গতিবিধির ওপর গোপনীয়ভাবে নজর রাখার জন্য সামরিক বাহিনীর একটি দল থাকে। এ দলটি ‘পিকেট’ নামে পরিচিত। ফরাসি ‘পিকেট’ শব্দের অর্থ ভিন্ন। ফরাসি ভাষায় ‘পিকেট’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—সীমানা নির্ধারণের জন্য সুঁচালো আগা-বিশিষ্ট খুঁটির বেড়া। ইংরেজরা ‘পিকেট’ শব্দের সঙ্গে ফরাসি অর্থকেও সানন্দে গ্রহণ করেছে। ইংরেজ আমলে শৌখিন ভবনসমূহের চারদিকে যে বেষ্টনী দেওয়া হতো তা ‘পিকেট’ নামে পরিচিত ছিল। এখনও বাঙালি গৃহস্থবাড়ির সামনে কাঠ, বাঁশ কিংবা লৌহ-নির্মিত পিকেট বা বেড়া দেখা যায়। পিকেট বা বেড়ার কাজ হচ্ছে সীমানার বাইরে থেকে প্রবেশে বাধা দেওয়া। ‘পিকেটার’দের কাজও প্রায় অনুরূপ। তারাও পিকেট বা বেড়ার মতো যানবাহনের চলাচল কিংবা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাধাদান করেন।

পীঠস্থান

তন্ত্র অনুসারে ৫২টি স্থানকে পীঠস্থান বলা হয়। যেখানে সতীর দেহাংশ শিব নিক্ষেপ করেছিলেন। কথিত হয়,

দক্ষযজ্ঞে সতী মারা গেলে তাঁর মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করে পৃথিবী পরিভ্রমণকালে শিব সীতার দেহ ছিন্ন করে ৫২টি স্থানে নিক্ষেপ করে।

পুকুরচুরি

পুকুর ও চুরি শব্দ থেকে পুকুরচুরি বাগধারার উৎপত্তি। অভিধান ও প্রচলিতভাবে বড় কোনো দুর্নীতি, বড় প্রতারণা প্রভৃতি বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পুকুর খনন করা একসময় ছিল অত্যন্ত জনহিতকর কর্ম। নদী ছাড়া সর্বসাধারণের সুপেয় পানির সার্বক্ষণিক উৎস ছিল পুকুরের জল। প্রচুর জমিজমা থাকলেও পুকুর খনন ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য এবং অনিশ্চিত কাজ। পুকুর খনন করলেও সবখানে জল উঠত না, পাওয়া গেলেও বছরে কেবল কয়েক মাস জল থাকত। তাই পুকুর খনন করা ছিল সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল কাজ। বর্তমানে এমন ব্যয়বহুল কাজে যারা দুর্নীতি করে তাদের 'পুকুরচোর' এবং তাদের চৌর্যবৃত্তিকে 'পুকুরচুরি' বলা হয়। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প শোনা যায় বড়সাহেব ভাবলেন, অফিসের সামনে একটি সুন্দর পুকুর হলে ভালো হয়। সে লক্ষ্যে তিনি বাজেট চেয়ে উপরে লিখলেন। কিছুদিন পর অনুমোদনসহ বাজেট এল, কিন্তু কাজ শুরু করার আগেই বড়সাহেবের বদলির হুকুম এসে যায়। এখন কী করা? তিনি খুব সুন্দর করে পুকুর খননের সব ভাউচার তৈরি করলেন। ফাইলের ভেতরে পুকুর কাটা হয়ে গেল। যেখানে যা যা করা দরকার সব ঠিকঠাক করে পকেট ভারি করে তিনি বিদায় নিলেন। নতুন বস এসে দেখলেন পুকুর আছে/পুকুর নেই। তিনি বুদ্ধিমান। অতএব দেরি না করে অপরিকল্পিত পুকুর ভরাটের জন্য বাজেট চেয়ে উপরে লিখলেন। যথাসময়ে রমরমা বাজেট এসে গেল। তিনি খুব সুন্দর করে পুকুর ভরাটের সব ভাউচার তৈরি করলেন। ফাইলের ভেতরে পুকুর ভরাট হয়ে গেল। অতঃপর, যেখানে যা যা করা দরকার সব ঠিকঠাক করে নিজের সিন্দুক ভারি করে সুখনিদ্রা উপভোগ করলেন।

পুঙ্খানুপুঙ্খ

সংস্কৃত 'পুঙ্খ' শব্দের অর্থ—বাণ বা শরের পালকযুক্ত বাণমূল। এ 'পুঙ্খ' শব্দের সঙ্গে 'অনু' যুক্ত হয়ে 'অনুপুঙ্খ' শব্দ গঠিত হয়েছে। শব্দটির অর্থ—খুঁটিনাটি বা বিস্তৃতি বা নিবিড়তা। এটি সাধারণত বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাণ বা শর যেমন চারপাশের অগণিত বিষয় এড়িয়ে শুধু লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশ্যে ছুটে যায় এবং লক্ষ্যবস্তুকে খুঁজে নেয় তেমনি 'অনুপুঙ্খ' শব্দটির দ্বারাও অনেক বিষয় বা বিস্তৃতি এড়িয়ে নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুকে লক্ষ করে 'অনুপুঙ্খ' শব্দের প্রাসঙ্গিকতা ধাবিত। যেমন—অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখা যায় তিনি নির্দোষ। 'পুঙ্খ' শব্দের সঙ্গে অনুপুঙ্খ যুক্ত হয়ে 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর অর্থ—তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান বা আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ। এটি একটি বিশেষণ। যেমন—সংশ্লিষ্ট সব নথি পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখার পরও তদন্তদল মালয়েশিয়ার নিখোঁজ বিমানটির কোনো হাদিস পেলেন না। রচনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেও কোনো ত্রুটি পেলাম না।

পুণ্ড

ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী 'পুণ্ড' হচ্ছে বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। রাজা বলি ঊর্ধ্বরেতা ছিলেন। বলির স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্ড্র নিজের নামীয় রাজ্যের রাজা হন। বিখ্যাত পুণ্ড্র রাজ্যের রাজা ছিলেন পুণ্ড।

পুত

একটি নরকবিশেষ। এ নরকে নিঃসন্তান ব্যক্তিদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। 'পুত' নামক নরক থেকে পিতাকে উদ্ধার করেন বলে পুরুষ সন্তানকে 'পুত্র' বলা হয়। 'পুন্নাম' অর্থাৎ পুৎ নামের যে নরক রয়েছে সেখানে সবাইকে গমন করতে হয়। সে নরক থেকে বংশধর পুত্র পিতাকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যায়।

পুরাণ
অতি প্রাচীনকালের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, সমাজ, ধর্ম, রাজ্য, শাসন প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির নিজস্ব পুরাণ রয়েছে। উপমহাদেশে সাধারণত পুরাণ অর্থে ব্যাসাদি মুনি প্রণীত শাস্ত্রকে বোঝায়। ভারতীয় 'পুরাণ' দুই ভাগে বিভক্ত মহাপুরাণ ও উপ-পুরাণ।

পুরুষ/পরুষ
'পুরুষ' অর্থ পুংজাতীয় জীব, নারীর বিপরীত, মানুষ, ঈশ্বর, পরমেশ্বর ইত্যাদি। কিন্তু 'পরুষ' শব্দের অর্থ—কড়া, রূঢ়, কর্কশ, পরুষভাষী অর্থ কটুভাষী; পরুষতা অর্থ কর্কশতা, ঔদ্ধত্য এবং পরুষকণ্ঠ অর্থ কর্কশকণ্ঠ। সুতরাং আপনার অধস্তন কেউ যদি কর্কশ অর্থে 'পরুষ' লিখে থাকেন তো ভুল ভেবে ভুলেও 'প'-এর নিচে হ্রস্ব উ-কার দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।

পূর্ব-মীমাংসা
জৈমিনী মুনি প্রবর্তিত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। এটা বেদান্তের অংশ। পূর্ব-মীমাংসার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বেদ-ব্যাখ্যায় সহায়তা করে মানুষকে ধর্মকর্মে অনুপ্রাণিত করা।

পেশল
পেশল শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—পেশিবহুল, শক্তিমান, বলিষ্ঠ, শক্তিশালী প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় 'পেশল' শব্দের মূল অর্থ হলো রূপবান, সুন্দর, মোহনীয়, আকর্ষণীয়, সুকুমার, কোমল প্রভৃতি। বাংলায় যখন শব্দটি আসে তখনও এর মূল অর্থ বেশ কিছুদিন অবিকৃত ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে শব্দটি তার সুকুমার অর্থ হারিয়ে 'শক্তিমান' অর্থ ধারণ করে। আসলে যে পেশিবহুল, শক্তিমান, বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী সে সুন্দর। রুগণ ও পেশিহীন শরীর অসুন্দরের প্রতীক। অন্যদিকে পেশিবহুল শক্তিমান শরীর সৌন্দর্য আকর্ষণ ও মোহনীয়তার প্রতীক। শক্তিমান ও পেশিবহুল মানুষ বা জীবের প্রতি সবাই আকৃষ্ট হয়। পশুর বাজারেও শক্তিশালী পশুটি সুন্দরের কারণে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী সুন্দরের প্রতিভূ হিসেবে সংস্কৃত রূপবান, সুকুমার, সুন্দর প্রভৃতি মোহনীয় গুণবাচক শব্দটি বাংলায় শক্তিমান রূপে আবির্ভূত হয়।

পোঁ ধরা
'পোঁ ধরা' শব্দের অর্থ—তোষামোদ করা। 'পোঁ' আর ধরা শব্দ মিলে 'পোঁ ধরা' শব্দের উৎপত্তি। পোঁ হলো সানাইয়ের ধ্বনিবিশেষ। সুতরাং 'পোঁ ধরা' অর্থ হলো সানাইয়ের ধ্বনি ধরা। সানাই পোঁ পোঁ করে বাজে বলে সানাইয়ের সুরকে পোঁ বলা হয়। মূল সানাইবাদকের সঙ্গে সহযোগী সানাইবাদক থাকে। মূল সানাইবাদক সানাইয়ের বিভিন্ন সুর তুললেও সহযোগী সানাইবাদক কেবল একটানা অপরবির্তনীয় সুর 'পোঁ'-ই বাজিয়ে যান। মূলত এটাই তাঁর কাজ। আর সহযোগী সানাইবাদকের এ কাজটি হলো 'পোঁ ধরা'। সানাইবাদকের অনুকরণে সহযোগী সানাইবাদকের অপরিবর্তনীয় পোঁ ধরা কার্য থেকে বাংলা বাগধারা 'পোঁ ধরা'-র উৎপত্তি।

পোয়াবারো
'পোয়াবারো' শব্দের অর্থ—সম্পূর্ণ অনুকূল বা পরম সৌভাগ্য। পাশা খেলার একটা দান হতে শব্দটির উৎপত্তি। পাশা খেলার একটা দান হলো 'পোয়াবারো'। ছক্কার ঘুঁটি ফেলে কোনো চালে যদি পর পর ৬ + ৫ + ১ অথবা ৬ + ৬ + ১ দান পড়ে সেটাই 'পোয়াবারো' দান নামে পরিচিত। পাশা খেলায় 'পোয়াবারো' দান পাওয়া হলো জয়সূচক দান পাওয়া। এটি জয় ও সৌভাগ্যের নিশ্চিত বার্তা। জয় ও সৌভাগ্যের সঙ্গে জড়িত বলে পোয়াবারো দানটি

‘পোয়াবারো’ শব্দরূপে বাংলা বাগভঙ্গিতে উঠে এসেছে।

প্রকাণ্ড

‘প্রকাণ্ড’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—বিশাল, বৃহৎ, বিরাট, অতিবৃহৎ, মস্তবড় প্রভৃতি। ‘প্রকাণ্ড’ শব্দের মূল ও আদি অর্থ—গাছের গুঁড়ি। কাণ্ডের সঙ্গে ‘প্র’ উপসর্গ যুক্ত হয়ে গুঁড়িটাকে আরও বিশাল অবয়ব দিয়েছে। তৎকালে গাছের গুঁড়ি হতো বৃহৎ ও বিশাল আকারের। এটাকে সহজে নাড়াচাড়া করা যেত না। গাছের গুঁড়ির এ বিশাল আকৃতি বাংলায় এসে যেকোনো বিশালত্বকে প্রকাশ করার সেবায় নেমে পড়ে।

প্রজাপতি

হিন্দু পুরাণ মতে ‘প্রজাপতি’ হচ্ছে বিশ্বের জীবসমূহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্বপুরুষ। বেদ শাস্ত্রে ইন্দ্র, সাবিত্রী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অন্যান্য দেবতাকে ‘প্রজাপতি’ বলা হয়। মনুসংহিতায় ব্রহ্মাকে প্রজাপতি উপাধি দেওয়া হয়েছে। কারণ তিনিই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এবং পৃথিবীর রক্ষক। ব্রহ্মার পুত্র হিসেবে এবং দশজন ঋষির সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বয়ম্ভূ মনুকেও প্রজাপতি বলা হয়। এ ঋষিরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং এ মানসপুত্র হতেই মানবের সৃষ্টি। এ জন্য এ দশজন ঋষিকে সর্বত্র প্রজাপতি বলা হয়েছে।

প্রতীক্ষা ও অপেক্ষার পার্থক্য

প্রথমে বলে রাখি, সাধারণত ‘প্রতীক্ষা’ ও ‘অপেক্ষা’ উভয় শব্দের অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই। অপেক্ষা অর্থ প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষা অর্থ অপেক্ষা। সহজ ভাষায় উভয় শব্দের পার্থক্য এত কম যে, অপেক্ষার স্থলে প্রতীক্ষা ও প্রতীক্ষার স্থলে অপেক্ষা লেখা যায়। তবে প্রতীক্ষার চেয়ে অপেক্ষার ব্যবহার ব্যাপক। শব্দদ্বয়ের পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে, গভীরভাবে নিরীক্ষণ না করলে পার্থক্য অনুধাবন করা অসম্ভব। উদাহরণ অপেক্ষার যন্ত্রণা প্রতীক্ষার প্রহর/ প্রতীক্ষার অবসান অপেক্ষার নহর। সূক্ষ্ম পার্থক্যটি কী তা আরও বিশদ করা যায় প্রতীক্ষা অর্থে যা ঘটতে পারে সে বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করা। যেমন—অধীরচিত্তে বসিয়া যুবক প্রেয়সীর প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষার সময় সাধারণত অপেক্ষার সময় থেকে দীর্ঘতর। যেমন—তোমার জন্য দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। প্রতীক্ষার অবসান হয় না গো সখী। ধৈর্য, নির্ভরতা, কারণ, শঙ্কা প্রভৃতি অর্থেও অপেক্ষা ব্যবহৃত হয়। যেমন—অপেক্ষা সফলতার সেতু। বৃষ্টির অপেক্ষায় কৃষিকাজ বন্ধ। অপেক্ষার যন্ত্রণা মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে ভয়াবহ।

প্রদক্ষিণ

‘প্রদক্ষিণ’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ—কোনো কিছুর চারপাশে ভ্রমণ বা পরিভ্রমণ, বিভিন্ন রাস্তা ঘোরা প্রভৃতি। যেমন—পৃথিবী সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। ‘প্রদক্ষিণ’ সংস্কৃত হতে বাংলায় এসেছে। এর ব্যাকরণগত অর্থ হলো—প্রতিমা বা পূজনীয় ব্যক্তিকে দক্ষিণ বা ডান দিকে রেখে তার চারপাশে পরিভ্রমণ। এটি হিন্দুধর্মের একটি আচরণ বা নিয়ম। এ হিসেবে এটি একটি ধর্মীয় শব্দ। কিন্তু বাংলায় এসে ‘প্রদক্ষিণ’ শুধু অর্থই হারিয়ে ফেলেনি, সঙ্গে সে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দে পরিণত হয়েছে। আজকাল প্রদক্ষিণ যেভাবে করা হোক না কেন, তার মধ্যে ধর্মের চেয়ে কিন্তু বিজ্ঞান তথা বাস্তব কার্যকরণ অনেক বেশি। ‘ডাক্তারের নির্দেশে তিনি সকালবেলা পাশের মাঠটি তিনবার প্রদক্ষিণ করেন।’ এ বাক্যে ধর্মের বালাই নেই। যা আছে তা কার্যকরণগত ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত।

প্রফুল্ল

শব্দটির আভিধানিক ও মূল অর্থ হাস্যময়, উল্লাসিত, প্রসন্ন, সহাস্য, আনন্দিত। ‘প্রফুল্ল’ শব্দের আদি ও মূল অর্থ—প্রস্ফুটিত। যা প্রকৃষ্টরূপে ফুটেছে তা-ই প্রফুল্ল। একসময় শব্দটি ফুল ফোটার, ফোটা ফুলের বিবরণ প্রদান প্রভৃতি কাব্যিক শব্দ হিসেবে বাগানে সীমাবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের গানেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—

প্রফুল্লকদম্ব বন—। শব্দটি এখন বাগানে আর নেই। এখন এর অর্থ—প্রসন্ন, সহাস্য, আনন্দিত এবং বদন, চিত্ত, মন প্রভৃতির আনন্দঘন প্রসন্নতা বোঝাতে 'প্রফুল্ল' শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন— প্রফুল্লচিত্ত, প্রফুল্লবদন, শান্তিজুড়ে চিত্তবদন। ফুল ও বাগানের সঙ্গে জন্মগত সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদের সেই দারুণ 'প্রফুল্ল' কখন কোন ফাঁকে বাগান ছেড়ে মানুষের হৃদয়, মন ও চিত্ত-বদনকে উৎফুল্লময় করে দেওয়ার জন্য উঠে এসেছে। প্রফুল্ল হয়তো বুঝতে পেরেছিল একদিন বাগানের সংখ্যা কমে যাবে। বাগান থাকলেও মানুষ আর বাগানে ফুল দেখতে যাবে না। বরং ফুলকে কেটে, জীবননাশ করে ঘরে এনে উপভোগ, দুঃখিত, ধর্ষণ করবে। হায়রে প্রফুল্ল, তুমি বড় বুদ্ধিমান; বাগান ছেড়ে দিয়ে বদন আর চিত্তে চলে আসায় ঘরে বসে তুমি ফুলের সুবাস নিতে পারছ।

প্রবন্ধ

সংস্কৃত ভাষায় 'প্রবন্ধ' শব্দের সাধারণ অর্থ 'উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা', কিন্তু বাংলায় শব্দটির অর্থ essay বা রচনা। 'প্রবন্ধ' শব্দের মূলানুগ অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন যার', বাংলায় রচনা মাত্রই 'প্রবন্ধ' (আলগোছে তফাতে থেকে সমালোচনা প্রবন্ধে একটু-আধটু ঠোকর দেয় অনেকেই—অনুকরণ না হনুকরণ—সৈয়দ মুজতবা আলী)। সংস্কৃত ভাষায় 'নিবন্ধ' শব্দটি অদৃষ্ট, ভাগ্যের লিখন, নিমিত্ত এরূপ অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। একই অর্থে বাংলায়ও প্রয়োগ আছে। যেমন, 'নিবন্ধ খণ্ডাইতে পারে শকতি কাহার'—দৌলত উজির বাহরাম খান।

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ শব্দদ্বয় আজকাল অনেকটা অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের ব্যুৎপত্তি ও প্রায়োগিক পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃষ্ট বন্ধন যার সেটি 'প্রবন্ধ'। এখানে সংশ্লিষ্টতা পরম্পরায় প্রবন্ধের বিস্তৃতি ও গভীরতা অসীম। নির্দিষ্ট বন্ধন যার সেটি 'নিবন্ধ'। প্রকৃষ্টতার উল্লেখ না থাকলেও নিবন্ধ প্রকৃষ্ট বন্ধনঘটিত অপেক্ষাকৃত স্বল্প অবয়বের একটি প্রবন্ধ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বন্ধনযুক্ত প্রবন্ধই নিবন্ধ। যেখানে লেখক একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে নিজের প্রকৃষ্ট বিচরণ প্রকম্পিত রাখেন। নিবন্ধের নির্দিষ্টতা এর বন্ধন, বিস্তৃতি ও গভীরতাকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রেরণা যোগায়। যদিও এটি কেবল বিস্তারভিত্তিক নয়; বরং বিশ্লেষণ যৌক্তিকতার আদলভিত্তিক। 'প্রবন্ধ' একটি বিষয়কে যতটুক বিস্তৃত বিশ্লেষণে তুলে ধরে 'নিবন্ধ' তা করে না। ঠিক উপন্যাস আর বড় গল্পের মতো। নিবন্ধে নির্ধারিত বিষয়কে তুলে ধরার জায়গা সীমিত। তাই অল্পকথায় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তুলে ধরা প্রয়োজন।

প্রবন্ধে 'প্র' উপসর্গ, নিবন্ধে 'নি' উপসর্গ বসেছে। আকারে প্রবন্ধ বড় হবে, নিবন্ধ ছোট হবে। যেমন—রচনা ও প্যারাগ্রাফ-এর পার্থক্যের মতো। লেখার সময় 'প্রবন্ধ' রচনায় তথ্য প্রদান করা হবে, প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনায় আনা যাবে, অপরদিকে 'নিবন্ধে' নিজের চিন্তায় নিজেকে বিষয়ের মধ্যে আটকে রাখতে হবে।

নিবন্ধের চেয়ে প্রবন্ধের গণ্ডি বড়। নিবন্ধ প্রধানত জার্নাল নির্ভর। জার্নালটি যে বিষয়ভিত্তিক, সাধারণত জার্নালভুক্ত নিবন্ধগুলো সেই নির্দিষ্ট বিষয়েরই হয়ে থাকে। প্রবন্ধের চেয়ে নিবন্ধ সুনির্দিষ্ট, গভীর, বিশ্লেষণধর্মী। বস্তুত কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী লেখাই 'নিবন্ধ'। এর সঙ্গে বর্ণনা যোগ করা হলে তা হয় 'প্রবন্ধ'। সব নিবন্ধ প্রবন্ধ নয়, তবে সব প্রবন্ধই নিবন্ধ।

প্রবাদ ও প্রবচন

'বদ' ধাতু নিষ্পন্ন 'বাদ' শব্দের পূর্বে 'প্র' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'প্রবাদ' এবং 'বচ' ধাতু নিষ্পন্ন 'বচন' শব্দের পূর্বে একই উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'প্রবচন' শব্দের উৎপত্তি। 'বদ' ও 'বচ' উভয় ধাতুরই অর্থ—বলা। 'বাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—উক্তি, কথন, বাক্য। অন্যদিকে বচন শব্দের আভিধানিক অর্থও—কথা, বাক্য, উক্তি। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিবেচনায় 'প্রবাদ' ও 'প্রবচন'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু উভয়ের প্রায়োগিক-রূপে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রবাদ ও প্রবচন-রূপে যে সব রচনা পাওয়া যায় সেগুলো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে এ পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রবাদ ব্যঞ্জনানির্ভর কিন্তু প্রবচন বাচ্যনির্ভর। মূলত এটিই উভয়ের মূল পার্থক্য। চয়নসূত্রে প্রবাদের একটি বাচ্যার্থ

থাকে কিন্তু প্রবাদটি প্রকৃতপক্ষে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না; ব্যঞ্জনার্থেই ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ 'ছাড় কড়ি মাখ তেল'—প্রবাদটির কথা উল্লেখ করা যায়। বাক্যটির সাধারণ অর্থ 'তেল গায়ে মাখতে হলে টাকা দিয়ে কিনতে হয়'। কিন্তু প্রবাদটি যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন সাধরণ অর্থ লোপ পেয়ে গূঢ়ার্থই কেবল প্রকাশ পায়। এর গূঢ়ার্থ হচ্ছে : অর্থ ছাড়া কিছু হয় না বা কিছুই পাওয়া যায় না।

'যম, জামাই, ভাগনা—এ তিন নয় আপনা।' এটি একটি প্রবচন। কেন প্রবচন তা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। যম মানুষের জীবন নিয়ে যায়, কাউকে কোনো অবস্থায় ছাড়ে না। অন্যদিকে গৃহে জামাতার আগমন কিংবা ভাগ্নের অবস্থান দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে বোঝাস্বরূপ। তবু তাদের কাউকে অবহেলা করা যায় না। বাধ্য হয়ে তাদের জন্য খরচ করতে হয়, আপ্যায়ন করতে হয় কিন্তু শত খরচ করার পরও কোনো প্রতিদান বা সুনাম পাওয় যায় না, বরং তারা আরও বেশি চেয়ে বসে, আরও দিতে হয়। জীবন ও সংসারের এরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বাক্যটি রচিত। এটি প্রবচন, কারণ এর কোনো রূপকধর্ম নেই, সরাসরি অর্থ আছে। 'প্রবাদ' ও 'প্রবচনে'র আর একটি পার্থক্য হলো সাধারণত প্রবাদের চেয়ে প্রবচন আকারে বড় হয়। তবে সবসময় যে বড় হবে এমন কথা নেই। প্রবাদ অজ্ঞাতপরিচয় সাধারণ মানুষের লোকপরম্পরাগত সৃষ্টি। অন্যদিকে কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল বিজ্ঞজনই প্রবচনের স্রষ্টা। এককথায় প্রবাদ লোক-অভিজ্ঞতার ফসল, অন্যদিকে প্রবচন ব্যক্তিমনীষার সৃষ্টি। প্রবচনের আধুনিক প্রতিশব্দ 'সুভাষণ'।

তবে বাগধারা হচ্ছে অর্থবোধক শব্দসমষ্টি। বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেক শব্দের পৃথক অর্থ থাকে, কিন্তু বাগধারার অন্তর্গত অর্থবোধক শব্দগুলো সম্মিলিতভাবে একটি অখণ্ড শব্দের ন্যায় অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

প্রবীণ

শব্দটির প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ—বয়োবৃদ্ধ, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, বর্ষীয়ান, জ্ঞানী প্রভৃতি। তবে এর আদি অর্থ এমন ছিল না। প্রবীণ শব্দের আদি, মূল ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—বীণাবাদনে প্রকৃষ্ট অর্থাৎ যিনি নিপুণ ও কুশলী হাতে বীণা বাজাতে পারেন। কালক্রমে শব্দটির অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এর যথেষ্ট কারণ আছে। যন্ত্রসংগীতের মধ্যে বীণা যেমন প্রাচীন, তেমনি ঐতিহ্যবাহী। এটার সঙ্গে হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রসঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এটি ভালোভাবে রপ্ত করতে হলে দীর্ঘ অনুশীলনের প্রয়োজন। দীর্ঘ অনুশীলন সময়ের ব্যাপার। এমন করতে হলে মানুষ যেমন বৃদ্ধ হয়ে যায় তেমনি হয়ে ওঠে দক্ষ। তাই এখন প্রাক্তন বীণাবদক তথা প্রবীণ শব্দের আভিধানিক অর্থ—বিজ্ঞ, নিপুণ, কুশলী, বহুদর্শী, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন, বয়োবৃদ্ধ ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে। বীণা-বাদনে দক্ষ হতে হলে কুশলী, নিপুণ ও বহুদর্শী না-হয়ে কোনো উপায় থাকে না। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ভার, শরীরের রোগ, পার্থিব নানা সমস্যা বেড়ে যায়। তবু যারা দীর্ঘকাল এসব উপেক্ষা করে বীণা বাদন শিক্ষা নিয়ে পড়ে থাকেন তাঁরা নিশ্চয় বহুদর্শীও বটে। তাই বীণাবাদনে প্রকৃষ্ট বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহার হতো তা এখন আধুনিক যুগে 'প্রবীণ' অর্থে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্রয়

'প্রশ্রয়' একটি ভালোবাসাপ্রসূত অর্ধ-নেতিবাচক শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ—আশকারা, লাই, অনাবশ্যক আদর ইত্যাদি। এসব অর্থ প্রকাশে 'প্রশ্রয়' শব্দটি সবচেয়ে বেশি আশকারা পেয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে শব্দটির ব্যুৎপত্তি, প্রয়োগ ও হৃদ্যতাপ্রসূত ঝাল-সম সামান্য নেতিবাচকতা। সংস্কৃত হতে বাংলায় অতিথি হিসাবে আগত 'প্রশ্রয়' শব্দটির মূল, আদি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ছিল সম্মান, শ্রদ্ধা, বিনয় প্রভৃতি। বাংলায় এসে সংস্কৃত 'প্রশ্রয়' শব্দটির অর্থের বাহ্যিক রূপের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। তবে অন্তর্নিহিত রূপের পরিবর্তন বিন্দুমাত্র ঘটেনি। যাকে সম্মান করা হয়, মর্যাদা দেওয়া হয় সে ক্রমশ মর্যাদা পেতে পেতে বেয়াড়া হয়ে ওঠে। কারও প্রতি বিনয় দেখালে সে অনেক সময় এটাকে ভুল বুঝে, ভয় মনে করে অশালীন আচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এ জন্য বলা হয়

‘বানরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে’। সম্মান, মর্যাদা, বিনয় মানুষের ব্যবহারকে লাই দিয়ে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে বলে সংস্কৃত ‘সম্মান’-এর প্রতিশব্দ ‘বিশ্বাস’ বাংলায় এসে আশকারা শব্দের প্রতিশব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। এ অনুষঙ্গে প্রশ্রয় শব্দটি নিজের অজান্তে নিজেকে নিজে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের মূল অর্থই হারিয়ে বসেছে।

প্রায়

‘প্রায়’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ—সাধারণত, সচরাচর, ঘন ঘন, বারংবার, কাছাকাছি প্রভৃতি। তবে এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাপূর্বক অনশন-মৃত্যু, মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায় আমৃত্যু অনশন, প্রাচুর্য ও বাহুল্য প্রভৃতি। তাহলে কেন শব্দটি এমন ব্যাপক অর্থ-পরিবর্তন করল? এর কি আসলেই কোনো যৌক্তিক কারণ আছে? অনেকে ইচ্ছাপূর্বক আমৃত্যু অনশন করেছে কিন্তু খুব কম সংখ্যক মানুষই মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ আমৃত্যু অনশনকারী যখন খাবার অভাবে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যায় তখন তার আর স্বাভাবিক জ্ঞানবোধ থাকে না। তখন প্রশাসন তার শরীরে বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করে কিংবা অন্যভাবে খাইয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। আবার অনেকে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না-পেরে মৃত্যুর কাছাকাছি গেলে আত্মীয়স্বজন বা শুভার্থীদের অনুরোধে খাবার গ্রহণ করে। এমন ঘটনা সাধারণত, সচরাচর এবং ঘন ঘন ও বারংবার ঘটতে দেখা যায়। মূলত এ অনুষঙ্গে মৃত্যু-ইচ্ছায় অনশনকারীরা মৃত্যুর কাছাকাছি থেকে ফেরত আসে বলে ‘প্রায়’ শব্দটির অর্থ পরিবর্তন হয়ে এমন অর্থ ধারণ করেছে।

প্রেক্ষিত/পরিপ্রেক্ষিত

‘পরিপ্রেক্ষিত’ ও ‘প্রেক্ষিত’ শব্দের তফাত আকাশ-পাতাল। তবু অনেকে ‘পরিপ্রেক্ষিত’ অর্থে ‘প্রেক্ষিত’ শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। ‘প্রেক্ষিত’ শব্দ হতে ‘প্রেক্ষণ’ শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ ‘দৃষ্টি’। ‘প্রেক্ষিত’ প্রেক্ষণ শব্দের বিশেষণ। এর অর্থ, যা দর্শন করা হয়েছে। প্রেক্ষণীয় শব্দের অর্থ ‘যা দেখা উচিত বা যা দেখা হবে’। 'Perspective' বা 'Background' অর্থে ‘প্রেক্ষিত’ লেখা ভুল। 'Perspective' বা 'Background' অর্থে ‘পরিপ্রেক্ষিত’ লিখুন, কখনো ‘প্রেক্ষিত’ লিখবেন না।

প্লুতো

‘প্লুত’ (প্লুতো) শব্দের অর্থ প্লাবিত (বিশেষণ) কিংবা সম্পূর্ণ সিক্ত বা ভেজা। অশ্বের স্বচ্ছন্দ চলার গতি বা লম্ফ দিয়ে গমনকারী জীব অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। বাংলা ব্যাকরণে একসময়ে পড়েছিলাম প্লুতো স্বরের কথা—আজকাল আর তা চোখে পড়ে না। দূরাহ্বানের সময় কিংবা রোদনের সময় টেনে টেনে যে স্বর প্রলম্বিত করা হয় তাকেই ‘প্লুতো স্বর’ বলা হয়। বাচ্চারা যখন কাঁদে তখন তারা টেনে টেনে স্বরকে প্রলম্বিত করে। যেমন—‘আমাকে গাড়ি কিনে দাও-ও-ও-ও।’ কিংবা ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে কুবের মাঝির হাঁক দূরের নৌকার মাঝিকে লক্ষ করে—“যদু হে-এ-এ-এ... মাছ কিবা।” সেদিনের ইলিশ মাছের দাম জানার প্রত্যাশায় দূরে অবস্থানরত যদুকে কুবেরের এই প্রশ্ন। এগুলো হচ্ছে প্লুত/ প্লুতো স্বর।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ফ

ফতুর

'ফতুর' শব্দের আভিধানিক অর্থ—রিক্ত, নিঃশেষ, শূন্য, নিঃস্ব, অসহায় প্রভৃতি। এটি আরবি শব্দ। আরবি 'ফুতুর' শব্দ থেকে বাংলা 'ফতুর' শব্দের উৎপত্তি। আরবি 'ফুতুর' শব্দের প্রয়োগ ও অর্থ দুটোই শরীর-সম্পর্কিত। আরবি ভাষায় শব্দটির অর্থ—দুর্বলতা, অবসন্নতা, অলসতা, আলস্য, নির্জীবতা প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় 'ফতুর' শব্দটির প্রয়োগ ও অর্থ শুধু শরীর সম্পর্কিত নয়, বরং পার্থিব সম্পদ সম্পর্কিত নিঃস্বতা প্রকাশে অধিক প্রয়োগ দেখা যায়। আরবি 'ফুতুর' শব্দের প্রসঙ্গে শরীর দুর্বল হলে যেমন মানুষের সবকিছুতে অসহায়ত্বের সূচনা ঘটে; তেমিন বাংলা 'ফতুর' শব্দের প্রসঙ্গে সহায়-সম্পদে ব্যক্তিবিশেষ রিক্ত হলে তার সবকিছুতে অসহায়ত্বের অনুপ্রবেশ দেখা যায়। তাই 'ফতুর' শব্দটি আরবি ভাষা হতে বাংলায় মেহমান হয়ে এলেও তার বাহ্যিক কিংবা অন্তর্নিহিত কোনো অর্থের বিপর্যয় ঘটায়নি। বরং আরও প্রসারিত করেছে।

ফলশ্রুতি

'ফলশ্রুতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'পুণ্যকর্মের ফলাফলের বিবরণ শ্রবণ করা'। ফল আর শ্রুতি মিলে 'ফলশ্রুতি' শব্দের উৎপত্তি। এটাতেও বোঝা যায় ফলশ্রুতি শব্দের অর্থ ফল-শ্রবণ। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহে যে অর্থে 'ফলশ্রুতি' লেখা হচ্ছে তা ভুল। 'ফলশ্রুতি' বা পাপ-পুণ্যের 'ফলাফল বিবরণ' লিখবেন না। ফলাফল, ফল, পরিণতি, পরিণাম ইত্যাদি অর্থবোধক ও মাধুর্যমণ্ডিত শব্দ ব্যবহার করুন।

ফল্গুধারা

ফল্গুধারা শব্দটির অর্থ—'যে প্রবাহ বা ধারা বাইরে প্রকাশিত নয়'। ফল্গু একটি নদীর নাম। ভারতের বিহার রাজ্যের গয়ার মধ্য দিয়ে এটি প্রবাহিত। পবিত্রতার জন্য ফল্গু নদী হিসেবে বিখ্যাত। গ্রীষ্মকালে নদীটার বৃহদংশ একেবারেই শুকিয়ে যায়। কিন্তু বালি কিছুটা খুঁড়লেই জলের সন্ধান পাওয়া যায়। এ জন্য ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা অর্থাৎ মাটির নিচ দিয়ে প্রবাহিত বলে খ্যাত। ভারতীয় পুরাণে রামের পত্নী সীতার অভিশাপে ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা হয়ে যায়। ফল্গু নদীর এ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে ফল্গু নদীর ধারা সংবেদনশীল বাঙালি মনের বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়। অনেকের স্নেহ-মমতা ফল্গুধারার মতো। বাইরে তার প্রকাশ নেই। আবার অনেকের মনে অসহনীয় বেদনা ফল্গুধারার মতো বহমান কিন্তু বাইরে প্রকাশ নেই।

ফাইফরমাশ

বহুল প্রচলিত 'ফাইফরমাশ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ছোটখাটো কার্জকর্ম করা, অস্থায়ীভাবে কোনো ছোট কাজ করা, স্বল্প মজুরিতে কারও ছোটখাটো আদেশ-নির্দেশ পালন করা প্রভৃতি। আরবি 'ফাহিশ' এবং ফারসি 'ফরমাশ' শব্দের মিলনে বাংলা ফাইফরমাশ শব্দের জন্ম। আরবি 'ফাহিশ' শব্দের অর্থ—অশ্লীল, কদর্য, খারাপ এবং ফারসি 'ফরমাশ' শব্দের অর্থ—আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি। সুতরাং ফাহিশফরমাশ > ফাইফরমাশ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে—অশ্লীল বা কদর্য বা খারাপ কাজের আদেশ। তবে বাংলায় 'ফাইফরমাশ' শব্দটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয় না। এখানে অশ্লীল বা কদর্য বা খারাপ কাজ বোঝাতে ছোটখাটো কাজ করাকে বা কাজ করার আদেশ প্রদানকে বোঝায়। বাংলায় ব্যবহৃত 'ফাইফরমাশ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা-ই হোক না কেন, এখানে অশ্লীল কিছু নেই। সবাই কিছু না কিছু ফাইফরমাশ খাটেন, কেউ মনিবের, কেউ পিতামাতার, কেউ-বা তার প্রিয়জনের নতুবা শ্রদ্ধেয় জনের। বউয়ের ফাইফরমাশ খাটে না, এমন লোক পাওয়া

মুশকিল। অফিসের বসের ফাইফরমাশও সবাইকে খাটতে হয়, বসবিহীন লোক কি আছে শুধু বেকার ছাড়া!

ফাঁকতাল

'ফাঁকতাল' শব্দের আভিধানিক অর্থ—সুযোগ, সুবিধা, অনুকূল সময়, সুবিধাজনক অবস্থান প্রভৃতি। এটি সংগীতশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। সংগীত করার সময় তালের যে অঙ্গে প্রস্বন বা ঝোঁক পড়ে না সে অঙ্গটিকে 'ফাঁকতাল' বলা হয়। তালের অঙ্কে শূন্য (০) দেখিয়ে স্বরলিপি বা তাললিপিতে কোথায় ফাঁকতাল হবে তা নির্দেশ করা হয়। ফাঁকতালের শূন্য নির্দেশের স্থানটিই তালের ক্ষণিক অবসর। এ অবসরকে বাংলা বাগভঙ্গিতে 'কথাবার্তায়' সুযোগ অর্থ প্রকাশে ব্যবহার করা হয়। সংগীতশিল্পীরা দীর্ঘ সাধনায় অর্জিত অপূর্ব কৌশলকে সংগীতের ফাঁকতাল সামাল দেন। ঠিক তেমনি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনেও কখন কীভাবে ফাঁকতালকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে প্রত্যাশিত সিদ্ধি অর্জন করা যায় তা-ও কৌশলে অর্জন করতে হয়।

ফাতরা

'ফাতরা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—অপ্রয়োজনীয়, নিষ্প্রয়োজন, মূল্যহীন, ধাপ্পাবাজ, বাজে, হালকা, খেলো, বাচাল, বিরক্তিকর প্রভৃতি। 'ফাতরা' কোনো বিদেশি ভাষা থেকে আসা শব্দ নয়। আমাদের বহুল পরিচিত কলাগাছ থেকে 'ফাতরা' শব্দের উৎপত্তি। কলাগাছের পাতা ধরে টান দিলে পাতার সঙ্গে ফড় ফড় শব্দে যে শুকনো বাকল উঠে আসে তাকে ফাতরা বলা হয়। কলাপাতা সংগ্রহের জন্য কলাগাছের পাতা ধরে টান দেওয়া হয় কিন্তু তৎসঙ্গে উঠে আসে অপ্রয়োজনীয় বস্তু—ফাতরা। শুধু তাই নয়, বাচালের মতো অর্থহীন ও ফড়ফড় বিশ্রী শব্দে সৃষ্টি করে বিরক্তি। কলাগাছ বেশ প্রয়োজনীয় কিন্তু ফাতরা কোনো কাজের বস্তু নয়। কলাপাতা একটি প্রয়োজনীয় বস্তু, তবে তার সঙ্গে লেগে থাকা 'ফাতরা' মূল্যহীন। কলাপাতাকে কাজে লাগাতে হলে তার সঙ্গে লেগে থাকা 'ফাতরা' কেটে ফেলতে হয়। ফাতরা পরিষ্কার করা যেমন সময়সাপেক্ষ তেমনি বিরক্তিকর। ফাতরার এ অপ্রয়োজনীয় অবস্থান ও অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যকেই বাংলায় 'ফাতরা' শব্দে তুলে ধরা হয়েছে। এ শব্দের মাধ্যমে কলাগাছের অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর 'ফাতরা' বড় ভীষণ যত্নের কলাগাছ থেকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নেমে এসেছে।

ফালতু/ফাতরা

'ফালতু' শব্দের অর্থ—ফাতরা, অপ্রয়োজনীয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত, বেকার, অর্থহীন, অনুপযোগী, অনাবশ্যক, না-হলেও চলে প্রভৃতি। হিন্দি 'ফালতু' শব্দ বাংলায় এসে 'ফাতরা' শব্দের স্থান ও অর্থ দখল করে নিয়েছে। 'ফাতরা' শব্দের আভিধানিক অর্থও 'ফালতু'র অনুরূপ। কলাগাছ থেকে 'ফাতরা' শব্দের উৎপত্তি। কলাগাছের পাতা ধরে টান দিলে পাতার সঙ্গে ফড় ফড় শব্দে যে শুকনো বাকল উঠে আসে তাকে ফাতরা বলা হয়। কলাপাতা সংগ্রহের জন্য কলাগাছের পাতা ধরে টান দেওয়া হয় কিন্তু তৎসঙ্গে উঠে আসে তুলনামূলকভাবে অপ্রয়োজনীয় বস্তু ফাতরা—ফতফত শব্দ করে। কলাগাছ বেশ প্রয়োজনীয় কিন্তু তার তুলনায় ফাতরা অপ্রয়োজনীয়। ফাতরা পরিষ্কার করা যেমন সময়ক্ষেপক তেমনি বিরক্তিকর। ফাতরার এ অপ্রয়োজনীয় অবস্থান ও অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যকেই বাংলায় 'ফাতরা' শব্দে তুলে ধরা হয়েছে।

ফিরিঙ্গি

পর্তুগিজ শব্দ ফ্রান্সেস (Frances) থেকে 'ফিরিঙ্গি' শব্দের উদ্ভব। শব্দটি দিয়ে যেকোনো ইউরোপীয় জাতি বোঝানো হতো। ইংরেজিতে ফিরিঙ্গি শব্দের চারটি বানান দেখা যায়। যেমন—feringi, firingi, feringee, feringhee. ফিরিঙ্গি শব্দের তিনটি মূল অর্থ রয়েছে। যথা পর্তুগিজ ও ভারতীয় মিশ্রণজাত জাতি, ইউরেশিয়ান

ও খ্রিস্টান। ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে ফিরিঙ্গি শব্দটি সম্মানার্থে ব্যবহৃত হতো। পরে ফিরিঙ্গি শব্দটি তুচ্ছার্থে বা নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে, ফরাসি franc হতে feringi, firingi, feringee, feringhee শব্দ চারটির উৎপত্তি। 'আরব ও পারসিকদিগের সঙ্গে প্যালেস্টাইন নিয়ে ধর্মযুদ্ধের (crusade) সময় ইউরোপের খ্রিস্টানগণ ফ্রাঙ্ক নামে অভিহিত হতেন। ওই সময় সকলের বোধগম্য এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়, এর নাম ছিল Lingua Franca বা ফ্রাঙ্ক ভাষা। পারসিক বা আরবগণ শব্দটিকে ফেরঙ্গ উচ্চারণ করতেন। এ ফেরঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ ফিরিঙ্গি। পাশ্চাত্য দেশ অর্থে ফিরঙ্গ দেশ, তদ্দেশবাসি ফিরিঙ্গি।' সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্যে 'ফিরঙ্গ' শব্দটি আছে। সুতরাং বলা যায়, ফিরিঙ্গি শব্দটি একেবারে নতুন নয়। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ও ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলে 'ফিরিঙ্গি' বলতে শুধু পর্তুগিজদের বোঝানো হয়েছে। পরে ইউরোপবাসীর সঙ্গে ভারতীয়দের মিশ্রণে সৃষ্ট সঙ্করজাতও 'ফিরিঙ্গি' নামে পরিচিতি পায়।

ফুলঝুরি

'ফুলঝুরি' শব্দের অর্থ—'বাগাড়ম্বর, অর্থহীন বাগ্বিস্তার, অলঙ্কারবহুল কথা' ইত্যাদি অর্থ প্রকাশে বাগভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়। মূলত কথা ও ফুলঝুরি শব্দ দুটোর মিলনে 'কথার ফুলঝুরি' বাগধারার উৎপত্তি। ফুলঝুরি একপ্রকার আতশবাজি। দেখতে অনেকটা আগরবাতির মতো। এটি হাতে ধরে আগুন দিলে স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে পুষ্পবৃষ্টির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফুলঝুরি নামের আতশবাজির এ বৈশিষ্ট্য থেকে 'কথার ফুলঝুরি' বাগধারার জন্ম। বক্তার মুখ দিয়ে কথার ফুলঝুরি ফুটতে পারে, লেখার মধ্যেও ফুলঝুরি থাকতে পারে। 'ফুলঝুরি' যেখান থেকেই ফুটুক তা অর্থহীন বাগবিস্তার ছাড়া কিছু নয়।

ফুলেল/ফুলের

'ফুলেল' শব্দের অর্থ—পুষ্পময় বা ফুলের মতো, কুসুমিত, মুগ্ধকর, ফুলের মতো রমণীয় বা মোহনীয়। কিন্তু 'ফুলের' শব্দের অর্থ— পুষ্পের। 'ফুলেল' বিশেষণ পদ, কিন্তু 'ফুলের' বিশেষ্য পদ। 'ফুলেল শুভেচ্ছা' অর্থ ফুলের মতো রমণীয় শুভেচ্ছা বা পুষ্পময় বা কুসুমিত শুভেচ্ছা। সুতরাং 'ফুলেল শুভেচ্ছা' হতে পারে কিংবা হতে পারে 'ফুলের মতো শুভেচ্ছা', কিন্তু 'ফুলের শুভেচ্ছা' হতে পারে না। কারও হাতে বই তুলে দিয়ে যেমন বলা যায় না 'বইয়ের শুভেচ্ছা' বা ক্রেস্ট তুলে দিয়ে 'ক্রেস্টের শুভেচ্ছা' জানালাম; তেমনি ফুল তুলে দিয়ে বলা যায় না 'ফুলের শুভেচ্ছা' জানালাম। 'ফুলেল' বিশেষণ পদ, রূপক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানের কোনো বিশেষ অংশ না বুঝিয়ে 'ফুলেল' শব্দ দ্বারা পুরো অনুষ্ঠানকে প্রকাশ করা হয়। ফুলের শুভেচ্ছা = ফুল + এর শুভ + ইচ্ছা। ফুলের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে না। কিন্তু, ফুলেল শুভেচ্ছা বলতে পুষ্পময়/পুষ্পিত ও শোভনীয় ইচ্ছা, যে ইচ্ছা আপনি যেকোনো প্রিয়জনের উদ্দেশে নিবেদন করতে পারেন। অনেকে 'ফুলেল' শব্দের পরিবর্তে 'ফুলল' শব্দও ব্যবহার করে থাকেন। বাংলা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধানেও 'ফুলেল' শব্দটি আছে। শব্দটি কিন্তু প্রমিত নয়, তেমন প্রচলিতও নয়।

ফোড়ন কাটা

'ফোড়ন কাটা' বাগভঙ্গির আভিধানিক অর্থ—কথার মধ্যে মন্তব্য করা, টিপ্পনী কাটা, বিরূপ মন্তব্য করা, বিব্রতকর কিছু বলা প্রভৃতি। রান্নাঘরে রান্নাবান্নার সময় তরকারিতে 'ফোড়ন দেওয়া' থেকে 'ফোড়ন কাটা' শব্দের উৎপত্তি। তরকারি সুস্বাদু করার জন্য গরম তেলের উপর জিরা, মরিচ, তেজপাতা প্রভৃতির সম্বরা দেওয়াকে 'ফোড়ন দেওয়া' বলা হয়। তবে তরকারির ফোড়ন আর বাগভঙ্গির ফোড়ন অভিন্ন নয়। বাংলা ভাষায় বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত 'ফোড়ন দেওয়া' অর্থ হলো দু-জনের বা দু-পক্ষের কথা বা আলোচনার মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তি

বা পক্ষের মন্তব্য করা। তরকারিতে ফোড়ন দিলে তরকারি সুস্বাদু হয় কিন্তু কথায় ফোড়ন কাটলে বক্তার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। তবে বক্তার মেজাজ গরম হয়ে উঠলেও কথায় ফোড়ন কাটলে অনেকে মজা পায়। তাই পরোক্ষভাবে 'তরকারির ফোড়ন' আর 'কথার ফোড়ন'-এর মধ্যে বেশ মিল রয়েছে।

ফ্যাঁকড়া

'ফ্যাঁকড়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ—ঝগড়া, ফ্যাসাদ, ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন, বাধা, ছলছাতুরী প্রভৃতি। গাছের ফ্যাঁকড়া হতে আলোচ্য অর্থ-সমৃদ্ধ ফ্যাঁকড়া শব্দের উৎপত্তি। গাছের উপশাখা বা ছোট ডালপালাকে 'ফ্যাঁকড়া' বলে। যত বড় গাছ তত বেশি ফ্যাঁকড়া। তবে সহজে ফ্যাঁকড়াকে ঝেড়ে ফেলা যায়। বড় প্রজাতির গাছের গুঁড়ির ফ্যাঁকড়া ছেঁটে না-দিলে গাছ কিন্তু ঠিকমতো লম্বা হতে পারে না। গাছের ফ্যাঁকড়া গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং সুষমমন্ডিত বিস্তারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এমনকি অনেক ছোট লতাগুল্মেও ফ্যাঁকড়া ছেঁটে দিতে হয়, নইলে আশানুরূপ শস্য পাওয়া যায় না। কোনো কাজ, পরিকল্পনা কিংবা প্রকল্প বা কার্যে ফ্যাঁকড়া লাগলে তাহলে গাছের ফ্যাঁকড়ার মতো আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ 'ফ্যাঁকড়া' কাজের স্বাভাবিক বিকাশ-প্রসারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ জন্য ফ্যাঁকড়া ছেঁটে ফেলতে হয়। এ শব্দ থেকে চন্দ্রবিন্দু-সহযোগে ফ্যাঁকড়া কথার উৎপত্তি।

ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব

বাগভঙ্গিটির আভিধানিক অর্থ—এমন ভয়ঙ্কর কিছু যা যে-ব্যক্তি সৃষ্টি করেছে সে-ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, নিয়ন্ত্রণহীন বিষয়, নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তি, নিয়ন্ত্রহীন যন্ত্র, যে নির্মাতাকেও গ্রাহ্য করে না প্রভৃতি। ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব বলতে সাধারণভাবে তাকে বোঝানো হয় যা নিয়ন্ত্রণহীন এক ভয়ঙ্কর সৃষ্টি, যে তার স্বার্থের কারণে প্রয়োজন হলে নিজের স্রষ্টাকেও অবলীলায় হত্যা করে ফেলে। ইংরেজি ভাষা হতে 'ফ্রাংকেনস্টাইন' শব্দটি বাংলায় কৃতঋণ শব্দ হিসেবে নিজের আসন পাকা করে নিয়েছে। ইংরেজ রোম্যান্টিক কবি পি. বি. শেলির স্ত্রী মেরি শেলি শব্দটির স্রষ্টা। মেরি শেলির লেখা 'ফ্রাংকেনস্টাইন অব দ্য মডার্ন প্রমিথিউস' উপন্যাসের ভয়ঙ্কর চরিত্র 'ফ্রাংকেনস্টাইন' হতে শব্দটির উৎপত্তি। এ উপন্যাসের মূল চরিত্র ফ্রাংকেনস্টাইন একজন খ্যাতিমান ডাক্তার, যিনি গবেষণার মাধ্যমে প্রাণ-সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি মৃত মানুষের হাড়গোড়, লোহালক্কড় প্রভৃতি দিয়ে নির্মিত একটি ভয়ঙ্কর দানবীয় মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করেন। ফ্রাংকেনস্টাইনের সৃষ্ট এ দানবটি ছিল যেমন বিকট তেমন ভয়ঙ্কর। তাই কেউ তাকে পছন্দ করত না, সে ছিল নিঃসঙ্গ, সবসময় বিষণ্ন থাকত। নানা কারণে ফ্রাংকেনস্টাইন ও তার সৃষ্ট দানবের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। দানব চারপাশের সকল বিষয়ে প্রচণ্ড বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। সে প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর ও নৃশংস হয়ে ওঠে। ফ্রাংকেনস্টাইন তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় সে নিজেকে ধ্বংস করার পূর্বে তার স্রষ্টা ডাক্তার ফ্রাংকেনস্টাইনকেও হত্যা করে ফেলে।

বিংশ অধ্যায়

ব

বকধার্মিক

ভারতীয় পুরাণের একটি কথোপকথন থেকে 'বকধার্মিক' বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ—কপট সাধু, ভদ্রবেশী-অভদ্র প্রভৃতি। এবার বাগভঙ্গিটির উৎস নিয়ে আলোচনা করা যাক। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বনবাসকালে একদিন পম্পা সরোবরের তীরে ভ্রমণ করছিলেন। তখন ওই পম্পা সরোবরের তীর-নিকটবর্তী অগভীর জলে এক শ্বেতশুভ্র বককে খুব সন্তর্পণে ধীর পায়ে হাঁটতে দেখে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বললেন

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ প্রাণীনাং বধ শঙ্কয়া।

পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্মিক ॥

অর্থাৎ, "হে লক্ষ্মণ, দেখ, এই পম্পা সরোবরের জলে বসবাসরত কোনো জীব মরে যেতে পারে এমন শঙ্কায় বক কেমন অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করছে, অতএব বোধ হচ্ছে বক পরম ধার্মিক।"

রামচন্দ্রের সমস্ত দায়ভার ছিল লক্ষ্মণের হাতে। অগ্রজ রামচন্দ্রের আজ্ঞায় তাঁর জীবন-ধারণের উপযোগী সকল কাজ লক্ষ্মণই সম্পন্ন করেন, তাই তাঁর বাস্তবিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছিল অধিক। তিনি রামচন্দ্রকে বললেন

ন জানাসি রাঘব ত্বং বকঃ পরম দারুণঃ।

নির্জীব ভক্ষকো গৃধ্রঃ সজীব ভক্ষকো বকঃ ॥

অর্থাৎ, "হে রাঘব, আপনি জানেন না যে এ শুভ্রকান্তি বক, ধার্মিক তো নয়ই, বরং অতিশয় নিষ্ঠুর, কেননা, ভয়ঙ্কর চেহারার গৃধ্র বা শকুন দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও, তারা একমাত্র মৃত প্রাণীই ভক্ষণ করে, কিন্তু সুন্দর চেহারার বক সজীব অর্থাৎ জীবন্ত মাছকেই নিষ্ঠুরভাবে ভক্ষণ করে।"

বক মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে এক পা তুলে বিলে-ঝিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন তাকে দেখে মনে হয় কোনো সাধু একাগ্রচিত্তে কঠোর তপস্যায় মগ্ন। সাধুর মতো তপস্যায় মগ্ন দেখালেও বকের আসল উদ্দেশ্য মাছ-শিকার। মাছ নাগালে আসামাত্র তপঃবেশ ত্যাগ করে ঠোঁট চালিয়ে দেয় কঠোর নৃশংসতায়। অনুরূপ যারা ধার্মিক বেশে ভণ্ডামি বা কপটতায় নিজেদের নিয়োজিত রাখে তাদের বকের মাছ শিকারের তাগিদে সাধুর মতো দাঁড়িয়ে থাকার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

বদ্ধপরিকর

'বদ্ধপরিকর' শব্দের আভিধানিক অর্থ—দৃঢ়সংকল্প, কঠোর প্রতিজ্ঞা, ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রভৃতি। সংস্কৃত 'বদ্ধ' ও 'পরিকর' শব্দ হতে বদ্ধপরিকর শব্দের উৎপত্তি। বদ্ধ শব্দের অর্থ—বাঁধা আর পরিকর শব্দের অর্থ—কাপড়। সুতরাং বদ্ধপরিকর শব্দের অর্থ—কাপড় বাঁধা। কিন্তু সংস্কৃতজাত কাপড় বাঁধা বাংলায় এসে 'দৃঢ়সংকল্প' অর্থ ধারণ করেছে। মানুষ কাপড় পরে কাজ করে তবে কাপড় না-বেঁধে কেউ কাজ করতে পারে না। কাজ যত শ্রমসাধ্য, কঠিন ও বড় হবে কাপড় বাঁধার প্রকৃতিই তত শক্ত হবে। তাছাড়া কাপড় শক্ত করে না-বাঁধলে খুলে পড়ার সম্ভাবনা আছে। কৃষক মাঠে চাষ করা শুরু করার আগে এমন শক্তভাবে কাপড়কে বেঁধে নেয় যাতে পড়ে না যায়। কারণ কাজের মাঝখানে কাপড় পড়ে গেলে কাজের ব্যাঘাত ঘটবে। পর্বতারোহী, ডুবুরি থেকে শুরু করে সবাই কাজ শুরুর আগে শক্ত করে কাপড় বাঁধে। এ কাপড় বাঁধার ওপর কাজের ধরন, প্রকৃতি ও ইচ্ছা নির্ভরশীল। কেউ চায় না কাজের মাঝখানে বাধাগ্রস্ত হোক। ইদানীং মেয়েরাও পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন কাজ করছে। তাদের ক্ষেত্রে

কথাটা আরও সত্যি। কাপড় বেঁধে কাজ করতে হয়। 'কাপড় বাঁধা' কাজের ইচ্ছা, সংকল্প, অধ্যবসায় ও কঠোরতার ইঙ্গিত। তাই সংস্কৃত দৃঢ়সংকল্প বাংলায় কাপড় বাঁধা অর্থ ধারণ করেছে।

বধূ

বধূ শব্দের বর্তমান ও প্রচলিত অর্থ—বিবাহিত স্ত্রী, বিয়ের কনে, ছেলের বউ প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত শব্দ। 'বধূ' শব্দের মূল ও আদি অর্থ—'যে যুবকের মন বাঁধে'। বধূ ছাড়া আর কেউ যুবকের মন বাঁধতে পারে না। তাই তো উচ্ছল-উদ্বেল-সমুদ্র-চঞ্চলময় যুবকও বিয়ের পিঁড়িতে বসার পর নিরীহ ও গোবেচারা হয়ে যায়। যুবকের মন এমন শক্ত করে বধূ বেঁধে রাখে যে, তার আর নড়াচড়ার সুযোগ বলতে গেলে থাকেই না। বিয়ের আগে বধূ থাকে কনে, কনে হচ্ছে বাঁশির মতো সুরেলা মোহনীয় আবেশ। সে-কনে বধূ হওয়ায় বাঁশ হয়ে যুবককে লাশের মতো নির্জীব করে দেয়।

বরখাস্ত

'বরখাস্ত' ফারসি শব্দ। এর আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—চাকরিচ্যুত, ছাঁটাই, কর্মচ্যুত, অব্যাহতিপ্রাপ্ত। কর্ম থেকে বাধ্যতামূলক অব্যাহতিই মূলত 'বরখাস্ত'। ফারসি ভাষায় 'বরখাস্ত' শব্দের অর্থ—ছিল জেগে-ওঠা, ওপরে-ওঠা, অদৃশ্য হওয়া, বিলীন হওয়া, হারিয়ে-যাওয়া প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় অতিথি হয়ে এসে ফারসি 'বরখাস্ত' তার পূর্বের অর্থ হারিয়ে 'কর্মহীন' অর্থ প্রকাশে ডুবে গেছে। কিন্তু কেন এমন হলো? যার চাকরি আছে তার জীবন আসলেই নিরুদ্বিগ্ন। হাবাগোবার মতো সকালে অফিসে যায়, সন্ধ্যায় ফেরে এবং মাস শেষে বেতন নিয়ে জীবনধারণ করে। কোনোদিকে তার খেয়াল থাকে না, কোনো চিন্তা থাকে না, ঢেউহীন নদী তথা পুকুরের মতো জীবন প্রবাহিত হয়। কিন্তু এমন নিরুদ্বিগ্ন জীবনের আধার চাকরিটা চলে গেলে সে অস্থির হয়ে পড়ে। প্রবল আবেগে সারা শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। অনেকে আবার চাকরি হারানোর পর লজ্জা, সংকোচ বা চাকরির খোঁজে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। মূলত চাকরিচ্যুতির পর ব্যক্তির এমন আচরণের অনুষঙ্গে ফারসি জেগে উঠা বা অদৃশ্য হওয়া 'রখাস্ত' বাংলায় এসে চাকরিটা সত্যি সত্যি হারিয়ে জেগে উঠেছে। এখন সে বুঝতে পারছে পৃথিবীটা শুধু চাকরি নয়। জীবনের এক দ্বার বন্ধ হলে হাজার দ্বার খুলে যায়।

বরদা

বর + দাতা থেকে বরদাতা এবং বরদাতা থেকে বরদা। যিনি বর দান করেন তিনি বরদা। ভারতীয় পুরাণে বরদা নামের একজন দেবী আছেন। সরস্বতীকেও 'বরদা' বলা হয়। কারণ তিনি তাঁর ভক্তদের বর দেন।

বর্বর

'বর্বর' শব্দের আদি ও প্রকৃত অর্থ ছিল 'বিদেশি'। যার ভাষা বোঝা যায় না সে 'বর্বর'। বৈদেশিকরা দেশীয় রীতিনীতি, ধর্মপদ্ধতি ও শিষ্টাচার বিষয়ে যখন অজ্ঞ তখন তারা অবশ্যই দেশীয়দের কাছে বর্বর। উপমহাদেশে আর্যদের কাছে দেশীয়রাই ছিল বর্বর। কারণ দেশীয়রা আর্যদের ভাষা বুঝত না। বর-বর = বর্বর, প্রলাপার্থক অব্যয়। এ অব্যয় থেকে 'বর্বর' শব্দটির জন্ম। আরবিতেও এ অব্যয়টি সমার্থক। গ্রিক barbaros ও ল্যাটিন barbarous শব্দও 'বর্বর' শব্দের সঙ্গে সমার্থক এবং উচ্চারণগত দিকেও যথেষ্ট মিল রয়েছে। ইংরেজি barbarian শব্দটি গ্রিক বা ল্যাটিন থেকে গৃহীত। এর অর্থ foreigner। শেকসপিয়র তাঁর বিখ্যাত Cariolanus নাটকেও শব্দটি এ অর্থে ব্যবহার করেছেন। বাংলা 'অসভ্য' শব্দটি বর্বর শব্দের সমার্থক ও সহচর। তাহলে সভ্য কে? সভায় যিনি সাধু তিনি সভ্য এবং সভায় যিনি অসাধু তিনি অসভ্য। সভায় এখন যাদের সভ্য বলা হয় তাঁরা কি আসলেই সাধু?

বর্ষ

ভারতীয় পুরাণে বর্ষ শব্দের অর্থ—দেশ। পৃথিবীর বৃহৎ পর্বতশ্রেণির মধ্যে নয়টি বর্ষ রয়েছে। এ বৃহৎ নয় বর্ষ হচ্ছে : ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক, হিরণ্ময়, উত্তরকুরু, ইলাবর্ত, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমালা।

বশংবদ

'বশংবদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—অনুগত, অধীন, হুকুমের আওতায়, বশবর্তী প্রভৃতি। বশংবদ সংস্কৃত শব্দ। এর আদি ও মূল অর্থ দ্বারা এমন আচরণের ব্যক্তিকে নির্দেশ করত 'যিনি বলেন—আমি নিশ্চিত বশ'। মূলত যে পূর্ব থেকে অন্যের বশে বা অধীনে বা অনুগত হওয়ার নিশ্চিত ঘোষণা দিয়ে বসে আছে, সেই 'বশংবদ'। বাংলায় শব্দটির অর্থ-পরিবর্তন হয়নি। কারণ যিনি অনুগত, অধীন তিনিই তো বশংবদ। তবে এককালে সম্মানিত ব্যক্তি ও মুরব্বিদের চিঠি লেখার সময় চিঠির শেষে প্রেরক সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ 'বশংবদ' লিখত। পুরনো ব্যক্তিগত পত্রে এটি খুব দেখা যায়। এখন কিন্তু সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ শাব্দিক অর্থে দৃশ্যত বশংবদ লেখা না-হলেও চিঠিপত্রে কিন্তু বশংবদ রয়েই গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক পত্রে 'আপনার অনুগত' শব্দ এখন বশংবদের বাবা হয়ে অবস্থান করছে। কারণ অনুগত মানে বশংবদ এবং বশংবদ মানে অনুগত। অবশ্য এ অনুগত শব্দটি এখন প্রাচীন বশংবদ শব্দের ন্যায় সম্মান প্রদর্শনের জন্য লেখা হয়।

বসুমতী

পৃথিবীর অন্য নাম—বসুমতী। সুবর্ণ অগ্নির তেজে বসুমতীর সৃষ্টি। পৃথিবী এ সুবর্ণ বর্ণ ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় বসুমতী।

বস্তাপচা বুলি

'বস্তা' ও 'পচা' শব্দ দুটোর সমন্বয়ে 'বস্তাপচা' শব্দটির উৎপত্তি। বস্তা মানে থলে এবং পচা মানে নষ্ট। বস্তাপচা মানে বস্তায় পচা। বস্তায় রাখা বস্তু পচে গেলে তাকে বস্তাপচা বলা হয়। বস্তাপচা পণ্য সবসময় ফেলে দেওয়া হয় না। অনেক সময় তা বাজারে খুব সস্তা দরে বিক্রি করে দেওয়া হয়। অথবা রাস্তার পাশে ফুটপাথে ফেলে দেওয়া হয় এবং যে কেউ তা দেখে ও বিনা আয়েশে সংগ্রহ করতে পারে। বস্তাপচা শব্দের পাশে বুলি বসলে হয় বস্তাপচা বুলি। 'বুলি' শব্দের অর্থ—কথা। সুতরাং বস্তাপচা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে বস্তায় পচা বুলি। কিন্তু এর প্রায়োগিক অর্থ হচ্ছে—সস্তা কথা। অধিক ব্যবহারে যা সহজলভ্য হয়ে যায় তাকেও 'বস্তাপচা' বলা হয়। বস্তাপচা দ্রব্য যেমন সহজলভ্য ও প্রচুর। তেমনি যে সকল বাণী বা কথা যত্রতত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং অর্থও খুব হালকা সেগুলোই হচ্ছে 'বস্তাপচা বুলি'। বাংলা ছবি, নাটক ও আলাপ-আলোচনায় এটি একটি বহুল ব্যবহৃত কথা। যেমন— জীবন একটা রঙ্গমঞ্চ... মায়ের পায়ের নিচে...। কথাগুলো ভালো, তবু বস্তাপচা হলো কেন? তবে কি বেশি ব্যবহারে ভালোরও পচন হয়? হ্যাঁ, অধিক ব্যবহারে ভালো জিনিসের পচন হয় বৈকি।

বাজখাঁই

'বাজখাঁই' শব্দের অর্থ—গম্ভীর ও কর্কশ গলা বা কণ্ঠস্বর। কিন্তু এর ব্যুৎপত্তিগত ইতিহাস অন্যরকম—বাজবাহাদুর খাঁর গম্ভীর ও চড়া গলা। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মালব প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন বাজবাহাদুর খাঁ। গীতবাদ্যে তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। রাজকার্য অবহেলা করে তিনি সংগীত, নৃত্য প্রভৃতি কাজে অধিক সময় ব্যস্ত থাকতেন। বাজবাহাদুর খাঁ ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে একবার এবং ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আর একবার সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। অবশ্য দুইবারই তিনি হেরেছেন। শেষ জীবনে তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে সংগীত-সাধক হিসেবে স্থান পান। বাজবাহাদুরের কণ্ঠ ছিল যেমন চড়া তেমন গম্ভীর। তার এ চড়া ও

গম্ভীর গলা থেকে বাংলা ‘বাজখাঁই’ শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ।

বাটপাড়

‘বাটপাড়’ শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ প্রতারক, ভণ্ড, ঠক, শঠ প্রভৃতি। ‘বাট’ ও ‘পাড়’ শব্দ সহযোগে বাটপাড় শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃত বর্ত্ম থেকে বাংলায় বাট শব্দটি এসেছে। বাট শব্দের আভিধানিক অর্থ—পথ বা রাস্তা এবং ‘বাটপাড়’ শব্দের অর্থ তাই—যে বাটে পড়ে। বাটে পড়ে বাগভঙ্গির অর্থ হচ্ছে বাটে অর্থাৎ পথে আক্রমণ করে যে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। আগে পথে পথিক সেজে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অনেকে সহপথিকের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত। প্রতারণার মাধ্যমে হরণ করত বলে তারা ‘বাটপাড়’। এখনও বাটপাড় আছে। তবে বাটপাড় আর ছিনতাইকারী অভিন্ন নয়। ছিনতাইকারীরা জোরপূর্বক নিয়ে যায় কিন্তু বাটপাড়েরা নিয়ে যায় প্রতারণার মাধ্যমে। এ বিবেচনায় যারা সহযাত্রী সেজে নেশার দ্রব্য খাইয়ে সর্বস্ব হরণ করে নিয়ে যায় তারাও ‘বাটপাড়’।

বাৎস্যায়ন

মল্লিনাগ বাৎস্যায়ন ছিলেন এক বেদজ্ঞ ভারতীয় দার্শনিক। তিনি গুপ্তযুগে (চতুর্থ-ষষ্ঠ শতকে) বর্তমান ছিলেন। কামসূত্র ও গোতমের ন্যায়সূত্র গ্রন্থের টীকা ন্যায়সূত্রভাষ্য-এর রচয়িতা রূপে তাঁর নাম পাওয়া যায়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মল্লিনাগ বা মৃল্লান। বাৎস্যায়ন ছিল তাঁর বংশনাম বা পদবি।

তাঁর রচনায় আছে, কুন্তলরাজ সাতকর্ণী সাতবাহন কামান্ধ হয়ে কর্তারি নামক অস্ত্রের সাহায্যে নিজপত্নী মাল্যবতীকে হত্যা করেন। এ কুন্তলরাজ খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। অর্থাৎ, বাৎস্যায়নের বিদ্যমানকাল প্রথম শতকের পরে। বরাহমিহির-রচিত ‘বৃহৎসংহিতা’ গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কামকলা সংক্রান্ত্র। এর বিষয়বস্তু মূলত বাৎস্যায়নের গ্রন্থ থেকে গৃহীত। বরাহমিহির খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে জীবিত ছিলেন। বাৎস্যায়ন যেহেতু বরাহ-মিহিরের পূর্বে গ্রন্থ রচনা করেন সেহেতু তিনি প্রথম থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। বাৎস্যায়ন ছিলেন এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। কেউ কেউ মনে করেন তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল বেশ্যালয়ে, যেখানে তাঁর প্রিয় মাসি কাজ করতেন। এখান থেকে তিনি কামকলা-সংক্রান্ত প্রথম প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

বাতিক

সংস্কৃতজাত বাংলা শব্দ বাতিক-এর আভিধানিক অর্থ—পাগলামি, মানসিক উত্তেজনা, ছিট প্রভৃতি। সংস্কৃত ‘বাত’ শব্দের সঙ্গে ই (ষ্ণিক্) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ‘বাতিক’ শব্দ গঠিত হয়েছে। ‘বাত’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—বায়ু। বায়ুপ্রবাহ থেকে ঝড়, সাইক্লোন, ঝঞ্ঝাবাত, বাত্যাপ্রবাহ প্রভৃতি জানমাল বিধ্বংসকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগের উদ্ভব হয়। কিন্তু বাংলা ‘বাতিক’ ব্যাত্যাপ্রবাহ নয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্র অনুযায়ী বায়ু, পিত্ত ও কফ-এর সমন্বিত উপাদান মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা টিকিয়ে রাখে। এ তিনটি উপাদানের যথার্থ পরিমাণ উপস্থিতির ওপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। বায়ু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শরীরে বায়ুর প্রকোপ বাড়লে মানুষের মানসিক উত্তেজনা ও শারীরিক অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এটাই হচ্ছে রোগ বা ‘বাতিক’। প্রকৃতিতে বায়ুপ্রবাহের একটি স্বাভাবিক মাত্রা ও গতি আছে। বায়ুপ্রবাহের গতি বৃদ্ধি পেলে প্রকৃতি পাগলের মতো অশান্ত হয়ে ওঠে। গাছপালা, ঘরবাড়ি, ধনজন সব ভেঙেচুরে শেষ করে দেয়। তেমনি মানুষের মধ্যে বায়ু বৃদ্ধি পেলেও মানুষ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির মতো অশান্ত হয়ে ওঠে।

বাধিত

বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত 'বাধিত' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—অনুগৃহীত, অনুগ্রহপ্রাপ্ত, কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ, করুণায় সিক্ত প্রভৃতি। 'বাধিত' সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে বিড়ম্বিত, বিরক্ত, নির্যাতিত, বাধাপ্রাপ্ত প্রভৃতি। সংস্কৃত বিড়ম্বিত ও নির্যাতিত কীভাবে বাংলায় এসে অনুগৃহীত ও কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হয়ে গেল তা বিশ্লেষণ করা যায়। প্রত্যেক মুদ্রার দুটি পিঠ রয়েছে। ভালো শব্দের বিপরীত মন্দ। ভালো আছে বলে মন্দ এবং মন্দ আছে বলেই ভালো। তাই পরস্পর বিপরীত হলেও একটি অপরটির পূরক এবং একই সঙ্গে সম্পূরক। ক্ষমতাবান লোকদের দ্বারা সাধারণ নিরীহ লোকজন সবসময় বিড়ম্বিত ও নির্যাতিত হয়। শুধু মানুষে নয়, পশুতেও এমন দেখা যায়। প্রকৃতিও আমাদের এমন শিক্ষা দেয়। ছোট মাছ অপেক্ষকৃত বড় মাছের আহার। বস্তুত এভাবে ক্ষমতাবানরা টিকে থাকে এবং নির্যাতন করে তাদের ক্ষমতাকে সুসংহত করে। তাই সাধারণ নিরীহ লোকজন ক্ষমতাবানদের অনুগ্রহের জন্য সবসময় লালায়িত থাকে। ক্ষমতাবানদের সন্তুষ্টিই তাদের নিরাপত্তার নিয়ামক। এ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরীহগণ সর্বদা শক্তিমানদের যেকোনো উপায়ে সন্তুষ্ট করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকতে চায়। বস্তুত এ কারণে সংস্কৃত 'বাধিত' শব্দের অর্থ বাংলায় এসে পুরো উল্টে গেছে। তবে উল্টে গেলেও মুদ্রার ওপিঠ হিসাবে মুদ্রার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বানচাল

'বানচাল' শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—ভণ্ডুল, ফেঁসে যাওয়া, ভেস্তে যাওয়া প্রভৃতি। 'বান' ও 'চাল' শব্দের সমন্বয়ে 'বানচাল' বাগভঙ্গিটি গঠিত। 'বানচাল' শব্দের মূল অর্থ হলো—নৌকার তক্তার জোড় ফাঁক বা আলগা হয়ে যাওয়া। নৌকা তৈরি করার সময় এক তক্তার সঙ্গে আর একটি তক্তাকে জোড়া দেওয়ার জন্য যে খাঁজ কাটা হয় তাকে বলা হয় 'বান'। 'চাল' শব্দের অর্থ—হচ্ছে ঢিলা হওয়া। সুতরাং 'বানচাল' শব্দের অর্থ হচ্ছে—তক্তাকে জোড়া দেওয়ার জন্য যে খাঁজ কাটা হয় সেটি ঢিলে হয়ে যাওয়া। বানচাল হলে নৌকা অকেজো হয়ে যায়। আর নদীর মাঝখানে যদি এমন ঘটনা ঘটে তো নৌকা ডুবে সহায়সম্পদ ও জানমালের প্রচুর হানি হতে পারে। তখন মাঝ-নদীতে নৌকার মাঝিমাল্লাসহ যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই ফেঁসে যান, শধু তাঁরা নন, নৌকা ডুবে যাওয়ায় নৌকার মালিকও ক্ষতিগ্রস্ত হন। যে উদ্দেশ্যে নৌকার যাত্রা সে উদ্দেশ্যও ভণ্ডুল হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায়, বানচাল হলে অনেকের আশা-ভরসা ভণ্ডুল হয়ে যায়। অনেকে ফেঁসে যায় বিভিন্ন কারণে। ভেস্তে যায় অনেক কিছু। তাই নৌকার 'বানচাল' কথায় এসে যে-অর্থ ধারণ করেছে তা যেমন যৌক্তিক তেমনি প্রায়োগিক।

বানপ্রস্থ

'বানপ্রস্থ' মানবজীবনের তৃতীয় আশ্রম বলে কথিত। প্রৌঢ় বয়সে সংসার ত্যাগ করে বনে বসবাসের নাম হচ্ছে—বানপ্রস্থ। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এ চার প্রকার আশ্রম। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, তারপর গার্হস্থ্য, এরপর বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করতে হয়।

বামপন্থি

'বামপন্থি' শব্দের আভিধানিক অর্থ—'সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী'। বাংলা ভাষায় 'বামপন্থি' আছে, কিন্তু 'বামপন্থা' নেই। অথচ ব্যাকরণের নিয়মানুসারে যারা বামপন্থা অনুসরণ করে তাদের 'বামপন্থি' হওয়ার কথা। একই ঘটনা দেখা যায় 'দক্ষিণপন্থি' শব্দে। 'দক্ষিণপন্থি' আছে, কিন্তু 'দক্ষিণপন্থা' নেই। তাহলে
'-পন্থা' ছাড়া '-পন্থি' হয় কীভাবে? প্রকৃতপক্ষে বাংলা শব্দভাণ্ডারে বাংলা ব্যাকরণ মেনে 'বামপন্থি' শব্দটির উদ্ভব হয়নি। ইংরেজি leftist শব্দের বাংলা অনুবাদ হতে 'বামপন্থি' শব্দের উৎপত্তি। এবার দেখা যাক leftist কী।
ইউরোপের প্রাচীন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী আমন্ত্রিত অতিথিগণের মধ্যে যাঁরা অতি সম্মানিত তাঁরা খাওয়ার টেবিলে কিংবা বৈঠকখানায় গৃহকর্তার ডান দিকে বসতেন। অভিজাত পরিবারের যেকোনো আপ্যায়নে এ প্রথা

অত্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলা হতো। এ সামাজিক প্রথাটি ক্রমান্বয়ে ইউরোপের অধিকাংশ দেশের পার্লামেন্টে সদস্যদের আসন বিন্যাসে স্থান করে নেয়। অভিজাতগণ সাধারণত রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তাই রক্ষণশীল দল যেদিকে বসতেন তার বাঁ দিকে বসতেন প্রগতিশীল (র‍্যাডিক্যাল) দল। মাঝখানে বসতেন মডারেট দল। রক্ষণশীল অভিজাতগণের 'বাঁ দিকে' বসার কারণে কালক্রমে প্রগতিশীল দলের সদস্যদের leftist বা বামপন্থি নামে ডাকা শুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে তাদের উল্টো দিকে আসনগ্রহণকারী সদস্যগণ হয়ে যান 'দক্ষিণপন্থি'।

ইউরোপে দীর্ঘকাল ধরে প্রগতিশীল রাজনীতিক দলগুলোকে বামপন্থি দল নামে অভিহিত করা হতো। সময়ের বিবর্তনে রাজনীতিক অঙ্গনে যখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং আন্দোলন প্রবেশ করে তখন 'বামপন্থি' অভিধা পরিবর্তিত হয়ে প্রগতিশীল দলের প্রতিরূপ হিসেবে 'সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারীগণ' leftist নামে পরিচিতি পায়। একইভাবে বাংলা ভাষাতেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী ব্যক্তি বা রাজনীতিক দল 'বামপন্থি' হয়ে যায়।

বালখিল্য

'বালখিল্য' শব্দের অর্থ—শিশুসুলভ। সংস্কৃত ভাষায় এটি বিশেষ্য পদ, কিন্তু বাংলায় বিশেষণ পদ। ভারতীয় পুরাণ মতে 'বালখিল্য' হলো বুড়ো আঙুল পরিমাণ লম্বা এক শ্রেণির মুনির নাম। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, ব্রহ্মার শরীরের লোম থেকে এদের জন্ম। এরা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং সংখ্যায় ষাট হাজার। এদের কিছু আচরণ পুরাণপ্রসিদ্ধ। মূলত বালখিল্য মুনিদের আচরণ থেকে 'বালখিল্য' বাগভঙ্গির সৃষ্টি। বাংলায় 'বালখিল্য আচরণ' কথাটির অর্থ—শিশুসুলভ আচরণ।

কথিত হয়, একবার কশ্যপঋষি পুত্রকামনায় এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। কশ্যপ ইন্দ্রকে বালখিল্য মুনিদের যজ্ঞের কাষ্ঠ পরিবহনের কাজে নিযুক্ত করেন। খর্বাকৃতির দুর্বল দেহাবয়বের অধিকারী বালখিল্যরা সবাই মিলিতভাবে মাত্র একটি পত্র বহন করে আনার সময় জলপূর্ণ এক গোষ্পদে পতিত হন। এটি দেখে ইন্দ্র তাঁদের উপহাসপূর্বক উদ্ধার না-করে চলে যান। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ বালখিল্যরা অধিকতর শক্তিশালী এক ইন্দ্রের সৃষ্টির জন্য এক মহাযজ্ঞ শুরু করেন। এ সংবাদ অবগত হয়ে ইন্দ্র কশ্যপের শরণাপন্ন হন। কশ্যপ তখন বালখিল্যদের বললেন যে, ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁকে আর একটি ইন্দ্র সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা করা হলে সৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তবে অন্য এক ইন্দ্র জন্মগ্রহণ না-করে পক্ষীশ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করবে। এ কথায় বালখিল্যরা সন্তুষ্ট হন। অতঃপর বিনতার গর্ভে সূর্যসারথি অরুণ ও পক্ষীজাতির ইন্দ্র 'গরুড়' জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্মীকি

ভারতীয় পুরাণের একটি অন্যতম চরিত্র। বাল্মীকি বরুণের পুত্র এবং রামায়ণ-রচয়িতা মহর্ষি ও আদি কবি হিসেবে খ্যাত। তিনি দশরথ-এর সমসাময়িক ছিলেন। অযোধ্যার দক্ষিণে গঙ্গা নদীর তীরে অরণ্যের মধ্যে তমসা নদীর পাড়ে তাঁর আশ্রম ছিল। একাদিক্রমে ষাট হাজার বছর তপস্যারত থাকায় তাঁর সারা শরীর বল্মীকে আচ্ছন্ন হয়। এ জন্য তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। ব্রহ্মার নির্দেশে তিনি 'রামায়ণ' রচনা করেন।

বাসর রাতে বিড়াল মারা

'বাসর রাতে বিড়াল মারা' একটি পৌরাণিক কাহিনি। এক রাজার দুটি কন্যাসন্তান ছিল। একজনের নাম নয়নমণি আর একজনের নাম চিন্তামণি। দুই কন্যা সার্বক্ষণিক দুটো বিড়াল নিয়ে থাকত। তারা বড় হলে রাজা অনুভব করলেন তাদের বিয়ে দিতে হবে। এখন বর পাওয়া যায় কোথায়। অবশেষে রাজার পছন্দের দুই ভাই পাওয়া গেল। নির্দিষ্ট দিন বিয়ে সম্পন্ন হলো। রাজার ছেলেসন্তান নেই। রাজ্য দুই ভাইকে ভাগ করে দেওয়া হলো।

এক ভাইয়ের উত্তরখানে আর এক ভাইয়ের দক্ষিণখানে বাসর রাতের ব্যবস্থা করলেন। বড় ভাই বাসর রাতে গিয়ে দেখে, বড় রাজকন্যা একটা বিড়ালকে গভীরভাবে আদর করে চলছে। বারবার ডেকেও নববধূর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। তখন বড় ভাই একটা তলোয়ার দিয়ে বিড়ালটিকে কেটে দুভাগ করে দেয়। কাণ্ড দেখে রাজকন্যা নয়নমণি ভয়ে অস্থির। সত্যিকার একজন বীর তার স্বামী। এরপর থেকে স্বামী যা-ই বলে রাজকন্যা তা-ই করে। অনেকদিন পর এক সভায় দুই ভাইয়ের দেখা। বড় ভাই ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করল কেমন কাটছে দিনকাল। ছোটভাই বলল— ভালো না, রাজকন্যা সারাক্ষণ একটা বিড়াল নিয়ে থাকে। আমার দিকে খেয়াল দেওয়ার সময় তার নেই। ছোট ভাই বলল, তুমি কেমন আছ? বড় ভাই বলল—খুব ভালো, আমি বাসর রাতেই বিড়ালকে মেরে ফেলেছি। ছোট ভাই ভাবল আমারও তাই করতে হবে। কয়েক মাস পর দু-ভাইয়ের আবার দেখা। ছোট ভাইয়ের শরীরে আঘাতের চিহ্ন। বড় ভাই বলল—কী হয়েছে? ছোট ভাইয়ের উত্তর তোমার কথা শুনে আমিও বিড়ালকে তলোয়ার দিয়ে দুখণ্ড করেছি। কিন্তু রাজকন্যা রেগে গিয়ে আমাকে প্রচুর মেরে বন্দি করে রেখেছিল। আজই ছাড়া পেলাম। বড় ভাই বলল—বোকা কোথাকার! বিড়াল বাসর রাতেই মারতে হয়। নইলে নিজেকে মরতে হয়।

বাহন

যে বহন করে সে বাহন। প্রায় প্রত্যেক দেবতারই কোনো না কোনো জীবজন্তু বাহনরূপে আছে। যেমন—ব্রহ্মার হংস, বিষ্ণুর গরুড়, শিবের বৃষ, ইন্দ্রের ঐরাবত ও মেষ, যমের মহিষ, কার্তিকেয়ের ময়ূর, কামদেবের মকর বা টিয়াপাখি, অগ্নির ছাগ, বরুণের মৎস্য, গণেশের ইঁদুর, বায়ুর হরিণ, শনির গৃধ্র, দুর্গার সিংহ, লক্ষ্মীর প্যাঁচা, সরস্বতীর হংস, ষষ্ঠীর বিড়াল, বিশ্বকর্মার হাতি, শীতলার গর্দভ এবং নারদের ঢেঁকি।

বাহিনী

বাহিনী শব্দের আভিধানিক অর্থ—সৈন্যদল, দলবাহ। এটি একটি অতি প্রাচীন শব্দ। 'বাহ' শব্দ থেকে 'বাহিনী' শব্দের উৎপত্তি। বাহ শব্দের অর্থ—অশ্ব এবং বাহিনী শব্দের অর্থ—অশ্ব বা ঘোড়া যার প্রধান সেনাঙ্গ। যে দলে অশ্বারোহী সৈন্যরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে, সেটাই বাহিনী। একসময় গাড়ি ছিল না। অশ্বই গাড়ির ভূমিকা পালন করত। বিমানও ছিল না। সে সময় সামরিক দপ্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অশ্বারোহী দলের। আরও প্রাচীনকালে নৌ-সামরিক দপ্তরের ভূমিকাও ছিল অতি নগণ্য। মূলত অশ্বারোহী বাহিনীই দেশের সামরিক ব্যবস্থাপনার পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করত। হয়তো এ কারণে 'বাহিনী' তথা অশ্বারোহী দলটি সামরিক দলের প্রতিশব্দ হিসেবে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে।

বিকাল

সময়জ্ঞাপক 'বিকাল' শব্দটি বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি বহুমুখী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ—দিনের শেষভাগ। দুপুরের পর শুরু হয় বিকাল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তার স্থায়িত্ব। মানুষের জীবনেও আছে সকাল, দুপুর, বিকাল আর সন্ধ্যা। সন্ধ্যা দিনের শেষ প্রহর; তার পূর্বের প্রহর বিকাল হচ্ছে শেষ প্রহরের আগমন বার্তার দিশারি। তাই বিকালকে কাব্যে যতই মধুরভাবে চয়ন করা হোক না কেন, জীবন ও দিনে বাস্তববাদীগণের কাছে এটি অন্যভাবে চিত্রিত। 'বিকাল' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—বিরুদ্ধ কাল এবং 'বিরুদ্ধ কাল' মানে খারাপ কাল। এটাকে অনেকে 'রাক্ষসী বেলা'ও বলে থাকেন। রাক্ষস যেমন সবকিছু দ্রুত ধ্বংস করে দেয় এ সময়টাও জীবনের সময়টুকু দ্রুত খেয়ে ফেলে। তাই দিনের শেষ অংশের নাম হয়েছে বিকাল বা রাক্ষসী কাল।

বিড়াল তপস্বী

'বিড়াল তপস্বী' বাগভঙ্গিটির সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)-এর 'বিষা'-সিন্ধু'

উপন্যাসে। তিনি লিখেছেন "সাবধান! ও সকল হিতোপদেশ আর কখনও মুখে আনিও না। তোমার হিতোপদেশ তোমার মনেই থাকুক। ভাই সাহেব! বিড়াল তপস্বী, কপট ঋষি, ভণ্ড গুরু, স্বার্থপর পীর, লোভী মৌলবী জগতে অনেক আছে,—অনেক দেখিয়াছি, আজিও দেখিলাম।" এটি মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসের একটি বাক্য। এ বাক্যে 'বিড়াল তপস্বী' বাগধারাটি প্রথম সাহিত্য-পদবাচ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিড়াল শিকার ধরার পূর্বে তাপসের ন্যায় ভদ্র হয়ে বসে থাকে। মনে হয় যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারে না। কিন্তু শিকার নাগালে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে শিকারের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপরও থেমে থাকে না বিড়াল। শিকারকে ছেড়ে দেওয়ার ভানে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে শিকার আত্মরক্ষার চেষ্টা করে সে মুহূর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বিদগ্ধ

'বিদগ্ধ' শব্দের অর্থ রসজ্ঞানসম্পন্ন, বিদ্বান, পণ্ডিত প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে—বিশেষভাবে দগ্ধ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বিদগ্ধ' শব্দটি তিন প্রকার অর্থ প্রকাশে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, ধূর্ত, চতুর, বুদ্ধিমান; দ্বিতীয়ত, বিদ্বান, পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং তৃতীয়ত, রমণীরসিক নাগর, রসকালিবৎ প্রভৃতি। বৈষ্ণব সাহিত্যে শব্দটির ব্যবহার রমণীরসিক নাগর হিসেবে করা হয়েছে। বর্তমানে শব্দটি দ্বিতীয় অর্থ তথা বিদ্বান, পণ্ডিত, জ্ঞানী অর্থ প্রকাশে ব্যবহার করা হয়। এখন দেখা যাক, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হতে শব্দটির এত বিচ্যুতির কারণ কী। 'বিশেষভাবে দগ্ধ' মানে বিদগ্ধ। এখানে দগ্ধ মানে আগুনে পুড়ে দগ্ধ হওয়া নয়। যদিও পুরাণে আগুনে পুড়ে দগ্ধ হওয়ার অনেক কাহিনি আছে। সেকালে নারীদের সতীত্ব পরীক্ষার জন্য অগ্নিপরীক্ষার প্রচলন ছিল। সীতার অগ্নিপরীক্ষা তো একটি অতিপরিচিত কাহিনি। আগুনে পোড়া যেমন কষ্টকর তেমনি ঐকান্তিক প্রয়াস ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে কোনো বিশেষ জ্ঞান, দক্ষতা বা বিদ্যা অর্জনও আগুনে পোড়ার চেয়ে কম কষ্টের নয়। আগুনে পুড়ে যেমন সোনাকে খাঁটি করা হয় তেমনি কঠোর শ্রম, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের আগুনে সাঁতার কেটে মানুষকে বিদ্বান, জ্ঞানী ও পণ্ডিত হতে হয়। তাই 'বিশেষভাবে দগ্ধ' অর্থে জ্ঞানী, পণ্ডিত, মহান ব্যক্তির প্রকাশ যথার্থ। সংস্কৃত 'বিদগ্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষভাবে দগ্ধ—যেমন খাদ্য পাকস্থলীতে 'বিদগ্ধ' কিংবা জীর্ণ না-হলে অজীর্ণ রোগ হয়। বাংলা ভাষায় এসে শব্দটি প্রাচীনকালে বোঝাতে থাকল ধূর্ত ও বুদ্ধিমানকে, মধ্যযুগে বিদ্বান ও রমণীরসিককে; আর আধুনিককালে রসকলাবিৎ কিংবা রসশাস্ত্রের পণ্ডিতকে।

বিধবা

'বিধবা' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ হচ্ছে—যে বিবাহিত মহিলার স্বামী মারা গেছে। বাংলা ভাষায় 'বিধবা' একটি আশ্চর্য শব্দ। এটি আদৌ কোনো স্ত্রীবাচক শব্দ নয়। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে—'যার কোনো পুরুষ বন্ধু নেই'। মেয়েদের একজনই তো পুরুষ বন্ধু থাকে, সেটি তার স্বামী। বিধবা হলে তো আর থাকে না পুরুষ বন্ধু।

বিনীত বিনত বিনয়াবনত

বিনীত শব্দের অর্থ—বিনম্র, শান্ত, বিনয়ী, অমায়িক প্রভৃতি। 'বিনয়' শব্দ থেকে 'বিনীত' শব্দের উৎপত্তি। 'বিনয়' শব্দের মূল ও আদি অর্থ—নয়ন। এ নয়ন চোখের মতো শুধু বাহ্যিক বস্তু দেখার নয়ন নয়। নয়ন বাহ্যিক জ্ঞান ও অন্তরচেতনায় বিভূষিত এক অনুপম আলো, যদ্দবারা কোনো ব্যক্তি নিয়ত জ্ঞান অর্জন ও নিজেকে ঋদ্ধ করার সাধনায় মগ্ন থাকে। এ নয়ন থাকে ভালো-মন্দ, ভূত-ভবিষ্যৎ, কল্যাণ-অকল্যাণ প্রভৃতি দেখতে, বুঝতে এবং উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সহায়তা করে থাকে। এমন নয়ন যাঁর থাকে তিনি জ্ঞানী। তাঁর চিন্তা-

চেতনা ও আচার-আচরণে ফুটে ওঠে মহীয়ান উৎসব। এমন লোক সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এ অর্থে বিনীত শব্দের অর্থ—জ্ঞানী, সংযত, সুশিক্ষিত, অনাড়ম্বর, মার্জিত রুচি, সংস্কৃতিবান প্রভৃতি। তবে শব্দটির বর্তমান প্রচলিত অর্থ এগুলোর একটিও নয়। সাধারণত চিঠিপত্রের শেষে প্রেরকের নামের আগে চিঠির ইতিতে 'বিনীত' লেখা হয়। এর অর্থ— বিনম্র, বিনয়ী, অনুগত প্রভৃতি। কিন্তু যাঁর মনে থাকে এমন নয়ন, জ্ঞানে যিনি ঋদ্ধ, শিষ্টাচারে অনুপম, তিনি কেন অন্যের অনুগত হয়ে গেলেন, কেন হয়ে গেলেন বিনম্র? আসলে বিষয়টা হচ্ছে এই, যিনি জ্ঞানী তিনি সতত বিনম্র।

বস্তুত, 'বিনীত' শব্দটি 'বিনয়' থেকে জাত। 'বিনয়' শব্দের মূল অর্থ—বিশেষ নয়ন। এই নয়ন যাঁর থাকে তিনি নিরন্তর জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর ভাষায়, চিন্তায়, কর্মে, আচরণে শৃঙ্খলাবোধ জন্ম নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, 'বিনীত' শব্দের মূল অর্থ— সুশিক্ষিত, সংযত, নিয়ন্ত্রিত, অনাড়ম্বর, মার্জিত রুচি, সংস্কৃতিবান ইত্যাদি। কিন্তু এসব গুণের অধিকারী কোনো ব্যক্তি তো অন্যের কাছে নিজেকে 'বিনীত' বলে বিশেষিত করতে বা নিজের ঢাক নিজেই পেটাতে পারেন না। তাই 'বিনীত' লিখলে পত্র-প্রাপক ভাবতে পারেন পত্র-লেখক বুঝি তাঁর সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন। দাপ্তরিক পত্র হলে, ঊর্ধ্বতন তাঁর অধস্তনের কাছে নিঃসন্দেহে কৈফিয়ত তলব করতেন এবং সাবধান করে দিয়ে বলতেন, আপনার যে পদগত অবস্থান, সেটা বুঝে তবে বিশেষণ লাগাবেন— অর্থাৎ 'বিনীত' না লিখে, 'বিনত' লিখবেন। ধনী, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র ইত্যাদি বিশেষণ যেমন নিজের নামের আগে নিজের হাতে বসানো চলে না, নীতিগতভাবে 'বিনীত' বিশেষণও তেমনি চলে না। কিন্তু তারপরও চলে, অজান্তেই চলতে থাকে। এটাই হলো ভাষার জগতে শব্দের রহস্য। এবং এ রহস্যের কারণেই 'বিনীত' শব্দের বর্তমান অর্থ—বিনম্র বিনীত, বিনয়ী, শান্ত ইত্যাদি। চিঠিপত্রে নাম স্বাক্ষরের আগে 'বিনীত' বলে বিশেষণ প্রয়োগের অলঙ্ঘনীয় রেওয়াজই দাঁড়িয়ে গেছে। দাপ্তরিক চিঠিপত্রেও বিনীত শব্দের ব্যবহার প্রায় বাধ্যতামূলক। তাই ঊর্ধ্বতনদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে অধস্তনগণ 'বিনীত' হতে বাধ্য হন। চিঠিপত্রে 'বিনীত' শব্দটি থাকলে পত্র-প্রাপক প্রীত হন। বিনীত স্বভাবের লোকদের সকলেই পছন্দ করে। তবু আমি বলব—বিনীত না লিখে 'বিনত' বা 'বিনয়াবনত' লেখা ভালো, রবীন্দ্রনাথের মতো।

বিন্দুবিসর্গ

শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—অতিসামান্য অংশ, আভাসমাত্র প্রভৃতি। 'বিন্দু' ও 'বিসর্গ' দুটি পৃথক শব্দের সমন্বয়ে 'বিন্দুবিসর্গ' বাগভঙ্গির উৎপত্তি। বিন্দু সাধারণত ইংরেজি ফুলস্টপের ন্যায় একটি চিহ্ন। গাণিতিক ভাষায় বিন্দু এমন একটি প্রত্যয় যার অবস্থান আছে কিন্তু কোনো দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নেই। তবে বিন্দুবিসর্গ শব্দের বিন্দু বলতে অনুস্বার বোঝানো হয়। বাংলা বর্ণমালার শেষ দুটি অক্ষর যথাক্রমে অনুস্বার (ং) ও বিসর্গ (ঃ) বর্ণদ্বয় 'বিন্দুবিসর্গ' শব্দের প্রতিভূ। বিন্দু বলতে কোনো ছোট বা সামান্য জিনিসকে বোঝানো হয়। বিন্দু বা অনুস্বারের পাশে অবস্থিত বিসর্গ দুটো বিন্দুর একটি কলাম। এটিও ক্ষুদ্র কিছু প্রকাশে ব্যবহার করা হয়। এ কারণে 'বিন্দুবিসর্গ' শব্দটি বাংলা ভাষায় 'অতিসামান্য কোনো বিষয়' প্রকাশে একটি উত্তম সংযোজন নিঃসন্দেহে।

বিবিধ

'বিভিন্ন' ও 'বিধা' শব্দের সমাস হয়ে শব্দটির উৎপত্তি। বিভিন্ন বিধা যার = বিবিধ। এটি বহুব্রীহি সমাস। বিভিন্ন শব্দের অর্থ—নানান, বহু, প্রভৃতি এবং 'বিধা' শব্দের অর্থ—বিধি, বিধান, প্রকার প্রভৃতি। সুতরাং 'বিবিধ' শব্দের অর্থ বহুপ্রকার, নানাপ্রকার।

বিভীষণ

'বিভীষণ' ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁর স্ত্রীর নাম সরমা ও পুত্রের নাম তরণীসেন। রাবণ,

কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ মহর্ষি বিশ্রবার তিন রাক্ষসপুত্র। বিভীষণ রাবণের ভাই হওয়া সত্ত্বেও গোপনে রামের সঙ্গে হাত মেলান। তিনি সুকৌশলে রামকে গুপ্ত সংবাদ প্রদান করে সহোদর ভাই রাবণের বিনাশ সাধনে সহায়তা করেন। বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে যজ্ঞশালায় হত্যা করেন। রাবণ সবংশে নিহত হলে বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে বসেন এবং রাবণ-পত্নী মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। বিভীষণের এ দেশদ্রোহীমূলক কর্মকাণ্ড হতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিখ্যাত বাগভঙ্গি 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' প্রবাদটির উৎপত্তি। এর সঙ্গে মিল পাওয়া যায় পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদদৌলার বিরুদ্ধে মীরজাফরের কর্মকাণ্ড।

বিরক্ত

'বিরক্ত' শব্দের আভিধানিক অর্থ—জ্বালাতন, ক্রুদ্ধ, অপ্রসন্ন প্রভৃতি। যা মনকে অস্থির করে, চিন্তায় অপ্রসন্নতা আনে, বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটায় তা-ই বিরক্তি এবং এর অর্থ জ্বালাতন, অপ্রসন্ন বা অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টির উদ্রেককারী বিষয় হলেও আদি ও মূল অর্থ ছিল ভিন্ন। মূলত অনুরাগহীন বা ভালবাসার অভাব বোঝাতে কাউকে বা কোনো কিছু প্রকাশে 'বিরক্ত' শব্দ ব্যবহার করা হতো। এখন কিন্তু তা নয়। মূলত যেটি অনুরাগহীন, যার মধ্যে ভালবাসা নেই সেটিই বিরক্তিকর এবং এমন লোক যা-ই করুক না কেন সেটিই 'বিরক্ত' হয়ে করা। বিরক্ত ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়। কেউ পরম প্রসন্ন হলেও মুহূর্তের মাঝে বিরক্তিকর হয়ে উঠতে পারে। তাই বিরক্তির সঙ্গে কাজ, মনমেজাজ, চিন্তা-চেতনা ও পরিস্থিতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। একটা জিনিস কারও কাছে বিরক্তের হলে যে সবার জন্য বিরক্তের হবে তা নয়। বরং অন্যের কাছে তা পরম প্রত্যাশারও হতে পারে।

বিরাশি সিক্কার চড়

সিক্কা মানে মুদ্রা, বাদশাহি আমল ও পরবর্তীকালে কোম্পানি আমলের মুদ্রাও 'সিক্কা' নামে পরিচিত ছিল। ছোটবেলায় দেখেছি এক টাকার সে অচল রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে স্বর্ণকাররা এক তোলা অলঙ্কার মাপত। আশি (৮০) তোলায় সের হতো, বিরাশি (৮২) তোলায় নাকি 'পাক্কা সের' হতো। চপেটাঘাতকারীর হাতের ৮২ তোলা শক্তি; মানে পুরো শক্তি, প্রয়োগে যে চড় মারে তা-ই 'বিরাশি সিক্কার চড়' অভিধায় আখ্যায়িত।

বিরূপাক্ষ

পূর্বদিকে অবস্থিত দিগহস্তী। এ হস্তী পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। কথিত হয়, যখন বিরূপাক্ষ ক্লান্ত হয়ে মস্তক সঞ্চালন করে তখন পৃথিবীতে কম্পন হয়। এ কম্পনকে বলা হয় ভূমিকম্পন।

বিলাত

'বিলাত' শব্দটির অর্থ—ইংল্যান্ড, ইউরোপ। বস্তুত 'বিলাত' অর্থ ইংল্যান্ড। বাঙালির কাছে বিলাত শব্দটা যখন বহুল প্রচলিত ছিল তখন 'বিলাত' বলতে শুধু ইংল্যান্ড নয়, পুরো ইউরোপকেই বোঝাত। এখন অবশ্য 'বিলাত' শব্দটি আগের মতো বহুল প্রচলিত নয়। এখন ইংল্যান্ডকে আর বিলাত বলা হয় না, ইংল্যান্ডই বলা হয়। তবে বাঙালির 'বিলাত' শব্দটি বিলাতি নয়, আরবি। আরবি 'ওয়ালাত' শব্দ ফারসি, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় আরবি বর্ণ 'ওয়াও'-এর উচ্চারণজনিত কাঠিন্যে পড়ে 'বিলায়ত' হয়ে যায়। বাংলা ভাষায় এসে 'বিলায়ত' আরও বিকৃত হয়ে 'বিলাত' হয়ে যায়। আরবি 'ওয়ালাত' শব্দের মূল অর্থ—ওয়ালি বা গভর্নর-শাসিত দেশ বা প্রদেশ। একসময় মিশর, ইরানসহ অনেক দেশ ছিল আরবদের 'ওয়ালাত'। ভারতের মুসলমান রাজত্বের প্রথম দিকে ভারতীয় মুসলমানগণ পারস্য ও মধ্য-এশিয়ার দেশসমূহকে 'বিলায়ত' বলত। তাদের কাছে ওই সব এলাকার অধিবাসীরা ছিল 'আহলে বিলায়ত' বা দেশি লোক। ভারতের ব্রিটিশ শাসনামলে আকস্মিকভাবে শব্দটির অর্থ পাল্টে যায় এবং 'বিলায়ত' ভারতীয়দের কাছে হয়ে পড়ে ইংল্যান্ড বা ইউরোপ।

বিশদ

'বিশদ' শব্দের বর্তমান ও আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট, পরিষ্কার, পরিস্ফুট প্রভৃতি। কোনো বিষয় বা কারও ব্যাখ্যা যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কাছে সহজ-সরল ভাষ্যে কোনোরূপ অস্পষ্টতা ব্যতিরেকে বোধগম্য হয়ে ওঠে তখন তাকে 'বিশদ ব্যাখ্যা' বলা হয়। তবে 'বিশদ' শব্দটির আদি অর্থ ছিল—রমণীয়, চিত্তবিনোদনজনক, চিত্তপ্রসাদজনক। তাহলে কেন এখন সে অর্থ 'বিশদ' বহন করে না? একটু চিন্তা করলে দেখা যায়, আসলে বর্তমান ও পূর্বের অর্থের অন্তর্নিহিত প্রায়োগিক রূপ অভিন্ন। কোনো বিষয় কারও নিকট যখন সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে ওঠে তখন তার আর কোনো কিছু জানার থাকে না। জানার বিষয় সহজে বোধগম্য হওয়ার পর মন আপনা-আপনি সতেজ হয়ে ওঠে। প্রাপ্তির দোলায় চিত্ত হয়ে ওঠে প্রশান্ত। তাই অর্থের বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন হলেও অন্তর্নিহিত রূপ এখনও থেকে গেছে অভিন্ন।

বিশ্বকর্মা

ভারতীয় পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী। বেদে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বকর্মা বলা হয়েছে। তাঁর মাতা হচ্ছেন বৃহস্পতির বোন যোগসিদ্ধা এবং পিতা অষ্টম বসু 'প্রভাস'। বিশ্বকর্মা শিল্পসমূহের প্রকাশক, অলঙ্কারের স্রষ্টা, দেবতাদের বিমান-নির্মাতা। তাঁর কৃপায় মনুষ্য জাতি শিল্পকলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান প্রভৃতির শিল্পী প্রজাপতি। বিশ্বকর্মা কেবল দেবশিল্পীই নন, দেবতাদের অস্ত্রাদিও তিনি প্রস্তুত করেছেন। স্বর্গ, লঙ্কাপুরী, রামের জন্য লঙ্কা-গমনের সেতুবন্ধ ছাড়াও তিনি আরও অগণিত শিল্পের আবিষ্কারক।

বিশ্বকর্মা বিশ্বের সব শিল্পের সৃষ্টি করেছেন। নিজের সন্তানকে সুন্দর রূপ দেওয়ার জন্য বিশ্বকর্মা বারবার আকৃতি বদলিয়ে যাচ্ছিলেন। যে রূপই দেওয়া হোক না কেন, বিশ্বকর্মা এর চেয়ে আরও সুন্দর অবয়ব দেওয়ার কাজে বহুক্ষণ সময় নষ্ট করছিলেন। দেবতাদের প্রয়োজনীয় কাজে বিঘ্ন হচ্ছিল। তাই তাঁকে নিজের সন্তান সৃষ্টির কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার জন্য বলা হয়। অতঃপর বিশ্বকর্মা শেষবারের মতো সময় প্রার্থনা করেন। এবার তাঁর সন্তানকে যে রূপ দেওয়া হয় তা হচ্ছে চিকা বা ছুঁচো। সন্তানের চেহারা দেখে বিশ্বকর্মা ও তাঁর স্ত্রী হতভম্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু এরপর আর কোনো উপায় তাঁদের ছিল না।

বুজরুকি

পাণ্ডিত্যের ভান, অলৌকিক শক্তির অধিকার হওয়ার ভান, ছলনা, প্রতারণা, চালাকি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে 'বুজরুকি' শব্দটা প্রয়োগ করা হয়। ফারসি বুজুর্গ শব্দ হতে বাংলা 'বুজরুক' এবং বুজুর্গি শব্দ হতে 'বুজরুকি' শব্দের উৎপত্তি। বুজুর্গ্রা যা করে সেটি বুজুর্গি বা বুজরুকি। ফারসি বুজুর্গ্ শব্দের অর্থ হলো—বিশাল, বৃহৎ, মহৎ, মহান, বৃদ্ধ প্রভৃতি। 'বুজরুক' শব্দের পাশাপাশি বাংলাতে বুজুর্গ শব্দের ব্যবহারও চালু রয়েছে। বাংলায় প্রচলিত বুজুর্গ শব্দটি ফারসি বুজুর্গ্ শব্দের মহান ও মহৎ অর্থ দুটো ধারণ করেছে। বাকি অর্থগুলো ঠেলে দিয়েছে 'বুজরুক' শব্দের শরীরে। বুজুর্গ তাহলে কেন বুজরুক হয়ে অর্থের পরিবর্তন করল? মহান বা মহৎ ব্যক্তিদের অনেকে পাণ্ডিত্য বা অলৌকিকত্য প্রভৃতির ভান করে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করে। এটি শুধু পারস্যে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে ছিল এবং আছে। তবে সব মহান ব্যক্তিই যে এ রকম করে তা নয়। যারা এমনটি করে তাদের জন্য ফারসি বুজুর্গ বাংলায় 'বুজরুক' হয়ে গেলেও প্রকৃত মহান ব্যক্তিরা এখনও কিন্তু বুজুর্গই রয়ে গেছেন।

বুদ্ধিশুদ্ধি

শব্দটির অর্থ—বিচার-বিশ্লেষণবোধ, বুদ্ধির প্রখরতা, বিবেচনাবোধ প্রভৃতি। 'বুদ্ধি' ও 'শুদ্ধি' এ দুটো শব্দের

সমন্বয়ে 'বুদ্ধিশুদ্ধি' শব্দটি গঠিত হয়েছে। বুদ্ধি শব্দের অর্থ—বিচার-বিশ্লেষণ, বিবেচনাবোধ প্রভৃতি এবং শুদ্ধি শব্দের অর্থ—যথার্থতা নিরূপণ। বুদ্ধি অনেকের থাকে বা থাকতে পারে এবং তার প্রখরতাও হতে পারে অসাধারণ কিন্তু সে বুদ্ধি প্রয়োগে যদি বিবেচনাবোধ বা শুদ্ধি না-থাকে তা হলে 'অতি চালাকের গলায় দড়ি'র মতো অবস্থা হতে পারে। বুদ্ধিতে যখন শুদ্ধি বা বিবেচনাবোধ আসে তখন তা সতর্কতাসমন্বিত প্রখরতায় রূপ নেয়। এর কোনো বিকল্প নেই। তাই বলা হয় 'সাবধানের মার নেই'। বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে যথার্থ বিবেচনাবোধ ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভালো-মন্দ যাচাই করে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করার অন্তর্নিহিত চেতনাবোধই 'বুদ্ধিশুদ্ধি'। এটি কেবল তখনই দেখা যায় যখন কারও বুদ্ধিতে 'শুদ্ধি' এসে হাওয়া দেয়।

বুদ্ধু

'বুদ্ধু' শব্দের আভিধানিক অর্থ—বোকা, মূর্খ, বুদ্ধিহীন প্রভৃতি। তবে শব্দটি ব্যঙ্গার্থে অধিক ব্যবহার করা হয়। আরবি 'বদু' শব্দ হতে বাংলা 'বুদ্ধু' শব্দের উৎপত্তি। বাংলা ভাষায় আসার পর 'বদু' শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে 'বদ্দু' রূপ ধারণ করে। আরও পরে এ অতিথি শব্দটি বর্তমান বুদ্ধুরূপে স্থায়ী আসন গেড়ে নেয়। আরবি বদু শব্দের অর্থ হলো গ্রাম্য, অশিক্ষিত, গোঁয়ার, অবুঝ প্রভৃতি। কথিত হয়, আরবি 'বেদুইন' শব্দ থেকে 'বদু' শব্দের উৎপত্তি। উভয়ের অভিন্ন ধাতুমূল এটাই প্রমাণ করে। আরও দেখার বিষয় হচ্ছে বদু আর বেদুইনের আচার-আচরণও অভিন্ন। বদুর মতো বেদুইনরাও গোঁয়ার ও আদিম স্বভাবের। আরবি এ 'বদু' শব্দ বাংলায় এসে রূপ পরিবর্তন করলেও অর্থের পরিবর্তন তেমন করেনি। অবশ্য আরবি 'বদু' আর বাংলা 'বুদ্ধু' এক নয়। আরবি বদুতে গোয়ার্তুমির সঙ্গে কিছু সাহসিকতাও রয়েছে। কিন্তু বাংলা 'বুদ্ধু' শুধু মূর্খ নয়, বোকা ও ভীরুও বটে। নইলে কি তাদের বুদ্ধু বলা যেত!

বুলেট ও ব্যালট

কথিত হয়, প্রাচীন গ্রিসে বিশ্বের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে কালের নির্বাচনসমূহে সাদা-কালো বুলেট (bullet) বাক্সে ফেলে ভোট দেওয়া হতো। এখনকার মতো কাগজের ব্যালট ছিল না। সমর্থক ভোটারগণ ফেলতেন white-bullet আর বিপক্ষতা বোঝাতে ফেলা হতো black-bullet। গ্রিসের এ black-bullet হতে ইংরেজি back-balling বাগভঙ্গির উৎপত্তি। বিখ্যাত গবেষক ও লেখক জর্জ স্ট্যানলির লেখায় bullet দ্বারা ভোট দেওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন ...they gave their choice by bullet। আসলে bullet শব্দের মূল ও আদি অর্থ ছিল—ছোট বল। ইংরেজি ভাষায় এসে bullet নিজেকে সামান্য পরিবর্তন করে ballot হয়ে যায়। এ ballot শব্দের অর্থও ছিল 'ছোট বল'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বুলেট ও ব্যালটের সম্পর্ক জন্ম থেকে অবিচ্ছেদ্য। হয়তো এ জন্য এখনও অনেক দেশে বুলেট ব্যালটকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও আধুনিক বুলেট ও ব্যালটের ভেতরে আকাশ-পাতাল তফাত।

বৃদ্ধ

'বৃদ্ধ' খুব পরিচিত একটি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ—প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠ, মুরবিব, অভিজ্ঞ প্রভৃতি। বৃদ্ধি মানে বর্ধনশীল—যা বেড়েছে তা-ও বৃদ্ধি, যা বড় হয়েছে তা-ও বৃদ্ধি। এ 'বৃদ্ধি' শব্দ থেকে 'বৃদ্ধ' শব্দের উৎপত্তি। এটার সঙ্গে বয়স, অভিজ্ঞতা ও বড়ত্বের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বৃক্ষের সঙ্গেও বৃদ্ধ শব্দের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বৃদ্ধের ন্যায় বৃক্ষও দীর্ঘকাল বয়স নিয়ে বিস্তৃত হয় আকারে, বড়ত্বে আর গভীরতায়। হিন্দুধর্মীয় স্মৃতিশাস্ত্র মতে, কোনো মানুষের বয়স ৭০ বছরের বেশি হলে তাকে বৃদ্ধ বলা হয়। এ বৃদ্ধ অথর্ব বৃদ্ধ নয়, প্রবীণ। বয়স সাতাত্তর বছর সাত মাস সাত রাত পূর্ণ হলে ভীমরতি বা ক্ষ্যাপামি দেখা দেয়। এটাও বৃদ্ধের একটা রূপ। এ রূপটাকে প্রবীণ বলা যাবে না। বলা যায় বয়োজ্যেষ্ঠ।

বৃহন্নলা
বৃহৎ + নল + আ = বৃহন্নলা। এর মানে— দীর্ঘভুজা। অর্জুন নপুংসক ছিলেন এক বছর, এ সময় তিনি বৃহন্নলা ছদ্মনাম ধারণ করেছিলেন। সংসদ বাংলা অভিধান (২০১১) লিখেছে 'বৃহন্নলা বিণ. দীর্ঘভুজা, দীর্ঘ বাহুবিশিষ্টা। বি. অজ্ঞাতবাসকালে ক্লীববেশী অর্জুনের ছদ্মনাম; (আল.) ক্লীব।'

বৃহস্পতি তুঙ্গে
জ্যোতিষীরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি গোলক (৩৬০ ডিগ্রি) চিন্তা করে সমান ১২ ভাগে ভাগ (৩০ ডিগ্রি) করেন এবং এক একটি ভাগে এক একটি রাশি কল্পনা করেন। এর নাম 'রাশিচক্র'। যেহেতু গ্রহগুলো রাশিচক্রে ক্রমাগত ঘুরছে, বিভিন্ন সময়ে তাই এরা বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান করে এবং প্রতিটি গ্রহই রাশিচক্রের বারোটি রাশির প্রত্যেকটি অতিক্রম করে চলেছে। গড় হিসাবে চন্দ্র সোয়া দুই-দিনে, বুধ ১৮ দিনে, শুক্র ২৮ দিনে, রবি ১ মাসে, মঙ্গল ৪৫ দিনে, বৃহস্পতি ১ বছরে, শনি আড়াই বছরে এবং রাহু ও কেতু দেড় বছরে এক একটি রাশি অতিক্রম করে।

বেকুব
'বেকুব' শব্দের আভিধানিক অর্থ—বোকা, বুদ্ধিহীন, স্বাভাবিক বোধশক্তিহীন, বুদ্ধিতে অপরিপক্ব প্রভৃতি। বাংলায় শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও এটি আরবি ও ফারসি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত। আরবি অকুফ (ওকুফ) শব্দের অর্থ—বুদ্ধি। এর সাথে ফারসি বে (অর্থ না) উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'বেওকুফ' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। যা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়ে 'বেকুব' শব্দে এসে স্থিতি পায়।

বেদব্যাস
ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত বে বিভাগকর্তা 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' বেদব্যাস নামে পরিচিত। তিনি এক বেদকে শতশাখাযুক্ত চার ভাগে বিভক্ত করে 'বেদব্যাস' নামে অভিহিত হন। তিনি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র পুত্র, শক্তির পৌত্র, পরাশরের পুত্র ও শুকদেবের পিতা। তাঁর মাতার নাম সত্যবতী। গায়ের বর্ণ কৃষ্ণ ও দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তার নাম হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। তিনি মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং ভাগবত-এর রচয়িতা।

বেদান্ত
ব্রহ্মের স্বরূপ-নিরূপক শাস্ত্রকে 'বেদান্ত' বলা হয়। বেদের পূর্বভাগ মন্ত্র, ঋক্, যজুঃ ও সামন। ওই পূর্বভাগের দর্শন পূর্ব-মীমাংসা। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগই পূর্ব-মীমাংসার ভিত্তি। ব্রাহ্মণের শেষ ভাগ আরণ্যক ও আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষদ। উপনিষদ ভাগকে বেদান্ত বলা হয়। এতে বেদের চরম বস্তু সন্নিবেশিত বলে এ অংশকে 'বেদান্ত' বলা হয়।

বেলেল্লা
'বেলেল্লা' শব্দের অর্থ ধর্ম ও নীতিহীন, নির্লজ্জ, লম্পট, উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি। ফারসি 'বে' এবং আরবি 'লিল্লাহ' মিলে 'বেলেল্লা' শব্দের উৎপত্তি। ফারসি ভাষায় 'বে' অর্থ—বিহীন, বিনা, ছাড়া প্রভৃতি। অন্যদিকে আরবি 'লিল্লাহ' শব্দের অর্থ—আল্লাহ জন্য। সুতরাং 'বেলেল্লা' শব্দের অর্থ—যা আল্লাহ জন্য নয়। ধরে নেওয়া যায়, যা আল্লাহ জন্য নয় তা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না, আর যা আল্লাহ পছন্দ করেন না তা ধার্মিকদের চোখে অবশ্যই ভালো কাজ নয়। হয়তো এ থেকে 'বেলেল্লা' শব্দটি এমন অর্থ ধারণ করেছে। অবশ্য বর্তমানে শব্দটি বহুলাংশে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গেছে। 'বেলেল্লা' শব্দ নিয়ে গঠিত আর-একটি শব্দ 'বেলেল্লাপনা'।

বৈকুণ্ঠ

বিষ্ণুর অপর নাম 'বৈকুণ্ঠ'। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহভারতে উল্লেখ আছে আমি কুণ্ঠিত না-হয়ে জলের সঙ্গে পৃথিবীর, বায়ুর সঙ্গে আকাশের এবং তেজের সঙ্গে বায়ুর মিলন ঘটিয়েছি। তাই পাণ্ডবেরা আমাকে বৈকুণ্ঠ নির্দেশ করেন।

বৈদ্যুতিক লাইন

'বিদ্যুৎ লাইন' বললে এমন একটি লাইন বোঝাবে, যে লাইন বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য তৈরি করা হচ্ছে বা হয়েছে বা হবে কিন্তু এখনও বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়নি। বিদ্যুৎ প্রবাহের পূর্ব পর্যন্ত এটি বিদ্যুৎ লাইন। তবে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হবার পর 'বিদ্যুৎ লাইন' আর বিদ্যুৎ লাইন থাকে না, 'বৈদ্যুতিক লাইন' হয়ে যায়।

বৈভব

'বৈভব' শব্দের আভিধানিক অর্থ—ঐশ্বর্য, সম্পদ, সমৃদ্ধি, ধন, প্রাচুর্য প্রভৃতি। এটি সংস্কৃত শব্দ। 'বিভু' শব্দ থেকে 'বৈভব' শব্দের উৎপত্তি। বিভু অর্থ—ঈশ্বর, ভগবান, পরমদাতা, পরমপুরুষ। সুতরাং বৈভব শব্দের অর্থ—ঈশ্বরের মহিমা, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। 'বৈভব' শব্দটি যতই ঐশ্বর্যময় হোক না কেন, শব্দটি এখন স্বাধীন ও এককভাবে খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না। বিত্ত, চিত্ত, মন প্রভৃতির সঙ্গে বসলে বৈভব শব্দটি সত্যিকার অর্থে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যেমন—বৈভব অপেক্ষা বিত্তবৈভব, চিত্তবৈভব, মনোবৈভব শব্দগুলো আরও অধিক আকর্ষণীয়। বৈভব যেহেতু ঈশ্বরের ভাব সেহেতু এটি মহামূল্যবান একটি প্রত্যয়। যাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ভাব আছে তিনি সত্যিকার অর্থে ঐশ্বর্যময়। তাই বৈভব দিয়ে শুধু জাগতিক সম্পদওয়ালাকে বোঝায় না, জাগতিক সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে মননশীল চেতনা ও আচরণগত সৌন্দর্যও থাকা চাই।

বোকার স্বর্গ

'বোকার স্বর্গ' বাগভঙ্গির অর্থ—কল্পিত সুখ, আহম্মকের চিন্তা, কল্পিত সুখে বিভোর থাকা প্রভৃতি। প্রাতিষ্ঠানিক একেশ্বরবাদ অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, বুদ্ধি, অপরিণত বুদ্ধি কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক যে সকল মানুষের ভালো-মন্দ চিন্তা করার কোনো ক্ষমতা থাকে না, তারা যদি কোনো পাপ কাজ করে ফেলে সেজন্য তাদের পাপী বলে গণ্য করা হবে না। কারণ তারা না-বুঝে এমন করেছে। এ জন্য তাদের কোনো বিচার হবে না এবং তাদের নরকেও যেতে হবে না। আবার স্বর্গ যেহেতু শুধু পুণ্যবানদের স্থান সেহেতু তারা স্বর্গেও যেতে পারবে না। এ অবস্থায় তাদের স্বর্গ ও নরকের বাইরে একটি ভিন্ন স্থানে রাখা হবে। এ স্থানে বোকাদের রাখা হয় বলে এর নাম ফুলস প্যারাডাইস বা বোকার স্বর্গ। তবে বাগভঙ্গিটির প্রচলিত অর্থ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হতে ভিন্ন। মানুষ স্বভাবতই কল্পনাবিলাসী। নিজের প্রত্যাশিত ইচ্ছা যতই অধরা হোক না কেন, অনেকে কল্পনার মাধ্যমে তা উপভোগ করার চেষ্টা করে। অনেক বাস্তববাদী মানুষও মাঝে মাঝে তাঁর অপ্রাপ্ত ইচ্ছাকে কল্পনায় এনে ক্ষণিকের জন্য হলেও বিভোর থাকার চেষ্টা করেন।

বোমা

বস্তা থেকে দ্রব্যের নমুনা বের করার নিমিত্ত ব্যবহৃত একটি সরল যন্ত্রবিশেষ। ধান-চাল ও খাদ্যশস্যের গুদাম এবং দোকানে এ সরল যন্ত্রটির ব্যবহার দেখা যায়। এ বোমা দিয়ে খাদ্যশস্য-বোঝাই বস্তা হতে খাদ্যশস্য বা মালামালের কিছু নমুনা বের করে যাচাই করা হয়। বোমা দিয়ে বস্তা না খুলে বস্তা থেকে পণ্যদ্রব্যের নমুনা বের করা অতিপ্রাচীন কিন্তু খুব সহজ একটি পদ্ধতি। এ বোমার অনুষঙ্গে অনেকে বোমা মেরে আড়তের বস্তার মতো মানুষের শরীর-মন না খুলে কথা বের করার চেষ্টা করে। মানুষ তো আর বস্তা নয়; তাই সবসময় এমনটি সম্ভব হয় না। যখন সম্ভব হয়

না তখন বলা হয় 'পেটে বোমা মেরেও তার পেট থেকে কিছু বের করা গেল না'। অবশ্য বের হয়ে গেলে তো আর বোমার প্রয়োজন হয় না বলে পেটে বোমা মেরে কথা বের করা বাগভঙ্গিটিও সুপ্ত থেকে যায়। আড়তের সহজ-সরলভাবে পণ্য নমুনা যাচাইয়ের যন্ত্র ব্যতীত আর একপ্রকার যন্ত্র আছে। তার নাম বোমা—যা ফাটিয়ে বাংলাদেশে মানুষ মারা হয়, যুদ্ধে ব্যবহার করা হয় শত শত, হাজার হাজার। এটি একটি মারাত্মক অস্ত্র। এ বোমা অনেক প্রকার। আকাশ হতে ছোড়া হতে পারে, হাত দিয়ে ছোড়া হতে পারে বা মাটির নিচে পুঁতেও রাখা হতে পারে। যেভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, এ বোমার কাজ হচ্ছে জানমালের অনিষ্টসাধন। এ বোমা কিন্তু পর্তুগিজ 'বোম্বারডেরিয়ান' শব্দ হতে এসেছে।

বোম্বেটে

'বোম্বেটে' শব্দের অর্থ বেপরোয়া লোক, সাংঘাতিক লোক, অশালীন ব্যবহার করে এমন লোক। বোম্বেটে একটি সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর চিত্রের মানুষের চরিত্রের প্রতিফলন। শব্দটির সঙ্গে ইউরোপীয় জলদস্যুদের নৃশংস চরিত্রের করুণ স্মৃতি জড়িত। পর্তুগিজ 'বোম্বা' শব্দ থেকে বাংলা বোমা শব্দের উৎপত্তি। অন্যদিকে পর্তুগিজ Bombarderio শব্দ থেকে বোম্বেটে শব্দের উৎপত্তি। বোম্বারডেরিও শব্দের অর্থ—বোমাবাজ। সে অর্থে বোম্বেটে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বোমাবাজ। কিন্তু বাংলায় বোম্বেটে শব্দের অর্থকে বোমাবাজ চিহ্নিত না-করে 'বোমাবাজি' তথা তাদের কর্মকাণ্ড ও আচরণকে নির্দেশ করেছে।

একসময় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ওলন্দাজ, দিনেমার ও পর্তুগিজ জলদস্যু এবং তাদের সহায়তাকারী মগ জলদস্যুদের সাংঘাতিক উৎপাত ছিল। তাদের আক্রমণের শঙ্কায় সাধারণ জনগণ শুধু নয়, জমিদার ও রাজারা পর্যন্ত তটস্থ থাকতেন। ইউরোপিয়ান এ জলদস্যুদের চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও দৈহিক অবয়বও ছিল ভয়ানক। তারা বোমাবাজির মাধ্যমে দস্যুতা সম্পন্ন করে মানুষের জানমাল ও সহায়সম্পদ লুণ্ঠন করত। যারা এমন কাজ করত তারা কখনো ভালো লোক ছিল না। তারা ছিল সাংঘাতিক ভয়ঙ্কর ও অশালীন। বস্তুত পর্তুগিজ 'বোম্বারডেরিও'দের আচরণই বাংলায় বোম্বেটে শব্দে আশ্রয় নিয়ে তাদের কুকীর্তিকে ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গেও স্থায়ী আসনে স্থান করে নিয়েছে।

ব্যঙ্গ

'ব্যঙ্গ' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—বিদ্রূপ, ঠাট্টা, মজা, উপহাস, পরিহাস প্রভৃতি। তবে 'ব্যঙ্গ' শব্দের আদি ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ছিল অন্যরকম। মূলত যার অঙ্গ বিকৃত তাকে ব্যঙ্গ বলা হতো। বিকৃত অঙ্গের মানুষকে দেখে শিশুরা উপহাস করে, শুধু শিশুরা কেন বয়স্কদেরও অনেকে বিকৃত অঙ্গধারীদের নিয়ে ঠাট্টা করে, অযথা পরিহাস করে। অনেকে তাদের জন্মকে অভিশাপ ও পিতা-মাতার পাপের পরিণাম গণ্যে নানা বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে। সমাজ তাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না। যেখানে বিকৃত অঙ্গ সেখানে উপহাস, বিদ্রূপ আর ঠাট্টা। তাই কালক্রমে বিকৃত অঙ্গের অধিকারী তথা 'ব্যঙ্গ' শব্দটি উপহাস-বিদ্রূপ আর ঠাট্টা-মজার সমার্থক হয়ে যায়।

ব্যবসায়

'ব্যবসায়' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—তেজারতি, কাজকারবার, কারবার, পেশা, জীবিকা, বাণিজ্য প্রভৃতি। তবে এর মূল অর্থ ছিল—চেষ্টা, যত্ন, উদ্যম, অধ্যবসায় প্রভৃতি। ব্যবসা বলতে দীর্ঘদিন এগুলোকে বোঝানো হতো। কিন্তু কালক্রমে বাংলায় ব্যবসায় শব্দ তার আদি অর্থ হারিয়ে তেজারতি, কারবার, বাণিজ্য, জীবিকা প্রভৃতি অর্থ ধারণ করে। এ পরিবর্তনের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বাণিজ্য, তেজারতি, কারবার যে কেউ যেকোনোভাবে করতে পারে না। এগুলো করতে হলে প্রয়োজন চেষ্টা, উদ্যম, অধ্যবসায়, পরিকল্পনা, পরিবেশ ও উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রভৃতি। এসব শর্তাবলি ছাড়া বাণিজ্য মঙ্গলের পরিবর্তে সমূহ ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে। তাই যার

উদ্যম, যত্ন, চেষ্টা, প্রয়াস নেই তার বাণিজ্যে আসা মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। এ জন্য উদ্যম, চেষ্টা, প্রয়াস, অধ্যবসায় প্রভৃতি শব্দের স্থান সংগতকারণে 'ব্যবসা' শব্দটা দখল করে নিয়েছে।

ব্রজ

মথুরা ও তার চারদিক। এ স্থান কৃষ্ণের লীলাভূমি, তাই মহাতীর্থস্বরূপ। এ ব্রহ্মভূমিতে বারোটি বন, উপবন, প্রতিবন ও অধিবন আছে।

ব্রহ্মর্ষি

প্রথমে ব্রহ্মর্ষি, তারপর দেবর্ষি, তারপর রাজর্ষি। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা ও অত্রি—এদের গোত্রে ব্রহ্মর্ষিরা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার নিকট গমন করেন বলে এরা ব্রহ্মর্ষি।

একবিংশ অধ্যায়

ভ

ভণিতা

ভণিতা শব্দের আভিধানিক অর্থ ভূমিকা, মুখবন্ধ, গৌরচন্দ্রিকা প্রভৃতি। সংস্কৃত 'ভণ' শব্দ থেকে 'ভণিতা' শব্দের উৎপত্তি। ভণিতা শব্দের অর্থ—আত্মপরিচয়মূলক পঙক্তিসমগ্র। এর আর এক অর্থ ছিল 'যিনি বলেন'। কবিরাই তখন বলতেন। তাই ভণিতার অন্য অর্থ—কবি। মধ্যযুগের কবিদের আত্মপরিচয় দেওয়ার সময় তাঁদের নামের সঙ্গে 'ভণ' শব্দটি অনিবার্যভাবে চলে আসত। তখন কবিদের 'ভণ' কাব্যের মতোই ছিল অপরিহার্য এবং বিবরণও হতো হৃদয়গ্রাহী। 'ভণ' যত আকর্ষণীয় ও মনোহর হতো তার কাব্যও তত হৃদয়গ্রাহী বলে বিবেচনা করা হতো। তবে 'ভণিতা' অর্থ মূলত মূল কবিতা শুরু করার আগে কবির আত্মপরিচয়মূলক বর্ণনা এবং কাব্য রচনার উদ্দেশ্যসহ তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। যা আধুনিক কবি-সাহিত্যিকগণের লেখায় মুখবন্ধ, ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকা প্রভৃতি নামে দেখা যায়।

ভদ্র

'ভদ্র' শব্দের অর্থ—মার্জিত রুচি, শিষ্ট, শান্ত, অমায়িক প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় 'ভদ্র' শব্দের অর্থ—কল্যাণকর, শ্রেষ্ঠ, কুশল, নিপুণ, সাধু, রূপবান প্রভৃতি। যে ব্যক্তি গোপনে কুকর্ম করে বাইরে শালীন হওয়ার লক্ষ্যে মার্জিত ব্যবহার করে তাকেও 'ভদ্র' বলা হয়।

ভরাডুবি

পতন, বিনাশ, সর্বনাশ প্রভৃতি। 'ভরা' ও 'ডুবি' শব্দদ্বয়ের সংযোগে 'ভরাডুবি' শব্দ গঠিত। ভরা মানে—ভর্তি, বোঝাই; ডুবি মানে— নিমজ্জিত এবং 'ভরাডুবি' মানে বোঝাই জাহাজ বা নৌকা নিমজ্জিত হওয়া। তৎকালে নৌকা বা জাহাজবোঝাই মাল নিয়ে দীর্ঘ নৌপথে পরিবহন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করা হতো। নৌকায় থাকত বহুমূল্যে সম্পদ। কখনো কোনো কারণে মাল-বোঝাই নৌকা ডুবে গেলে মালিকের সর্বনাশ হয়ে যেত। এ অনুষঙ্গে শব্দটির অর্থ হয়—পতন, বিনাশ, সর্বনাশ, মহাক্ষতি প্রভৃতি।

ভাইরাস

'ভাইরাস' শব্দের মূল অর্থ—বিষ। বাংলায় 'ভাইরাস' শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। 'ভাইরাস' হিসাবে এটি বহুল প্রচলিত। গ্রামের সাধারণ লোকদের কাছেও এটি অতি পরিচিত। সুতরাং এর প্রতিশব্দ তৈরি করা তেমন জরুরি নয়। তবে 'বিষ' থেকে এর অর্থ দাঁড়িয়েছে—'একদল অতি ক্ষুদে শয়তান যারা শরীরে ঢুকে অসুস্থতা আনে।' অণুবীক্ষণেও গা ঢাকা দিয়ে থাকে। কবির ভাষায় "স্বার্থ আর লুব্ধতার ভাইরাস বলে, 'আয় আয় ঢুকে পড়ি সবলে সকলে', সমাজের শরীরে শরীরে বেঁধে ফেলি বাসা।" [ভাইরাস, কল্যাণ দাশগুপ্ত]। 'ভাইরাস' এখন শুধু জীবের শরীরে নয়, কম্পিউটারেও হানা দিয়েছে। তবে এ ভাইরাস সে ভাইরাস নয়।

ভাগবত পুরাণ

এটি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। ভগবতকে অধ্যায় শেষে 'মহাপুরাণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পুরাণ ব্যাস-রচিত। শুকদেব এটি পিতার নিকট শ্রবণ করেন এবং গঙ্গাতীরে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের প্রার্থনায় এ ভগবত-কথা কীর্তন করেন। এ পুরাণে অসুর বৃত্রের পরাজয় ও মৃত্যুর বিবরণ আছে। এ পুরাণের দশম ভাগে শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়।

ভাত

কারও মতে সংস্কৃত 'ভক্ত' থেকে প্রাকৃত 'ভত্ত' এবং সেখান থেকে 'ভাত'। আবার অনেকে মনে করেন—'ভাতার' শব্দ থেকে ভাত। বিষয়টা পর্যালোচনা করা যাক। ভাত বলতে সে-সকল বিষয় বা বস্তু বোঝায় যা অন্নরূপে শোভা পায়। সিদ্ধ তন্ডুল, অন্ন, অন্নপ্রাশন, জীবিকা, দীপ্তি পাওয়া, প্রকাশ পাওয়া, শোভা পাওয়া প্রভৃতি অর্থও শব্দটি প্রকাশ করে। ভাত-এর সঙ্গে 'ভাতা, ভাতার, ভাতারকামড়া, ভাতারখোর, ভাতারখাগী, ভাতারনড়, ভাতারী' প্রভৃতি শব্দের সম্পর্ক বেশ নিবিড়। ভাতা = ভাত-এর আধার যাতে; বেতন ব্যতিরেকে কর্মচারীদের অন্যত্র যাতায়াত ইত্যাদির জন্য প্রদেয় বৃত্তিকেও 'ভাতা' বলে এবং এর সঙ্গেও ভাতের সম্পর্ক রয়েছে। ভাতার = ভাতা রয় যাতে; পতি অর্থেও ভাতার (স্ত্রী ভাষায়) প্রচলিত, কারণ পতি 'ভাত' দেয়। ভাতারী = ভাতারকে সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে। 'ভাতারকামড়া' শব্দটি প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এর অর্থ যে স্ত্রী ভাতারকে কামড়িয়ে রাখে অর্থাৎ ছাড়তে চায় না। 'ভাতারখোর' বলতে বোঝায়—সে স্ত্রী, যে ভাতার (স্বামী)-এর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এবং ভাতার ভিন্ন যার আর কোনো উপায় নেই, তাই ভাতারকে ছাড়তে সে চায় না। আবার 'ভাতারখোর' বলতে তৎকালে প্রচলিত কুসংস্কারের কারণে যে স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর জন্য 'অপয়া' গালি দেওয়া হয় তাকেও বোঝায়। 'ভাতারখাগী' বলে একটা শব্দও প্রচলিত ছিল, এটি সধবার প্রতি অকল্যাণসূচক গালি; যার অর্থ ভাতারকে খেয়ে ফেলা বা মেরে ফেলা। শব্দগুলো গ্রামবাংলায় কম-বেশি প্রচলিত ছিল।

ভাত শব্দের উৎস বিশ্লেষণে সংস্কৃত 'ভক্ত' ও প্রাকৃত 'ভত্ত' শব্দের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ 'ভক্ত' থেকে 'ভত্ত' এবং সেখান থেকে 'ভাত' শব্দটি প্রসূত হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ একটি প্রাচীন কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া যায় 'ওগ্গর ভত্তা, রম্ভম পত্তা দিজ্জই কন্তা, খা পুনবন্তা। তবে 'ভত্ত' শব্দ থেকে 'ভাত' শব্দের উৎপত্তি হলেও পরবর্তীকালে শব্দটি 'ভ' শব্দ-পরিবার থেকে দল পরিবর্তন করে 'ভা' শব্দ-পরিবারে চলে এসেছে। যে 'ওগ্গর ভত্তা' বাংলাভাষীকে তার ক্ষুধার পরম প্রাপ্যরূপে প্রতিভাত করে, তাকে সে 'ভাত'রূপেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকবে। সে 'ভাত'-এর আধারই তার কাছে 'ভাতা' এবং যে সত্তা এ 'ভাত' সরবরাহ করার মূল ব্যক্তি সে 'ভাতার'। আবার উল্টোভাবে বলা যায়, ভাতার যা দেয় তা-ই 'ভাত'। প্রাচীন বাংলায় বর্তমান 'ভাত'রূপে প্রচলিত খাদ্যটিই ছিল জীবন-ধারণের অন্যতম আধার। পরিবারের প্রধান হিসাবে ভাতারই এটি সংগ্রহের ও প্রদানের মূল হোতা ছিল। পারিবারিক সকল সম্পর্ক, বিবাহ, কন্যার 'ভাতার' (স্বামী) নির্বাচন প্রভৃতি 'ভাত' দিতে পারা বা না-পারার সামর্থ্য দিয়ে বিবেচনা করা হতো। তাই অনেকে মনে করেন 'ভাতার' থেকে 'ভাত'।

ভীমরতি

'ভীমরতি' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, অতি বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রংশতা। 'ভীম' মানে ভীষণ আর 'রতি' মানে রাত্রি। সুতরাং ভীমরতি মানে ভীষণরাত্রি। সংস্কৃত শব্দ 'ভীমরতি'র সঙ্গে 'বয়স' ও 'বয়স অনুযায়ী' আচরণের সম্পর্ক প্রকাশ করা হতো। চালশেও বয়সপ্রকাশজনিত একটি শব্দ। বয়স চল্লিশ পার হলে মানুষের চোখের দৃষ্টি কমে আসার প্রমাণ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে শুরু করে। এ সময় মানুষ দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখার জন্য চশমা পরতে শুরু করে। এটাকে বলে চালশে। সত্তর পার হয়ে বাহাত্তুরে ধরলে মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কেও গণ্ডগোল শুরু হয়। আস্তে আস্তে তার স্বাভাবিকতায় বিঘ্ন দেখা দেয়। 'বাহাত্তুরে' আরও বিপজ্জনক শারীরিক অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। এর কয়েক বছর পর শুরু হয় 'ভীমরতি'। ভারতীয় পুরাণ মতে বয়স সাতাত্তর বছরের সাত মাসের সপ্তম রাত্রির নাম 'ভীমরতি'। এ রাতের পর মানুষের জীবনে ভীষণ পরিবর্তন আসে। শিশুর মতো সে অবোধ আবার কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের মতো নির্বোধ আচরণ শুরু করে। তার সামগ্রিক চালচলন পূর্বেকার স্বাভাবিকতাকেও অস্বাভাবিক করে তোলে। এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ থেকে শব্দটি এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্থ ধারণ করে। ভীমরতি শব্দের একটি কদর্থ করা যায় 'ভীষণ রকম রতি', যদিও তা অবাস্তব

নয়। সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সে পুরুষ মানুষের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায়। তখন পুরুষালী হরমোন Testosterone একটু বেশি পরিমাণে নিঃসরণ হয়। ফলে রতিশক্তি বেড়ে যায়। তখন অনেক পুরুষ নতুন করে বিয়ে করতে চায়। ভীষণরকম রতি শক্তি বেড়ে যায় এবং এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ। তাই একে 'বুড়ো বয়সের ভীমরতি' বলা যায়।

ভুজ

ভুজ শব্দের আভিধানিক অর্থ—হাত, হস্ত, বাহু প্রভৃতি। সংস্কৃত এ শব্দটির সঙ্গে 'ভোজন' শব্দের সম্পর্ক বেশ নিবিড়। যেমন আকারে তেমন উচ্চারণ ও কার্যক্রমে। যা দিয়ে ভোজন করা হয় তাই 'ভুজ'। তাহলে ভুজের কাজ কী শুধু ভোজন করা? আদিমকালে তা-ই ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভুজের ব্যবহারও বেড়ে যায়। তবু আজও 'ভুজ' ভোজনের নিমিত্ত ব্যবহার হয়ে আসছে। ইদানীং 'ভুজ' শব্দটি হাত অর্থে তেমন ব্যবহার করা হয় না। তবে 'ভুজ'-এর অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবহার একটুও কমেনি। বিশেষ করে জ্যামিতিতে ভুজ-এর আধিপত্য এখনও প্রবল। যেমন—ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ—এভাবে অসংখ্য ভুজের দেখা পাওয়া যায়। তবে এ ভুজ ভোজনের বা মানুষের ভুজ নয়। এ ভুজ মানুষের ভুজ দ্বারা অঙ্কিত জ্যামিতিক বস্তুর ভুজ—যার অর্থ বাহু। যেমন—তিন বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলা হয়। তেমনি দশ বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হচ্ছে দশভুজ।

ভূতাপেক্ষ

'ভূতাপেক্ষ' শব্দটির অর্থ—অতীতের ঘটনা সম্পর্কিত। 'ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা' বাক্যাংশের অর্থ অতীতের কোনো বিষয় কার্যকর করা। অতীতে সংঘটিত কোনো বিষয়কে বর্তমানে (পরবর্তীকালে) স্বীকৃতি দেওয়া বা কোনো বিষয়কে অতীতের কোনো সময় থেকে স্বীকৃতি দেওয়ার বেলায় প্রশাসনিক পরিভাষা হিসেবে ইংরেজি Retrospective শব্দের পরিবর্তে বাংলায় 'ভূতাপেক্ষ' শব্দটির বহুল প্রচলন লক্ষ করা যায়। প্রশাসনিক কারণে অতীতের কোনো বিষয়কে সংশোধন করার জন্য সাধারণত এরূপ আদেশ জারি করা হয়। তবে এটির ব্যবহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতেও দেখা যায়। রহিম সাহেবকে ২১/৭/২০১৪ খ্রিস্টাব্দে সচিব পদে উন্নীত করার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। তবে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয় যে, তাঁর এ পদোন্নতি ১/৩/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে কার্যকর হবে। এটাই ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা।

২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারির একটি প্রজ্ঞাপন রুহুল আমিনকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক ও ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মহাপরিদর্শক পদে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়া হয়। তিনি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। আব্দুল মান্নানকে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক পদে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। তিনি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে অবসরে গিয়েছেন বলে ধরা হবে।

ভূপাতিত

ভূপাতিত = ভূ + পাতিত এবং ভূপতিত = ভূ + পতিত। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (২০১০ খ্রিস্টাব্দ) অনুযায়ী 'ভূপতিত [ভূ (তে) পতিত] বিণ. যে ভূমিতে পড়িয়া আছে।' এবং 'ভূপাতিত [ভূ (তে) পাতিত] বিণ. যা ভূতলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে; ভূমিতে নিক্ষিপ্ত। ২. ভূপৃষ্ঠে শায়িত।' ভূ + পতিত বা ভূ + পাতিত = ভূপতিত বা ভূপাতিত। অবশ্য এ দুই শব্দের একটাতেও মনে হয় সন্ধির নিয়ম প্রযোজ্য হয়নি। এ দুটি ক্ষেত্রেই সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনে ধ্বনিগত কোনো পরিবর্তন আসেনি। ভূপতিত [ভূ (তে) পতিত] এবং ভূপাতিত [ভূ (তে) পাতিত]—এ দুটি সাধিত বিশেষণ নির্মিত হয়েছে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের সাহায্যে, সন্ধির নিয়মে নয়। বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ' (২০১৪ খ্রিস্টাব্দে) উল্লেখ আছে 'সব সমাসের ক্ষেত্রে সন্ধি

হয় না’—এ কথা আসলেই যথার্থ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ম

মগের মুল্লুক

অনেকেই 'মগের মুল্লুক' শব্দটা জানেন, কিন্তু অর্থ জানেন না। 'মগ' কারা বা 'মুল্লুকটা' কোথায়! বাংলাদেশে প্রায় ৪০০ বছর আগে মগদে ভীষণ উপদ্রব ছিল। আরাকান, অর্থাৎ আজকের মিয়ানমার, থেকে আসা মগ-জলদস্যুরা বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় রীতিমতো ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করার পর মগদের সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হতে শুরু করে।

ব্রহ্মদেশ বা আরাকানের অধিবাসীদের বলা হতো 'মগ'। মগের মুল্লুক মানে—ব্রহ্মদেশ। এরা স্বেচ্ছাচারী ছিল। অরাজকতা, আইনের শাসন না থাকা এবং যথেচ্ছাচার বোঝাতে এখনও 'মগের মুল্লুক' কথাটা ব্যবহার হয়। অনেকে বলেন, বৌদ্ধদের মগ বলা হতো। বৌদ্ধধর্মে জীব বলি দেওয়া মহাপাপ, তাই তারা জীব বলি দিত না! কিন্তু হিন্দুধর্মে পুণ্যকর্ম হিসেবে দেবতাকে খুশি করার জন্য জীব বলি দেওয়া হতো। মোগল আমলে ত্রিপুরার মহরাজ গোবিন্দমাণিক্য যখন ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরসহ তাঁর রাজ্যের সকল স্থানে ও মন্দিরে জীব বলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন রাজসভা থেকে 'মগের মুল্লুক' কথাটির উৎপত্তি হয়। সভাসদেরা বলতে শুরু করেন "দেশটা কী 'মগের মুল্লুক' হইয়া গেল নাকি? শুনেছি বৌদ্ধ মগেরা রক্তপাত ঘটায় না। তাহলে মগ আর হিন্দুদের মধ্যে তফাত রইল কী? দেশটাকে মগের মুল্লুক করা যাবে না। এটি বৌদ্ধরাষ্ট্র নয়। মা দেবী অসন্তুষ্ট হবে।" এখন 'মগের মুল্লুক' কথাটি দিয়ে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বা নৈরাজ্যময় অবস্থাকে নির্দেশ করা হয়।

মঞ্জুভাষণ

কথার শক্তি তরবারির চেয়ে প্রবল। বলা হয়, কথার চেয়ে বেশি কষ্ট দিতে পারে এমন কোনো অস্ত্র নেই। আবার বলা হয়, কথার চেয়ে বেশি শান্তি দিতে পারে এমন পরম বিষয়ও পৃথিবীতে নেই। এ জন্য বলা হয়, শব্দব্রহ্ম। অর্থাৎ শব্দের শক্তি ব্রহ্মের মতোই অসীম। কোনো কিছু সোজাসুজি বোঝানোর জন্য যেমন শব্দ আছে তেমনি শব্দ আছে ঘুরিয়ে বলার। কোনো ভদ্রলোক অপ্রিয় কথা সহজে সোজাসুজি বলতে চান না। অপ্রিয় কথাটি যখন না বললেই নয়, তখন মোলায়েম করে ঘুরিয়ে বলেন। ইংরেজিতে শব্দ চয়নের এ কৌশলকে Euphemism বলা হয়। বাংলায় এ কৌশলকে 'মঞ্জুভাষণ' বলে। অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর লেখা 'অলংকার চন্দ্রিকা'য় প্রথম 'মঞ্জুভাষণ' শব্দটি ব্যবহার করেন।

জামানের বন্ধু রবিন চুরি করে। বড় লজ্জা হয় জামানের কিন্তু কাউকে বলতে পারছে না, রবিন চুরি করে। বলল রবিনের হাতটানের অভ্যাস আছে। বাজারে যাবার সময় স্ত্রীর কণ্ঠ চাল বাড়ন্ত। মানে বাড়িতে চাল নেই। চাল নেই বলা লজ্জা ও দারিদ্র্য প্রকাশক। তাই 'বাড়ন্ত'। ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইল, না দিয়ে বলা হলো মাফ কর। অফিসে সাহেবকে ঘুষ দিয়ে বলল কিছু মনে করবেন না স্যার, ভাবীর জন্য একটা শাড়ি আর বাচ্চাদের জন্য কিছু মিষ্টি কিনে নেবেন।

মঞ্জুভাষণের এ প্রক্রিয়ায় চোরকে বলে 'নিশিকুটুম্ব'। ইংরেজিতে চোরকে ভদ্রতা করে বলা হয় ফেয়ার ট্রেডার, চাকরি থেকে ডিসমিসকে বলা হয় গোল্ডেন হ্যান্ডশেক, আর্লি রিটায়ারমেন্ট বা আর্লি রিলিজ। 'বেশ্যা' শব্দটি আগে খুব ব্যবহার হতো। এখন বলা হয় যৌনকর্মী। বাসার কাজের মেয়েকে ভদ্রতা করে আগে বলা হতো বুয়া, তারপর আরও ভদ্র হয়ে গৃহপরিচারিকা, এখন তো গৃহকর্মী। সবই ভদ্রতার জন্য করা এবং এগুলোই 'মঞ্জুভাষণ'।

মথুরা

‘মথুরা’ ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত এবং মধুদৈত্য-নির্মিত একটি অপূর্ব সুন্দর নগরী। এটি যমুনার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান হিসেবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে মথুরা মহাপুণ্যস্থান এখানে শ্রীকৃষ্ণের হাতে রাজা কংসের মৃত্যু হয়।

মধুচন্দ্রিমা

সদ্য বিবাহিত দম্পতির একান্ত অবকাশ যাপনের অবস্থা ও অবস্থানকে ‘মধুচন্দ্রিমা’ বা ‘মধুচন্দ্রিকা’ শব্দ সহযোগে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজি ভাষায় ‘হানি’ ও ‘মুন’ শব্দযোগে ‘হানিমুন’ শব্দটি গঠিত। ‘হানি’ অর্থ মধু আর ‘মুন’ অর্থ চন্দ্র বা মাস। ইংরেজি হানিমুন শব্দের আদি অর্থ হলো ‘মধু খাওয়ার মাস’। বাংলা মধুচন্দ্রিমার মধ্যে কিন্তু মধুপান বা মধুমাস হিসেবে কোনো শব্দ নেই। প্রাচীনকালে জার্মানির সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিয়ের পর এক মাস নবদম্পতিকে ভিন্ন এক জায়গায় রাখা হতো। সে সময় নবদম্পতিকে গ্যাঁজানো মধুর শরবত ঘটা করে পান করানো হতো—যা ক্রমান্বয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হয়। কালের বিবর্তনে নবদম্পতিকে মধু খাওয়ানোর ব্যাপারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু থেকে যায় নবদম্পতির ভিন্ন স্থানে গিয়ে অবস্থানের রেওয়াজ। তবে আগের এক মাস নির্ধারিত সময়ও এখন আর মানা হয় না। কতদিন থাকবে কিংবা কোথায় কীভাবে থাকবে তা নির্ভর করে তাদের আর্থিক সামর্থ্যের ওপর।

মধুর

‘মধুর’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—মনোহর, প্রীতিদায়ক, অতিমিষ্ট, মনোরম, শান্তিদায়ক প্রভৃতি। শব্দটির সঙ্গে মৌমাছির মৌচাক হতে সংগৃহীত তরল ঘন মিষ্ট ‘মধুর’ নিবিড় ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মধুর শব্দের অর্থ—মধুযুক্ত। যাতে মধু রয়েছে তা-ই মধুর। মধু একটি আদর্শ খাদ্য। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত খাদ্যের মধ্যে একমাত্র মধুই স্বাভাবিক অবস্থায় যতদিন রাখা হোক না কেন নষ্ট হয় না। এর স্বাদ খুব মিষ্টি। শুধু তাই নয়, এটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। যৌবনকে এটি উজ্জ্বল রাখে, মনকে রাখে প্রফুল্ল। এ অনুষঙ্গে ‘মধু’ খাদ্যটি মধুর হয়ে বাঙালির বাগভঙ্গিতে উঠে এসেছে। ‘মধুর’ শব্দটি যেমন কাব্যিক তেমনি মোহনীয়। কবি-সাহিত্যিক ও প্রেমিক-প্রেমিকা, সব বয়সের মানুষের কাছে শব্দটি অতি প্রিয়। মৌচাকের তরল ঘন মিষ্টি দ্রব্যটির মতো ‘মধুর’ শব্দটি মনকে মিষ্টতায়, হৃদয়কে অনুপমতায় আর চিন্তাকে চঞ্চল বিকাশে উৎফুল্ল করে তোলে। কবির ভাষায় মধুর মধুর বংশী বাজে কোথায় কোন কদম তলাতে...।

মধুরেণ সমাপয়েৎ

শুভ সমাপ্তি বোঝাতে ব্যবহৃত এ কথাটা এসেছে আমাদের প্রাচীন ভূরিভোজন রীতি থেকে। আহার আরম্ভ হতো ঘৃতে কিন্তু সমাপ্ত হতো মধুতে। এ বিষয়ক একটা শ্লোকের শেষাংশ হচ্ছে—‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’। এখনও বিশেষ আনুষ্ঠানিক পঙক্তিভোজনে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ রীতির প্রচলন রয়েছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ মধুরেণ সমাপ্তম হয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিক এবং ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ ঘৃতারম্ভের উৎফুল্ল আয়োজন নিয়ে আবির্ভূত হোক।

মনকলা

মনে মনে মনকলা খাও, যতটা খেয়েছ আরও ততটা খাও, মোট যতটা খেয়েছ তার অর্ধেক খাও, এবার মোট কলার তিন ভাগের এক ভাগ তোমার কোনো সহপাঠীকে দিয়ে দাও, একটা আমার জন্য রেখে দাও, এখন কয়টা অবশিষ্ট আছে? ৩টা। সিদ্ধান্ত তাহলে তো দেখছি তুমি প্রথমে ২টা কলা খেয়েছিলে! বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ‘মনকলা খাওয়া’ বাগভঙ্গিটির অর্থ হলো কল্পনায় বাঞ্ছিত বস্তু উপভোগ করা। মনে মনে মনকলা খাওয়ার এই মানসাঙ্ক থেকেই ‘মনকলা খাওয়া’ বাগভঙ্গিটির প্রবল মিল রয়েছে।

মন কষাকষি

মনোমালিন্য, বনিবনার অভাব, পরস্পর বিরূপ মনোভাব, বিরোধিতা প্রভৃতি শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ। আরবি 'মুনাকশা' শব্দ থেকে বাংলা 'মন কষাকষি' শব্দের উৎপত্তি। 'মুনাকশা' শব্দের অর্থ ঝগড়া, প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শত্রুতা প্রভৃতি। ঝগড়া বা শত্রুতা হয় কখন? যখন বনিবনার অভাব থাকে, পরস্পর বিরূপ মনোভাব বা বিরোধিতা চাঙা দিয়ে ওঠে, তখন ঝগড়া ও পরস্পর শত্রুতা জন্ম নেয়। সুতরাং আরবি 'মুনাকশা' বাংলায় এসে তার অর্থ মোটেও হারায়নি। এবার প্রতিযোগিতা ও বিতর্কে চলে আসি। টেলিভিশনে যখন বিতর্ক হয় তখন প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণাত্মক বক্তব্য ঝগড়া নয়, অল্পসময়ের জন্য হলেও মহা ঝগড়ার ইঙ্গিত দেয়। প্রকৃতপক্ষে ঝগড়া, শত্রুতা, প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে মনোমালিন্য, বনিবনার অভাব, বিরূপ মনোভাব, বিরোধিতা প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী। এগুলো ছাড়া কখনো 'মুনাকশা' সৃষ্টি হতে পারে না। এ জন্য আরবি 'মুনাকশা' বাংলায় এসে 'মন কষাকষি' রূপে ঠাঁই পেয়েছে। এতে তার অর্থের তেমন পরিবর্তন হয়নি। তবে মাত্রার কিছুটা হেরফের ঘটেছে। আরবি মুনাকশার ঝগড়া ও শত্রুতা, প্রতিযোগিতা বা বিতর্ক বাংলা 'মন কষাকষি'র চেয়ে একটু জটিল এবং কিছুটা তপ্ত। অবশ্য আরবীয় যাযাবর জাতিরা আদিম কাল হতে স্বভাবে ছিল কিছুটা তপ্ত ও উগ্র।

মনুসংহিতা

মানবধর্মশাস্ত্র। হিন্দুধর্মের অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য, হিন্দু-জাতির আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়াকলাপের যথাকর্তব্য নির্ধারণ করে যে সংহিতা গ্রথিত হয়েছে, তা মনুর দ্বারা সংকলিত হয়েছে। তাই এর নাম 'মনুসংহিতা'। পণ্ডিতগণের অভিমত, বেদের পর মনুসংহিতা সৃষ্টি হয়েছিল। কথিত হয়, প্রথমে এতে একলক্ষ শ্লোক ছিল। এখন মাত্র ২৬৮৪টা শ্লোক পাওয়া যায়।

মন্তব্য

'মন্তব্য' শব্দের অর্থ অভিমত, মতামত। সংস্কৃত হতে আগত 'মন্তব্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—চিন্তনীয়, বিচার্য। চিন্তা-ভাবনা করে সার্বিক ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক পরম্পরা চিন্তায় যা করা হয় তা-ই মন্তব্য। বাংলা ভাষায় বর্তমানে 'মন্তব্য' শব্দটি অভিমত বা মতামত অর্থে ব্যবহার করা হলেও 'মতামত' বা 'অভিমত' প্রদানে সবাইকে চিন্তা-ভাবনা করতে দেখা যায়। চিন্তা-ভাবনা না-করে কেউ মন্তব্য করে না। সুতরাং মন্তব্য চিন্তার ফসল। তাই 'মন্তব্য' মানে চিন্তনীয় বা বিচার্য এবং চিন্তনীয় বা বিচার্য মানে 'মন্তব্য'।

মন্দ

'মন্দ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—মৃদু, অলস, মন্থর, খারাপ, দুষ্ট, অসৎ, অশুভ, প্রতিকূল, দুর্বল, কটু, কর্কশ প্রভৃতি। এতগুলো অর্থ থাকলেও মূলত খারাপ, মন্দ, দুষ্ট, অসৎ, অশুভ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। শরীর খারাপ যাচ্ছে বোঝাতেও অনেকে শব্দটি ব্যবহার করে। যেমন—বাবার শরীর কয়েক মাস যাবৎ বেশ মন্দ যাচ্ছে। মন্থর, ধীর প্রভৃতি অর্থেও এটি ব্যবহার হয়। যেমন—মন্দগতির গাড়ি, সময়মতো বাড়ি পৌঁছানো যাবে না। 'মন্দ' সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় 'মন্দ' শব্দের অর্থ— ধীর, স্বল্প, বিলম্বিত, নির্বোধ, মন্থর, ক্ষীণ, দুর্বল প্রভৃতি। বাংলায় এসে শব্দটি সামান্য অর্থ পরিবর্তন করলেও মূল অর্থ অভিন্ন রয়ে গেছে। তবে অধিকাংশ শব্দ এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় অতিথি হয়ে এলে কিছুটা আচার-আচরণের পরিবর্তন হয়ে থাকে। মূলত এটাই স্বাভাবিক।

মমতা

‘মমতা’ শব্দের অর্থ—মায়া, স্নেহ, দরদ, ভালবাসা, প্রেম, সহানভূতি প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে ‘মম’ শব্দ হতে মমতা শব্দের উৎপত্তি। ‘মম’ শব্দের অর্থ আমার। সাধু ভাষায় যার অর্থ—মদীয়। সে হিসাবে ‘মমতা’ শব্দের মূল অর্থ—‘এটা আমার’। আমার ছাড়া আর কারও নয় বোঝাতে ‘মমতা’ শব্দটি ব্যবহার করা হতো। শব্দটা সে অর্থে একটু রুক্ষ শোনালেও আসলে এটাই ঠিক। যেটা মমতার, আদরের, স্নেহের এবং ভালবাসার সেটি কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। নিজেই একান্তভাবে নিজের করে রাখতে চায়। কারও ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীকে অন্যে দখল করলে কেমন হয় তা রোমে ‘হেলেন’ এবং ভারতে ‘সীতা’র অপহরণের ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ ভালবাসার প্রতি অন্ধ আবেগ ‘এটা আমার’ উচ্চারণে শুধু সীমাবদ্ধ রাখেনি। তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঘটিয়েছে লঙ্কাকাণ্ড। তাই সংস্কৃত ‘এটা আমার’ বাংলায় ‘মমতা’ হয়ে ভালবাসা, স্নেহ ও প্রেম-প্রীতিকে আরও অর্থবহ করে দিয়েছে।

ময়দা

আরবি ‘মাইদাহ’ শব্দ হতে বাংলা ‘ময়দা’। আলেকজান্ডারের ভারত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ময়দা সম্পর্কে ভারতবাসীর কোনো ধারণা ছিল না। যবের গুঁড়া বা গোধূমচূর্ণকে বারবার চালুনিতে চেলে মিহি করে বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের কৌশল গ্রিকরাই সারা বিশ্বকে শিখিয়েছে। অত্যন্ত মিহি এ গোধূমচূর্ণকে (অর্থাৎ গমের গুঁড়া) আমরা ‘ময়দা’ হিসেবে চিনি। গ্রিক ভাষায় এর নাম— সেমিদালিস। সংস্কৃত ভাষায় সেমিদালিস পরিবর্তন হয়ে হয় ‘সমিতা’। মুসলিম আগমনের পূর্ব-পর্যন্ত ময়দার ‘সমিতা’ নাম বহাল ছিল। আরবি ও ফারসি ভাষায় এ গোধূমচূর্ণের নাম ‘মাইদাহ’ এবং এ ‘মাইদাহ’ শব্দ থেকে বাংলা ‘ময়দা’ শব্দের উৎপত্তি।

মরহুম

শব্দটির প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ—প্রয়াত, মৃত, স্বর্গীয়, লোকান্তরিত প্রভৃতি। ‘মরহুম’ আরবি শব্দ। এর অর্থ—আল্লাহ পক্ষ থেকে রহমপ্রাপ্ত, করুণাপ্রাপ্ত, দয়াপ্রাপ্ত প্রভৃতি। বাংলাদেশের মুসলমানেরা তাদের মৃত আত্মীয়স্বজনের নামের আগে অনেকে ‘মরহুম’ শব্দ লিখে থাকেন। যদিও শব্দটির অর্থ মৃত নয়, তবু অনেকে মনে করেন ‘মরহুম’ শব্দের অর্থ—মৃত। মরহুম শব্দের ‘মৃত’ অর্থ আমাদের অস্তিত্বে এমনভাবে গেঁথে আছে যে, মরহুম বলতে মৃত শব্দটাই কেবল ভেসে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে যিনি আল্লাহর মেহেরবানি বা দয়া বা করুণা লাভে সমর্থ হয়েছেন তিনিই ‘মরহুম’। আল্লাহ রহমত বা করুণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা স্বর্গে স্থান পান। মুসলমানদের বিশ্বাস—মৃতের পর আল্লাহ করুণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা স্বর্গে যাবেন কিন্তু যাঁরা তাঁর করুণাপ্রাপ্ত নন, তাঁরা যাবেন জাহান্নামে। এ জন্য মৃত ব্যক্তির নামের আগে ‘মরহুম’ শব্দ লিখে এ কথা প্রত্যাশা করা হয় যে, মৃত ব্যক্তি আল্লাহর করুণা পেয়ে স্বর্গে গমন করেছেন। হিন্দুরা মরহুম লেখেন না, তৎপরিবর্তে লেখেন ‘স্বর্গীয়’। এর অর্থ—মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বর্গে আছেন।

মর্যাদা

‘মর্যাদা’ শব্দের অর্থ—গৌরব, সম্মান, মূল্য, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, প্রভাব, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। তবে শব্দটির মূল ও আদি অর্থ ছিল—সীমা, ক্ষেত্র, নিয়ম, সদাচার প্রভৃতি। সেকালে যাঁরা নিজেদের সীমা, ক্ষেত্র ও নিয়মকানুনে নিষ্ঠাবান থাকতেন এবং সদাচার করতেন তাঁরাই মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হতেন। কিন্তু শব্দটি বাংলায় এসে তার আদি অর্থ হতে কিছুটা সরে এসে অন্য অর্থ ধারণ করেছে। অবশ্য এ অর্থের সঙ্গে আদি অর্থের মিল রয়েছে। এখন সীমা বা ক্ষেত্র লঙ্ঘনকারীকে অমর্যাদার কাজ বলা হয় না। বরং ক্ষেত্র বিশেষে এটি মর্যাদার কাজ। ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তা দেখা যায়। যার সীমা লঙ্ঘনের ক্ষমতা ও সামর্থ্য যত বেশি সে তত মর্যাদাবান। এ জন্য বলা হয়—‘যার লাঠি তার মাটি’। আর নিয়ম ভাঙা ও অসদাচরণ তো এখন

মর্যাদাবান বলে পরিচিত লোকদের অন্যতম কাজ। প্রাচীনকালে সামান্য সীমা লঙ্ঘনকে, কারও প্রতি অসদাচরণকে মর্যাদাহীন বলে গণ্য করা হতো। এখন কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করে অন্যের সীমায় প্রবেশ করা, কথায় কথায় সাধারণ ও নিরীহ মানুষের প্রতি অসদাচরণ করাই মর্যাদাশীল লোকের স্বভাব। যার যত ক্ষমতা সে তত মর্যাদাশীল।

মহাজন

'মহাজন' শব্দের অর্থ—বড় কারবারি, ব্যবসায়ী, সুদের কারবারি, সাধু, বৈষ্ণব পদকর্তা প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় শব্দটির মূল অর্থ ছিল—লোকজন, মহাপুরুষ, মহাত্মা, শাস্ত্রকার, ধর্মতত্ত্ববিশারদ প্রভৃতি। এখনও সমাস করার সময় শিক্ষার্থীরা লেখে মহা যে জন = মহাজন। তবে এখন বাংলার মহাজন সংস্কৃতের সে মহাত্মা মহাজন নয়। বাংলায় মহাজন বলতে বড় বড় ব্যবসায়ী, যারা পণ্যে ভেজাল দিয়ে, দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে এবং ওজনে কম দিয়ে বিত্তের পাহাড় গড়ে। মহাজন বলতে তাদের বোঝায় যারা সুদের ব্যবসায় করে। এ ছাড়া আড়তদার, ব্যাপারী প্রমুখও 'মহাজন' নামে পরিচিত। কেন সংস্কৃতের মহাত্মা বাংলায় বড় ব্যবসায়ী, আড়তদার ও সুদের কারবারিতে পরিণত হলো? বড় ব্যবসায়ী, সুদের কারবারি, আড়তদার প্রমুখ ছিল প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক। তাদের অধীনে অনেক লোক কাজ করত। এলাকার সাধারণ মানুষজন তাদের কাছে ছিল একপ্রকার জিম্মি। তারা যা বলত সেভাবে তাদের চলতে হতো। সাধারণ লোকজনের কাছে তারা ছিল 'মহান জন'। সুতরাং বলা যায় সংস্কৃত 'মহাত্মা' বাংলায় এসে অর্থ হারালেও বিত্ত হারায়নি মোটেও।

মহাভারত

ভারতীয় মহাবংশচরিত ও কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-বর্ণনা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত বিশ্বখ্যাত মহাকাব্য 'মহাভারত' শব্দের অর্থ—ভরত বংশের মহাউপাখ্যান। এটি অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। যথা আদি, সভা, জন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ। মহাভারতে একলক্ষ শ্লোক আছে। এটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাকাব্য। বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে দীর্ঘ তিন বৎসরে মহাভারত রচনা করেন। পূর্বকালে দেবতাগণ তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখেছিলেন যে, উপনিষদসহ চার বেদের তুলনায় 'মহাভারত' নামে পরিচিত গ্রন্থটি মহত্ত্বে ও ভারবত্তায় অধিক। এ জন্য এর নাম রাখা হয় মহাভারত।

মহাভারতের বিশালতা তথা দার্শনিক গূঢ়তা কেবল ভারতের পৌরাণিক আখ্যানই নয়, বরং এটিকে সমগ্র হিন্দুধর্ম এবং বৈদিক দর্শন ও সাহিত্যের সারসংক্ষেপ বলা যেতে পারে। 'মহাভারত' নামটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে একটি আখ্যান প্রচলিত যে, দেবতারা তুলাযন্ত্রের একদিকে চারটি বেদ রাখেন ও অন্যদিকে বৈশম্পায়ন প্রচারিত ভারত গ্রন্থটি রাখলে দেখা যায় ভারত গ্রন্থটির ভার চারটি বেদের চেয়েও অনেক বেশি। সেজন্য ভারত গ্রন্থের বিশালতা দেখে দেবগণ ও ঋষিগণ এর নাম রাখেন 'মহাভারত'। একে 'পঞ্চম বেদ'ও বলা হয়। জগতের তাবৎ শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে একে তুলনা করে বলা হয়েছে "মহত্ত্বাদ ভারতবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।" বাংলাতেও মহাভারতের বিশালতা সম্পর্কিত একটি প্রবাদ রয়েছে "যা নেই ভারতে, তা নেই মহাভারতে।" অর্থাৎ ভারতবর্ষে যা নেই 'মহাভারতে'ও তা অনুপস্থিত।

মহোদয়

'মহোদয়' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—মহাশয়, মহানুভব। এটি অনেকটা আরবি 'জনাব' আর ইংরেজি 'স্যার' শব্দের প্রতিশব্দ। 'মহোদয়' শব্দটি সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। তবে বাংলায় 'মহোদয়' শব্দটিকে পারিভাষিক শব্দ বলা যায়। কারণ শব্দটি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় একই অর্থ বহন করে না। মূলত

‘মহৎ’ আর ‘উদয়’—এ দুটো শব্দের সমাসে ‘মহোদয়’ শব্দটির উৎপত্তি। সে হিসাবে ‘মহোদয়’ শব্দের মূল অর্থ দাঁড়ায়—অভ্যুদয়, অতিসমৃদ্ধ, অতি উন্নত। কিন্তু বাংলায় শব্দটির অর্থ— মহাশয় বা মহানুভব।

মাচা

‘মাচা’ শব্দের অর্থ—বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে তৈরি উঁচু স্থান বা উঁচু আসন। সংস্কৃত ‘মঞ্চ’ শব্দ হতে প্রাকৃতের স্তর পার হয়ে বাংলা ‘মাচা’ শব্দের উৎপত্তি। মঞ্চ ও মাচার কাজ বহুলাংশে অভিন্ন হলেও মঞ্চকে মাচা বলে মর্যাদা হানি করতে কেউ চান না। সংস্কৃত হতে প্রাকৃতের স্তর পার হয়ে এসেছে বলে ‘মাচা’ শব্দটি তার আর্য মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। যদিও মঞ্চ ও মাচা তৈরির উপকরণ ও কায়দা অভিন্ন। তবে বাঁশ-কাঠের তৈরি যে উঁচু আসনে বক্তৃতা দেওয়া হয় তা আর ‘মাচা’ থাকে না। অভিজাত লোকজন যেখানে বক্তৃতা দেন সেটি তো আর অনার্য নামের হতে পারে না। ‘মাচা’ শব্দটি মূলত উঁচু আসনের চেয়ে সবজিবাগানে লতা ও ফলের আশ্রয়াসন হিসেবে সমধিক ব্যবহৃত। কুমড়ো, শিম, পুঁই প্রভৃতির লতা উঠানোর আধার ও বিস্তারের ক্ষেত্র হিসাবে বাঁশ-কাঠের তৈরি বেড়াজাতীয় বস্তুটি ‘মাচা’ নামেই বহুল প্রচলিত। অবশ্য গ্রামদেশে এখনও অনেকে বাঁশ-কাঠের তৈরি বিশেষ ধরনের উঁচু স্থানে বসে ক্ষেত পাহারা দেয়। এটিও মাচা। তবে এ মাচায় এসে যদি কেউ বক্তৃতা দিতে শুরু করে তাহলে সেটি তখন আর ‘মাচা’ থাকে না, হয়ে যায় ‘মঞ্চ’। আসলে কাজই আসল, নামটা কেবল ধকল।

মাধুকরী/মাধুকরীবৃত্তি

‘মাধুকরী’ শব্দের অর্থ ভিক্ষাবৃত্তি। যদিও অভিধানে খুঁজতে গেলে ওই একই কথার একটু বিস্তারিত অর্থ পাওয়া যায়। মধুকর বা মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে তেমনি ভিক্ষুকও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অন্ন-বস্ত্র বা মৌলিক চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে। সুতরাং মধুকর ও ভিক্ষুকের কর্ম ও উদ্দেশ্য প্রায় কাছাকাছি। অন্তত পাঁচটি গৃহ থেকে সংগৃহীত ভিক্ষাকে ‘মাধুকরী’ বলা হয়। অভিধানে শব্দটির আরও একটি অর্থ পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে পরের ভাব, তথ্য প্রভৃতি আত্মসাৎ করে নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া। ‘কুম্ভীলকবৃত্তি’র সঙ্গে মাধুকরীবৃত্তির এটাই অর্থগত মিল।

মানসপুত্র

‘মানসপুত্র’ মানে মন হতে উৎপন্ন পুত্র। ব্রহ্মার সাত কিংবা দশজন ‘মন’ হতে জাত পুত্র। এ মানসপুত্র হতে পৃথিবীর মানবজাতির জন্ম। এ দশজন মানসপুত্রকে ‘প্রজাপতি’ বলা হয়। যেমন—মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, দক্ষ, ভৃগু এবং নারদ। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন সাতজন প্রজাপতি ছিলেন। তাঁদের ‘সপ্তর্ষি’ বলা হয়। এ সপ্তর্ষিদের এখন আকাশে তারারূপে দেখা যায়।

মান্ধাতার আমল

‘মান্ধাতার আমল’ অর্থ পুরনো কাল, অনেক আগের। মান্ধাতা এক রাজার নাম। বোঝাই যাচ্ছে যে, এ রাজার রাজত্বকাল ছিল অনেক অনেক দিন আগে; আর তাই পুরনো সময়ের কথা বলতে গেলে বলা হয় ‘মান্ধাতার আমল’। মান্ধাতা ছিলেন সূর্যবংশের রাজা যুবনাশ্বের পুত্র। ‘রামায়ণে’র নায়ক রামও এ সূর্যবংশের রাজা ছিলেন। মান্ধাতার আমল বা রাজত্বকাল কত আগে ছিল, তা বোঝাই যাচ্ছে। মান্ধাতার জন্মের ইতিহাসটা আবার খুব অবাক-করা। যুবনাশ্বের কোনো ছেলে হচ্ছিল না। তখন তিনি মুনিদের আশ্রমে গিয়ে যোগ সাধনা করতে শুরু করলেন; যাতে তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়। একসময় মুনিরা তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হলেন। তখন তাঁর ছেলের জন্য তাঁরা এক যজ্ঞ শুরু করলেন। যজ্ঞ শেষ হলো মাঝরাতে। তখন কলসি ভর্তি মন্ত্রপূত জল বেদিতে রেখে তাঁরা ঘুমাতে গেলেন। কথা থাকল, এই কলসির জল যুবনাশ্বের স্ত্রী খেলে তাঁর ছেলে হবে। কিন্তু রাতে

যুবনাশ্বের খুব তৃষ্ণা পেল। তিনি আর না পেরে নিজেই সে কলসির জল পান করে ফেললেন। সকালে উঠে মুনিগণ পুরো ঘটনা শুনে মুচকি হেসে বললেন, "সন্তান তাহলে তোমার পেট থেকেই হবে।"
তবে তাঁরা যুবনাশ্বকে গর্ভধারণের কষ্ট থেকে মুক্তি দিলেন। একশ' বছর পূর্ণ হলে যুবনাশ্বের শরীর থেকেই মান্ধাতার জন্ম হলো। পরে রাজা হয়ে মান্ধাতা পৃথিবী-বিজয়ে বের হলেন। যুদ্ধ করতে করতে মান্ধাতা সারা পৃথিবীই জয় করে ফেলেন। অবশেষে পৃথিবী-বিজয় শেষ করে স্বর্গরাজ্য জয় করতে যান। তখন ইন্দ্র তাঁকে বলেন, "তুমি তো এখনও পুরো পৃথিবীই জয় করতে পারনি। মধুর পুত্র লবণাসুর এখনও তোমার অধীনতা স্বীকার করেনি। আগে তা করে এস, তারপর স্বর্গ নিয়ে ভেব। লবণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে মান্ধাতা নিহত হন। এই হচ্ছে মান্ধাতার কাহিনি।

মামদো ভূত

বাংলার লোককথায় ভূতের অস্তিত্ব প্রবল। তারা মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেড়ায়। হিন্দুশাস্ত্রে প্রেতযোনিপ্রাপ্ত আত্মাকে 'ভূত' বলে। এরা হিন্দু ভূত। যে দেশে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে সে দেশে হিন্দু ভূতের পাশে মুসলমান ভূত থাকবে না—এমন হতে পারে না। মুসলমান ভূতেরাই হচ্ছে 'মামদো ভূত'। 'মহম্মদীয়' শব্দ থেকে 'মামদো' শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং 'মামদো ভূত' অর্থ মুসলমান ভূত। 'মামদো ভূত' নাকি আবার ভূতের চেয়েও ভয়ঙ্কর। মানুষ কখনো ভূত দেখেনি; দেখবেও না। তবু ভূত আছে, থাকবে এবং ভূতের ভয়ে মানুষের পিলে চমকে উঠবে। ভূত নেই, তবু ভূতের ভয়; এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে!

মামলা

'মামলা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—মোকদ্দমা, ব্যাপার, ঘটনা প্রভৃতি। ফারসি 'মোয়ামেলা' শব্দের বাংলা রূপ হচ্ছে মামলা। ফারসি মোয়ামেলা শব্দের অর্থ—লেনদেন, ব্যবসায়, আচরণ, ব্যবহার প্রভৃতি। তবে এটি বাংলায় এসে তার অর্থ পাল্টে ফেলেছে। বাংলায় 'মামলা' শব্দ মোকদ্দমা দায়ের করা, কোনো জটিল বিষয়কে বোঝানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তবে মোকদ্দমার ক্ষেত্রে শব্দটি আইন-আদালতের জগতে অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। লেনদেন, ব্যবসায়, আচার-আচরণ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এ প্রত্যয়গুলোর অবিচ্ছেদ্য মিথস্ক্রিয়া হচ্ছে জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার মূল অনুষঙ্গ। এসব লেনদেন, আচার-আচরণ, ব্যবসায়, ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্বিমত দেখা দিলে বা কোনোরূপ ঘটনা পরস্পরের স্বার্থ, চিন্তা বা অনুভবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে তা মামালার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষ মামলায় যায়।

মারপ্যাঁচ

'মারপ্যাঁচ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—কূটকৌশল, জাল, ফাঁদ, প্রতারণা প্রভৃতি। 'মার' ও 'প্যাঁচ' শব্দ-দুটোর মিলনে 'মারপ্যাঁচ' শব্দের উৎপত্তি। বাংলা ভাষায় নিজস্ব একটি 'মার' শব্দ রয়েছে। যার চারটি অর্থ আছে। তন্মধ্যে প্রথমত, 'মার' শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃত্যু। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পুরাণে কামদেবতার একটি নাম হচ্ছে 'মার'। তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী তপস্যা বিঘ্নকারী দেবতা বা শয়তানকে 'মার' বলা হয়। চতুর্থত, 'মার' হচ্ছে আঘাত করা। কিন্তু 'মারপ্যাঁচ' শব্দে বর্ণিত 'মার' বাংলা ভাষার নিজস্ব কোনো শব্দ নয় এবং এর অর্থ বর্ণিত চারটির কোনোটিই ধারণ করে না। 'মারপ্যাঁচ' শব্দের 'মার' ফারসি হতে আগত। এর অর্থ সাপ। প্যাঁচ শব্দটিও ফারসি। এর অর্থ কুণ্ডলী। সুতরাং 'মারপ্যাঁচ' শব্দের অর্থ হচ্ছে—সাপের কুণ্ডলী। সাপের কুণ্ডলী ভয়াবহ হোক বা না হোক, সাপ নামের মধ্যেই প্রাচীনকাল হতে কেমন একটা ভীতি বিরাজ করত। যেমন ভীতি বিরাজ করে 'মারপ্যাঁচ' শব্দে।

মারের সাগর

"আমি মারের সাগর পাড়ি দেব "— এটা কোন সাগর? 'মারের সাগর' বলতে কবি এমন একটি স্থান/সাগর/প্রান্তর বুঝিয়েছেন যেটি 'ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এবং যা পাড়ি দেওয়া জীবনযুদ্ধের ন্যায় কষ্টকর।' 'মার' বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত সহজ ও বহুমাত্রিক অর্থদ্যোতক একটি শব্দ। যেকোনো সাধারণ অভিধানেও এর অর্থসমূহ দেওয়া আছে। 'মার' শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি 'র/এর' যুক্ত হয়ে 'মারের' শব্দটির উৎপত্তি। এটি কোনো বিদেশি শব্দ নয়। 'মার' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'সাগর'ও নয়। তাহলে 'মারের সাগর' অর্থ হয়ে যায় 'সাগর সাগর'।

এবার 'মার/মারের' শব্দের অর্থ কী দেখা যাক। মার (মারণ, মারা); মার = মর-হতে জাত। মারণ = মার (অন) যাতে। মারের = মার + এর। মারা = মার এর আধার যে। মার = বিরহীকে মারে যে (বিরহী-মারক)। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর বঙ্গীয় শব্দার্থকোষে সুস্পষ্টভাবে মার (মারের) অর্থ দেওয়া হয়েছে। মার = মারক, বিনাশক, ঘাতক, মারণ, তাড়ন, কাম, মৃত্য ...ইত্যাদি; প্রহার, আঘাত, বিনাশ, শাসন..., বিনাশ করা, বধ করা, প্রহার করা ইত্যাদি। 'মারের সাগর' মানে দুঃখময় সংসার, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর, ভয়ঙ্কর সাগর, কষ্টময় জীবন। এখানে 'মারের' অর্থ শুধু সাগর নয়; মানুষকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়, অনেক বিরহ, ব্যথা, প্রিয়জনের মৃত্যু, বঞ্চনা ও বেদনা বহন করতে হয়। এ জীবনযুদ্ধই হচ্ছে 'মার' এবং মারের সাগর হচ্ছে এমন সংগ্রামমুখর সাগর। এখানে কবি 'সাগর' বলতে জীবনকে বুঝিয়েছেন এবং 'মার' শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন কঠিন ও সংগ্রামমুখর জীবন।

মার্কিন

'মার্কিন' শব্দটি এককভাবে পরিচিত না হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যাপকভাবে পরিচিত। আমেরিকা পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র। বিশ্বে এমন লোক খুব কম আছেন যিনি আমেরিকার নাম শোনেননি। আমেরিকা আমাদের অনেকের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামে পরিচিত। আমেরিকানদের অনেকে মার্কিনি বলেন। আমেরিকান শব্দটি ইংরেজি শব্দ American হতে এসেছে। আমেরিকান শব্দের আদ্যক্ষর এ (A) ঝরে গিয়ে প্রথমে হয়েছে মেরিকান, যার অপভ্রংশ মার্কিন Markin.

মালাউন

বাংলা একাডেমির 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে'র পরিমার্জিত সংস্করণের ৯৮১ পৃষ্ঠায় 'মালাউন' শব্দের তিনটি অর্থ দেওয়া আছে—১. লানতপ্রাপ্ত; অভিশপ্ত; বিতাড়িত; কাফের। ২. শয়তান। ৩. মুসলমান কর্তৃক ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে প্রদত্ত গালিবিশেষ। অভিধানের ১০৫৪ পৃষ্ঠায় 'লানত' শব্দেরও তিনটা অর্থ দেওয়া আছে —১. অভিশাপ। ২. অপমান; লাঞ্ছনা; ভর্ৎসনা। ৩. শাস্তি।

মাস্তান

'মাস্তান' শব্দটি ফারসি থেকে বাংলায় আসে। ফারসি 'মাস্তান' শব্দের অর্থ—নেশাগ্রস্ত, মাতাল, দুর্বৃত্ত, গুন্ডা ইত্যাদি। ফারসি 'মাস্ত' শব্দের অর্থও মাস্তানের মতো। উপমহাদেশে মুসলিম যুগে সুফি-দরবেশ, ঐশীপ্রেমে মত্ত, ভাবে-উন্মত্ত, জিকিরে-দেওয়ানা, বিবাগী ও খোদা-প্রেমে পাগল সুফিগণ নিজেদের 'মাস্তান' বলা শুরু করেন। সাধারণ মানুষও বুঝে না-বুঝে সুফি-দরবেশগণকে 'মাস্তান' বলতে শুরু করেন। ফলে পারস্যের দুর্বৃত্ত মাস্তান বাংলায় দরবেশ মাস্তানে পরিণত হয়। এভাবে ফারসি 'মাস্তান' তার আদি অর্থ হারিয়ে ফেলে। সৌভাগ্যের কথা, এমনটি বেশি দিন থাকেনি। বাঙালিরা অল্পদিনের মধ্যে তাদের ভুল বুঝতে পারে। ফলে ফারসি 'মাস্তান' তার আদি অর্থ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। বর্তমানে 'মাস্তান' শব্দের বাংলা অর্থ—উপদ্রবকারী, চাঁদাবাজ, বদমায়েশ, গুণ্ডা প্রভৃতি। মাস্তান বলতে এখন মধ্যযুগের মতো আর দরবেশ বোঝায় না।

মিছরি

'মিছরি' চিনি থেকে প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্টান্ন। প্রকৃতপক্ষে 'মিছরি' হলো স্ফটিকের মতো দানাবাঁধা চিনি। প্রধানত চিনির তৈরি বলে মিছরি সাধারণত লালাভ সাদা রঙের হয়ে থাকে। হাইড্রোজ নামক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে মিছরিকে সাদা করা হয়। তবে নানা প্রকার রঙ মিশিয়ে এটাকে বিভিন্ন রঙ দেওয়া হয়। বিভিন্ন ছাঁচে ঢালাই করে একে নানারকমের আকার দেওয়া হয়। 'মিছরি' নামের এ সুমিষ্ট শর্করাটি প্রথম মিসরে উৎপন্ন হয়েছে। এটি মিসর থেকে বণিক ও পর্যটকদের মাধ্যমে উপমহাদেশে আসে এবং ক্রমান্বয়ে এখানেও প্রস্তুত হতে থাকে। মিসর থেকে এসেছে বলে এর নাম হয় 'মিসরি', যা অপভ্রংশে 'মিছরি' নামে স্থিতি লাভ করে।

মিছিল

শব্দটির অর্থ—মিছিল, পঙক্তি, সারি প্রভৃতি। শব্দটির উৎস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শব্দটি আরবি ভাষা হতে ফারসি হয়ে বাংলায় এসেছে। বাংলায় ব্যবহৃত মিছিল শব্দটি আরবি হতে ফারসি ভাষায় আগত 'মিসল' শব্দের মৌখিক রূপান্তর। মিসল শব্দের অর্থ— সমজাতীয়, অভিন্ন রূপ, একই রকম, বিন্যস্ত, সমান, সমকক্ষ, সারি সারি প্রভৃতি। বাংলাতেও একসময় 'মিছিল' শব্দটি ফারসি মিসল শব্দের অর্থ বহন করত। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে 'মিছিল' শব্দটি রয়েছে। এখানে ব্যবহৃত 'মিছিল' শব্দের অর্থ হচ্ছে— মোকদ্দমার কাগজপত্র, কাগজপত্রের ফাইল, নথি ইত্যাদি। মোকদ্দমার কাগজপত্র, ফাইল বা নথি প্রভৃতি বিন্যস্ত অবস্থায় রাখা হয় এবং অধিকন্তু একই নথিতে সমধর্মী বা সমপ্রকৃতির কাগজপত্র সজ্জিত করা হয়। এগুলো মিসল শব্দের অর্থকে অভিন্নভাবে নির্দেশ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আড়তে গুড়ের কলসি 'মিছিল' করা হয়। এর অর্থ— গুড়ভর্তি কলসিগুলো সারি সারি করে সাজিয়ে রাখা বা বিন্যস্ত করা। এ গুড়ের কলসি মিছিলের সঙ্গেও কিন্তু 'মিসল' শব্দের অর্থের মিল রয়েছে। মোটরসাইকেল মিছিল, মোমবাতি মিছিল প্রভৃতি মিছিলেও সারি সারি ভাব লক্ষ করা যায়। কিন্তু এখন 'মিছিল' বলতে সারি, পঙক্তি না-বুঝিয়ে রাস্তায় কোনো উদ্দেশ্যে বা দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে একাধিক মানুষের সম্মিলিত যাত্রা বোঝায়। এখানে মানুষের সারি বিন্যস্ত হোক বা না হোক তাতে কিছু যায় আসে না। মিছিল বলতে যা-ই বোঝানো হোক না কেন, বাংলার 'মিছিল' শব্দের সঙ্গে সমজাতীয়, অভিন্ন রূপ, একইরকম, সারি সারি, সমান, সমকক্ষ প্রভৃতি কম-বেশি বিভিন্নভাবে জড়িত। যখন কোনো মিছিল হয় তখন এগুলো মিছিলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। সমজাতীয়, সারি সারি কিংবা সমকক্ষ না হলে তো আর মিছিল চলে না।

মিথিলা

প্রাচীন রাজ্য বিদেহের রাজধানী। এটি উত্তর বিহারে অবস্থিত। রাজা জনকের নগর হিসাবে প্রসিদ্ধ। এর অন্য নাম বিদেহ। এ জন্য মিথিলার রাজকন্যার নাম মৈথিলী বা বৈদেহী। বিশ্বামিত্র তাড়কাবধের সময় রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে মিথিলা গিয়েছিলেন।

মীরজাফর

একসময় মীরজাফর ছিল একটি নাম, এখন নাম নয়; শব্দ। 'মীরজাফর' শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ— বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক। একসময় মীরজাফর ছিল একটি খুব জনপ্রিয় নাম। মুসলিম শাসনামলে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদদৌলার পরাজয়ে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতামূলক ভূমিকার পূর্বে অনেকে তাদের সন্তানদের নাম রাখত মীরজাফর। মীরজাফর ছিলেন নবাব সিরাজউদদৌলার ভগ্নিপতি ও প্রধান সেনাপতি। নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর মীরজাফর প্রথমে ঘসেটি বেগম ও শওকতজঙ্গ প্রমুখের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নবাব সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে মীরজাফর সাহেব মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ,

উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রমুখ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে। মীরজাফর নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত হন। পরে মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে সিরাজকে হত্যা করা হয়। সিরাজের সেনাপতি হয়ে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতামূলকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে কাজ করেছেন। তাঁর এ কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি বাংলার ইতিহাস ও সাহিত্যে বিশ্বাসঘাতকতার সমার্থরূপে স্থায়ী হয়ে যান। মীরজাফর শব্দের বিশ্বাসঘাতকতা-অর্থ আর মুছবে না কখনো।

মুগ্ধ

'মুগ্ধ' শব্দের অর্থ—মোহিত, বিহ্বল, বিভোর, অভিভূত, মনোহর প্রভৃতি। বাংলায় বহুল প্রচলিত হলেও 'মুগ্ধ' একটি সংস্কৃত শব্দ। সংস্কৃত ভাষায় 'মুগ্ধ' শব্দের অর্থ—মূঢ়, মোহগ্রস্ত বা মোহাবিষ্ট। মূঢ় শব্দের অর্থ—অবিবেচক, বোকাচণ্ডি, বিবেচনাশূন্য, মূর্খ, আহাম্মক, নির্বোধ, তালমাল বোধহীন প্রভৃতি। মোহগ্রস্ত বা মোহবিষ্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে—বিবেকহীন, মোহ দ্বারা পরিচালিত বিবেচনাহীন ব্যক্তি। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় 'মোহ' শব্দের কোনো অর্থই নন্দিত নয়, সবগুলো অর্থই নিন্দিত, কেউ এমন অর্থ বহন করতে চায় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় এসে শব্দটি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকার মতো আগ্রহে অভিভূত হয়ে উঠেছে। এর কারণ রয়েছে। আসলে কেউ কোনো কিছু দর্শনে মোহিত হয়ে গেলে, বিহ্বল হয়ে পড়লে তার কোনো বিবেচনাবোধ থাকে না। বিবেচনাশূন্য নির্বোধের মতো আচরণ করতে শুরু করে। তার অন্যতম প্রমাণ প্রেম। কেউ তার প্রেমিক বা প্রেমিকায় মুগ্ধ হয়ে কিংবা কোনো বস্তুর প্রতি মুগ্ধ হয়ে যে আচরণ করে থাকে সেখানে সংস্কৃত 'মুগ্ধ' শব্দের সবগুলো উপাদানই কিছু না কিছু পাওয়া যায়।

মুদ্রাদোষ

'মুদ্রা' ও 'দোষ' শব্দ নিয়ে মুদ্রাদোষ শব্দটি গঠিত। 'মুদ্রা' মানে টাকাপয়সা, অর্থ, সিলমোহর, ছাপ, হিন্দুদের দেবপূজাকালে বিভিন্ন ভঙ্গিতে করবিন্যাস, নাচের অঙ্গভঙ্গি, করতল বা পদতলের বিশেষ চিহ্ন প্রভৃতি। সুতরাং নানা কাজে ব্যক্তিবিশেষের বিভিন্ন মুদ্রা বা চিহ্ন বা অঙ্গভঙ্গি থাকে। সবার কথা বা বাচনভঙ্গি এক নয়। প্রত্যেকে একটি নিজস্ব মুদ্রা বা আঙ্গিকে আচরণ করে। তা হাতের, মুখের, চোখের বা শরীরের কিংবা স্বরবিস্তার, অঙ্গপরিচালনা যেকোনোভাবে হতে পারে। এ সব মুদ্রার অতি ব্যবহার কিংবা যে ব্যবহার অন্যের কাছে দোষের মনে হয় তা-ই 'মুদ্রাদোষ' হয়ে পড়ে। মুদ্রার সাথে 'কর' যোগ হলে হবে 'মুদ্রাকর'— ছাপাখানায় যে বই ছাপায়; '-ক্ষর' যোগ হলে ছাপবার টাইপ; '-ঙ্কন' যোগ হলে সিল প্রভৃতির ছাপ; '-ঙ্কিত' হলে ছাপযুক্ত; '-দোষ' যোগ হলে একই বাচনভঙ্গি বা স্বভাবগত বাগভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি করার কুঅভ্যাস; 'বিজ্ঞান' যোগ হলে ধনতন্ত্র; আর '-যন্ত্র' যোগ হলে হবে ছাপা-কল যার অর্থ—'মুদ্রাযন্ত্র'।

মুষ্টিমেয়

'মুষ্টিমেয়' শব্দের আভিধানিক অর্থ—সামান্য, অল্পস্বল্প, একমুঠো, অল্পমাত্র প্রভৃতি। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে সে পরিমাণ বস্তু, যা এক মুষ্টিতে ধারণ করা যায়। অর্থাৎ এক মুঠো পরিমাণকে মুষ্টিমেয় বলা হয়। কিন্তু প্রায়োগিক অর্থে মুষ্টিমেয় বলতে শুধু একমুঠো পরিমাণকে বোঝায় না। এক মুঠোর বেশি হোক বা কম হোক সামান্য পরিমাণ বোঝাতে 'মুষ্টিমেয়' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এর অন্য একটি অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে যা প্রয়োজনের তুলনায় কম তা-ই 'মুষ্টিমেয়'। অনেক সময় গণনার ক্ষেত্রেও 'মুষ্টিমেয়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন—অনেককে বলতে শোনা যায়, 'মুষ্টিমেয় লোক সভায় উপস্থিত হয়েছে'।

মুহূর্ত

খুব স্বল্প সময়ে, ক্ষণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে 'মুহূর্ত' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কোনো বিষয়ে সময়ের স্বল্পতা বোঝাতে

শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন—মুহূর্তের মধ্যে বন্যায় সবকিছু শেষ হয়ে গেল। বিশাল শহরটি ভূমিকম্পের আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে ভূমিস্যাৎ হয়ে গেল। বাক্য দুটোতে ব্যবহৃত 'মুহূর্ত' শব্দটি একটি সময়জ্ঞাপক পদ। কিন্তু সময়টা কতক্ষণ? বাক্য দুটোয় একই শব্দ ব্যবহার করা হলেও বন্যা ও ভূমিকম্প একই সময়ে সবকিছু শেষ করে দেয়নি। এখানে সময়ের ব্যবধান থাকলেও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে 'মুহূর্তে'র একটি সময়সীমা আছে। প্রাচীন ভারতীয় হিসাবমতে মুহূর্তের সময়কাল আটচল্লিশ মিনিট। কিন্তু বাগভঙ্গিতে এটা আটচল্লিশ মিনিট বোঝায় না। এটা খুবই স্বল্পসময় বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। নিশ্চিতই আটচল্লিশ মিনিটের চেয়ে কম। 'দেখতে না দেখতে মুহূর্তের মধ্যে বাসটি উল্টে নদীতে পড়ে গেল।' এখানে বাসটি নদীতে উল্টে পড়তে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। তবু 'মুহূর্ত' দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

মৃগতৃষ্ণা

'মৃগ' মানে হরিণ এবং 'তৃষ্ণা' মানে পিপাসা। উল্লেখ্য, মৃগ বলতে এখন শুধু হরিণ বোঝালেও একসময় মৃগ বলতে যেকোনো ধরনের পশুকে বোঝাত। সুতরাং 'মৃগতৃষ্ণা' মানে—হরিণের পিপাসা বা পশুর পিপাসা। মরুভূমিতে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে বালির উপর প্রতিফলিত সূর্যকিরণ দূর থেকে স্বচ্ছ জলাশয়ের মতো মনে হয়। মরুভূমিতে জলাশয়রূপ এ-ভ্রান্তিকে বলা হয় 'মরীচিকা'। মরুভূমিতে পিপাসায় কাতর মৃগ পানির খোঁজে বের হয়ে এদিক-ওদিক তাকালে অদূরে জলাশয়রূপ ভ্রান্তিকে প্রকৃত জল মনে করে ছুটে যেত। হরিণ যত এগিয়ে যায় জলাশয়ভ্রান্তি তত দূরে সরে যায়। তৃষ্ণায় কাতর মৃগ জলের আশায় আরও দ্রুত দৌড়ায়। মৃগ যত দ্রুত দৌড়ায় জলাশয়ভ্রান্তিও তত দূরে সরে যায়। এভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে তৃষ্ণার্ত মৃগ কাতর হয়ে ঢলে পড়ে। তপ্ত রৌদ্রে ভীষণ কষ্টে অচিরে প্রাণ হারায়। মৃগের এ তৃষ্ণা নিবারণার্থে ছুটে চলা ভ্রান্তি ও মৃত্যুর কথা প্রকাশ করা হয় 'মৃগতৃষ্ণা' শব্দটির মাধ্যমে। তবে এখন শব্দটি শুধু মরীচিকা প্রকাশ করে না। ভ্রান্তির পেছনে ছুটে চলার মাধ্যমে জীবন ও সহায়সম্পদের ক্ষতিকেও বোঝানো হয়।

মৃগনাভি

কস্তুরি শব্দের মানে কী? সোজা উত্তর—মৃগনাভি। 'মৃগ' মানে হরিণ। সুতরাং মৃগনাভি মানে হরিণের নাভি। তবে এর আভিধানিক অর্থ বলতে শুধু মৃগনাভি বোঝায় না। বাংলা অভিধানে মৃগনাভি = কস্তুরি। আবার কস্তুরি = মৃগনাভি।

মেমসাহেব

'মেম' ও 'সাহেব' শব্দ দুটোর সমন্বয়ে 'মেমসাহেব' শব্দটির উৎপত্তি। 'মেমসাহেব' শব্দের অর্থ—ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান মহিলা, চাকরিদাতার স্ত্রী, মহিলা চাকরিদাতা, কেতাদুরস্ত মহিলা প্রভৃতি। 'মেমসাহেব' শব্দটার বহুমুখী ব্যবহার লক্ষণীয়। বাসগৃহে কর্মরত শ্রমজীবীরা তাদের মালিকের স্ত্রী বা মহিলা মালিককে মেমসাহেব ডাকে। আবার অনেকে সৌখিন ও কেতাদুরস্ত নাতনি বা নাতবউকেও 'মেমসাহেব' ডাকে। ইংরেজি madam শব্দের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ ma'am থেকে বাংলায় 'মেম' শব্দের উৎপত্তি। ইংরেজ আমলে সাদা চামড়ার মহিলারা 'মেম' এবং সাদা চামড়ার পুরুষরা 'সাহেব' নামে অভিহিত হতো। সাহেবের স্ত্রী বা কন্যা বা প্রতিভূ হিসেবে মেমগণ ধীরে ধীরে মেমসাহেব হয়ে যায়। তৎকালে 'মিসিবাবা' নামের আর একটি শব্দ প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ গৃহভৃত্যরা ইংরেজ মালিকের কন্যাদের সম্মানসূচক 'মিসিবাবা' নামে ডাকত। ইংরেজি মিস অর্থাৎ অবিবাহিতা মেয়ে বোঝাতে 'মিসিবাবা'। ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হলে ইংরেজি মহিলা তথা মেমগণ স্বদেশে ফিরে গেলে স্থানীয় ধনী ও প্রভাবশালী মহিলারা মেমসাহেবের শূন্যস্থান দখল করে নেয়। তবে 'মিসিবাবা' সম্বোধনটি এখন আর শোনা যায় না। তবে 'মেমসাহেব' বেশ শোনা যায়।

মেরাশিসমুদ্গারিণী

শব্দটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে রয়েছে। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (২০১০ খ্রিস্টাব্দ)-এ, ১. সমুদগীর্ণ—বিশেষণ, কৃতোদ্গার; বমিত। ২. উক্ত; উচ্চারিত; কথিত। এ থেকে সমুদ্গারিণী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এবার দেখা যাক 'মেরাশি' শব্দের অর্থ। বঙ্কিমচন্দ্র হুঁকার বিশেষণ হিসাবে ব্যঙ্গ করে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। লাইন দুটো হলো 'হে হুক্কে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃত মেরাশিসমুদ্গারিণী!' এখান থেকে 'মেরাশি' শব্দের অর্থ জানা যায়। "একজন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা আনিয়া সম্মুখে দিল; দেবেন্দ্র কিছুকাল সেই সর্বশ্রমসংহারিণী তামাকুদেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদসুখভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। হে সর্বলোকচিত্তরঞ্জিনী বিশ্ববিমোহিনী! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবলা, হুঁক্কা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে, হুঁক্কে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণী!" শব্দাংশটি মেরাশি নয়, বরং ধূমরাশি। সুতরাং মেরাশি শব্দের অর্থ—ধূমরাশি।

মৌজ

'মৌজ' শব্দের বর্তমান প্রচলিত ও আভিধানিক অর্থ—আনন্দ, উল্লাস, মহাসমারোহ, নেশাগ্রস্ততা। 'মৌজ' কিন্তু আরবি শব্দ। আরবি ভাষায় শব্দটির অর্থ—ঢেউ। এখন দেখা যাক, আরবের ঢেউ কেন বাংলায় আনন্দ-উল্লাস হয়ে গেল। আরবে নদী ছিল না, মরুভূমির তপ্ত হাওয়ায় আরবীয়রা ছিল সর্বক্ষণ ম্লান, অতিষ্ঠ। তাদের কাছে নদী ছিল স্বপ্ন। তাই স্বর্গকে আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে গড়ে তোলার জন্য স্বর্গের পরতে পরতে রাখা হয়েছে নির্ঝরিণী। আরবের লোকেরা ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে বণিক বা ধর্মপ্রচারক হিসেবে উপমহাদেশে এসেছে। এখানে এসে তারা নদীর ঢেউ দেখে মৌজ মৌজ স্বপ্নে গভীর আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। এভাবে আরবের ঢেউ বাংলায় উল্লাসে পরিণত হয়। আসলে 'ঢেউ' বাংলা সাহিত্যে এক মোহনীয় শব্দ। কবি-সাহিত্যিকগণের ভাষায় 'ঢেউ' কমনীয়রূপে স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছে। নদীর ঢেউয়ে তারা দেখেছে আনন্দ এবং মনের ভেতর উদ্বেল হয়ে ওঠা রূপের মাধুর্য। ঢেউ প্রেম-সারথি হয়ে যুগ যুগ ধরে বাংলা মায়ের সন্তান-সন্ততিদের হারিয়ে দিয়েছে উল্লাসের মহাসমারোহে। এমন একটা প্রাকৃতিক বিষয় তো মৌজময় হয়ে থাকারই কথা।

ম্যাগাজিন

'ম্যাগাজিন' শব্দের অর্থ—সাময়িক পত্রিকা, পাঁচমিশালি বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান, কার্তুজের কুঠরি, অস্ত্রভাণ্ডার প্রভৃতি। আরবি 'মাখজান' শব্দ হতে ইংরেজি 'ম্যাগাজিন' শব্দের উৎপত্তি। 'মাখজান' শব্দের অর্থ ভাণ্ডার। ইংরেজি ভাষা শব্দটিকে এ অর্থে গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা করেছিল শব্দটির সামরিকীকরণের মাধ্যমে। যন্ত্রপাতি, গোলাবারুদ ইত্যাদির ভাণ্ডার এবং রাইফেল ও রিভলবারের কার্তুজ— কুঠরি প্রভৃতি বোঝাতে ইংরেজরা 'ম্যাগাজিন' শব্দটি গ্রহণ করে।

১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন থেকে 'The Gentleman's Magazin' নামের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সূত্রে 'ম্যাগাজিন' শব্দটি নতুন তাৎপর্য লাভ করে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে জানানো হয়—"এটি অস্ত্রভাণ্ডার নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব তথ্যভাণ্ডার। প্রতি মাসে এ ভাণ্ডারে অজ্ঞতা নাশ করার জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন অস্ত্র জমা হতে থাকবে। এ জন্যই এটির নাম ম্যাগাজিন রাখা হলো।" সম্পাদকীয়টি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এর পর থেকে 'ম্যাগাজিন' শব্দটি নতুন সাময়িক পত্রিকা, পাঁচমিশালি বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

য

যজুর্বেদ

শত শাখাযুক্ত বেদ। এতে যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্রসমূহ ও নিয়ম পালনের মন্ত্রসমূহ নানাবিধ বিবরণসহ বর্ণিত আছে। এ বেদ কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ নামে দুই ভাগে বিভক্ত।

যজ্ঞ

'যজ্ঞ' আর্য জাতির প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দেবতার উদ্দেশে কোনো দ্রব্য দান করাকে 'যজ্ঞ' বলা হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ প্রধানত যজ্ঞের বিবরণে পূর্ণ। কোন যজ্ঞে কী অনুষ্ঠান কর্তব্য, তা ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে বিধৃত আছে। ইন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, রুদ্র প্রমুখের উদ্দেশে কোনো না কোনো দ্রব্য ত্যাগ করা হতো। এ ধরনের ত্যাগকে 'আহূতি' বলা হয়। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হতো তার নাম 'হব্য'। এ দ্রব্য ত্যাগের নাম 'যাগ'। যে গৃহস্থের কল্যাণে যাগ অনুষ্ঠিত হতো তিনি 'যজমান'। যিনি যজমানের হিতার্থে এ যাগকর্ম সম্পাদন করতেন তিনি যাজক বা 'ঋত্বিক'। ঘৃত, চরু বা পায়সান্ন, দুগ্ধ, দধি, রুটি, পশুর মাংস, সোমলতার রস প্রভৃতি হব্যরূপে দেওয়া হতো।

যত দোষ নন্দ ঘোষ

এ বাগধারাটি শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা নন্দ গোয়ালা বা ঘোষের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষ্ণকৃত বা তৎসময়ে সংগঠিত সকল অঘটনের দায় বর্তাত নন্দ ঘোষের কাঁধে। আবার অনেকে মনে করেন রাজা নন্দকুমার হতে এই বাগধারাটির উৎপত্তি।

"রাজা নন্দকুমার ছিলেন নবাব সিরাজউদদৌলার অধীনে হুগলীর গভর্নর এবং লর্ড ক্লাইভের আমলে তিনি কালো কর্নেল নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। কারণ তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি বিশেষভাবে অনুগত ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চে তিনি কাউন্সিলের সদস্য ফ্রান্সিস-এর কাছে একটি চিঠিতে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করেন। তিনি উল্লেখ করেন—গুরুদাসকে দেওয়ান নিযুক্ত করার বিনিময়ে ১,০৪,১০৫ রুপি এবং মুন্নু বেগমকে নাবালক নবাব মুবারক-উদ-দৌলার অভিভাবক নিয়োগের বিনিময়ে ২,৫০,০০০ রুপি ঘুষ গ্রহণ করেন হেস্টিংস। কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়। কাউন্সিল ঘুষ হিসেবে গৃহীত টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতি নির্দেশ দেন। এ ঘটনার কয়েক মাস পর গভর্নর জেনারেল এবং বরওয়েল-এর উদ্যোগে ফক্স এবং রাধাচরণের সঙ্গে নন্দকুমারকে ষড়যন্ত্রের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়।

ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি নন্দকুমারের নামে জালিয়াতির মামলা করা হয়। প্রধান বিচারপতি ইলিজা ইমপে ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুন নন্দকুমারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দেওয়া হয়। নন্দকুমারের আইনজীবী ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই জুন হতে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত নন্দকুমারের জীবন রক্ষার্থে প্রিভি কাউন্সিলে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল এবং প্রিভি কাউন্সিলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর না করার জন্য দরখাস্ত করেন। সুপ্রিম কোর্ট এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। নবাব একটি পত্রে প্রিভি কাউন্সিলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত দন্ডাদেশ না পালনের অনুরোধ করেন। সে অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করা হয়। অবশেষে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট সকাল ৮টায় ফোর্ট উইলিয়ামের নিকটবর্তী কুলিবাজারে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ কার্যকর হয়। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ?'

যথেষ্ট

প্রচুর, অনেক, খুব, ঢের প্রভৃতি। 'যথা' ও 'ইষ্ট' শব্দ হতে 'যথেষ্ট' শব্দের উৎপত্তি। 'যথা' শব্দের অর্থ—যা, এবং 'ইষ্ট' শব্দের অর্থ— মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর। সুতরাং 'যথেষ্ট' শব্দের অর্থ হচ্ছে সে বিষয় যা কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক। এটি বললাম ব্যাকরণগত অর্থ। কিন্তু 'যথেষ্ট' শব্দের প্রচলিত ও অভিধানগত অর্থ হচ্ছে—প্রচুর, অনেক, খুব, বেশি, ঢের। তো কেন এ পরিবর্তন? বাঙালিরা তাদের মাটি আর সবুজ প্রান্তরের মতো সরস এবং আবেগপ্রবণ। এ শব্দটির পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালির মননশীলতা ও মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। প্রচুর পেলে মানুষ সন্তুষ্ট হয়, সম্পদ বেশি হওয়া মানে অধিক মঙ্গল। পেট পুরে খেতে কে না চায়। সুতরাং যা মঙ্গল করে তা হচ্ছে অধিক, বেশি, অনেক। এ সতত ইচ্ছাটির কারণে 'যথেষ্ট' শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। তবে যথেষ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক হলেও সবসময় কিন্তু নয়। যেমন—যথেষ্ট হয়রানির শিকার হওয়া কি মঙ্গলজনক? কিন্তু সেটিও তো 'যথেষ্ট'।

যবন

প্রাচীন ভারতে আলেকজান্ডার পরিচিত ছিলেন যবনরাজ হিসাবে। বেদ-বিশ্বাসী ভারতীয়দের কছে বেদ-অবিশ্বাসী বিদেশি মাত্রই ছিল যবন। শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত বলে মনে হয় না। এর ব্যুৎপত্তি [যু + অন (যুচ)-ক]; অর্থ—বৈদেশিক, বর্বর, ইউরোপীয়, ইংরেজি, মুসলমান, গ্রিক বা আইওয়ানবাসী ও বেগবান অশ্ব প্রভৃতি। প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে ম্লেছ ও যবন সমার্থক। বৌধায়নশাস্ত্রে বলা হয়েছে, ম্লেছরা গোমাংস ভক্ষক, বিরুদ্ধভাষী সর্বাচারহীন অন্ত্যজ জাতি। এ থেকে অনুমান করা যায়, ভারতীয়রা গোমংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করার পর ম্লেছ শব্দটির উৎপত্তি।

কালিদাস যবন বলতে গ্রিকদের বুঝিয়েছেন। আইওনিয়া (Ionia) বা প্রাচীন গ্রিস 'যবন' শব্দের মূল উৎস। আইওনিয়া ফারসিতে 'ইউনান' বা 'য়ুনান'। এ ইউনান বা য়ুনান থেকে সংস্কৃত 'যবন' শব্দের উৎপত্তি। প্রথমে যবন শব্দের অর্থ ছিল গ্রিকবাসী। কারণ তারা বেদ মানত না। গ্রিকদের ন্যায় ভারতের পশ্চিমের দেশগুলোর মানুষও বেদাচারী ছিল না। তাই গ্রিকদের মতো প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে তারাও ছিল যবন। এ জন্য আইওনিয়া, গ্রিস ও পরবর্তীকালে আগত আরবীয়, ইউরোপীয়, ইংরেজ—সবাই যবন। শব্দটির আর এক অর্থ বেগবান অশ্ব। প্রাচীন গ্রিকরা বেগবান অশ্বে চড়ে এসেছিল বলে হয়তো ভারতীয় বৈয়াকরণরা শব্দটির এ রকম অর্থ নির্ধারণ করেছিল।

ওপরের আলোচনায় 'যবন' শব্দের চারটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত, তারা বিদেশাগত ও বিভাষী। দ্বিতীয়ত, তারা বেদ মানে না বা বেদ বিশ্বাস করে না, তৃতীয়ত, তারা গোমাংস-ভক্ষক ও সদাচারহীন। চতুর্থত, তারা বেগবান অশ্বারোহী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যবন শব্দটির চূড়ান্ত অপব্যবহার ঘটান। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে 'যবন' শব্দকে মুসলমানের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ তিনি যবনের চারটি বৈশিষ্ট্যই মুসলমানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। সাহিত্যকর্মে ঋষি বঙ্কিমের এমন অঋষিসুলভ আচরণ বাঙালি এখনও ভুলতে পারেনি।

যবনিকা

'যবন' থেকে যবনিকা। প্রাচীন ভারতে আলেকজান্ডার পরিচিত ছিলেন যবনরাজ হিসেবে। বেদ-বিশ্বাসী ভারতীয়দের কাছে বেদ-অবিশ্বাসী বিদেশি মাত্রই ছিলেন 'যবন'। যবন-রাজ আলেকজান্ডার ভারত বিজয়ের পর উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রিক বা যবনরা বিশাল একটা এলাকা দখল করে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করে। এখানে গ্রিকদের নিজস্ব ব্যবসায়-বাণিজ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রশাসন ও রাজ্যপাট ছিল। গ্রিক বা যবনদের নাট্যকলাকে দ্বিতীয় শতকে যিনি ভারতীয় সাহিত্যে স্থান করে দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন অশ্বঘোষ। অশ্বঘোষই প্রাচীন ভারতের

প্রথম নাট্যকার। প্রথম ভারতীয় নাটক হচ্ছে উর্বশী বিয়োগ। যবনরা তাঁদের নাটকে চিত্রপট ব্যবহার করতেন। অশ্বঘোষও তার নাটকে চিত্রপট ব্যবহার করতেন এবং যবনদের কলাবিদ্যাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি চিত্রপটের নাম দেন 'যবনিকা'।

যুধিষ্ঠির

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। শতশৃঙ্গপর্বতে ধর্মের সঙ্গমে কুমন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তিনি ধর্ম, ধর্মরাজ ও ধর্মপুত্র নামে খ্যাত। দুর্বাসার প্রদত্ত ক্ষমতায় কুমন্তী মন্ত্রবলে যেকোনো দেবতাকে আহ্বান করতে পারতেন। স্বামীর অনুমতিক্রমে কুমন্তী ধর্মকে আহ্বান করে যুধিষ্ঠিরকে লাভ করেন। তাঁর জন্মকালে দৈববাণী হয় যে—এ জাতক ধার্মিকশ্রেষ্ঠ, নরোত্তম, সত্যবাদী ও পৃথিবীপতি হবেন। এখনও কোনো লোক ধার্মিক ও সত্যবাদী হলে তাঁকে 'ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠি'র বলা হয়। অনেক সময় উপহাসচ্ছলে কথাটি বলা হয় যদিও।

যোজন

'যোজন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—পথের নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব, সংযোজন, বিয়োজনের বিপরীত, একত্রকরণ প্রভৃতি। দূরত্ব পরিমাপের প্রাচীন দেশীয় একক থেকে 'যোজন' শব্দটির উৎপত্তি। প্রাচীন হিসাবমতে, এক যোজন সমান চার ক্রোশ। আবার এক ক্রোশ সমান চার হাজার হাত এবং এক হাত সমান আঠারো ইঞ্চি। একসময় সাধারণ মানুষের জন্য হাঁটাই ছিল নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর একমাত্র উপায়। কতদূর পথ অতিক্রম করা হলো তা জানার এবং জানাবার জন্য পরিমাপের একক হিসাবে 'যোজন' শব্দটি প্রয়োগ করা হতো। এখন কিন্তু 'যোজন' শব্দের অর্থের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। অতিক্রম বলতে এখন শুধু দূরত্ব বোঝায় না, সফলতার সিঁড়িও বোঝায়।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

র

রবিশস্য

'রবি' ও 'শস্য' শব্দদ্বয় মিলে 'রবিশস্য' শব্দের উৎপত্তি। যার আভিধানিক অর্থ চৈতালি ফসল বা বসন্তকালীন ফসল। তাহলে এর নাম 'রবিশস্য' হলো কেন? কোথায় রবি আর কোথায় চৈতালি বা বসন্ত। এর কারণ আছে। 'রবি' বাংলা শব্দ হলেও 'রবিশস্য' শব্দের 'রবি' বাংলা নয়। এ 'রবি' আরবি থেকে বাংলায় এসেছে। আরবি ভাষায় 'রবি' শব্দের অর্থ—বসন্তকাল। এ জন্য 'রবিশস্য' শব্দের অর্থ হলো বসন্তকালের ফসল বা চৈতালি ফসল। যা বসন্তের শেষ মাসে অর্থাৎ চৈত্র মাসে কৃষকগণ ঘরে তোলেন

রসাতল

'রসাতল' শব্দের অর্থ ধ্বংস, বিনাশ, অধোগতি। ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত পাতালের ষষ্ঠ নিম্নস্তরের নাম 'রসাতল' হতে শব্দটির উৎপত্তি ও বিকাশ। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল নিয়ে ভারতীয় পুরাণের ত্রিভুবন গঠিত। পাতাল সাতটি স্তরে বিভক্ত। ওপর থেকে নিচের স্তরগুলোর নাম যথাক্রমে (১) অতল, (২) বিতল, (৩) সুতল, (৪) তলাতল, (৫) মহাতল, (৬) রসাতল ও (৭) পাতাল। রসাতলের মতো ষষ্ঠ গভীর পাতালে যে নিপতিত হয় তার উদ্ধারের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়। তাই বাঙালিরা ধ্বংস বা বিনাশ কিংবা গোল্লায় যাওয়া বোঝাতে শব্দটি খুব মজা করে ব্যবহার করেন।

ভারতীয় পুরাণের একটি গল্প থেকে বাংলায় 'রসাতলে যাওয়া' বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। ধর্মরথ ছিলেন সগর রাজার পুত্র। সগর সকল দেশ জয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে অশ্বমোচন করেন। অশ্ব বিভিন্ন দেশ অতিক্রম করে রসাতলে প্রবেশ করে। রসাতলে পুরুষোত্তম কপিলরূপে বসবাস করছিলেন। কপিল অশ্বকে আবদ্ধ করে রেখেছেন সন্দেহে সগর রাজার পুত্রগণ তাঁকে আক্রমণ করে বসেন। মহর্ষি কপিলের ক্রোধানলে সগর রাজের ৬০,০০০ পুত্র ধ্বংস হয়ে যায়। কেবল চারজন পুত্র জীবিত ছিলেন। এ জীবিত পুত্রগণ হচ্ছেন বর্হকেতু, সুকেতু, ধর্মরথ ও মহাবীর।

রাগ

'রাগ' শব্দের বর্তমান আভিধানিক অর্থ—ক্রোধ, রোষ, গোসসা রঞ্জক-দ্রব্য প্রভৃতি। তবে 'রাগ' বলতে আমরা সাধারণত ক্রোধ, রোষ, গোসসা, ক্ষুব্ধতা ইত্যাদি বুঝে থাকি। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত হতে বাংলা ভাষায় আগত 'রাগ' শব্দের আদি ও মূল অর্থ ছিল— স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, প্রেম, আদর প্রভৃতি। অনেকে এমন তথ্য নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু অনুরাগ, সংরাগ, পূর্বরাগ প্রভৃতি শব্দের অর্থের দিকে তাকালে তাঁদের বিস্ময় আর থাকবে না। 'অনুরাগ' শব্দ কিন্তু ভালবাসা কিংবা প্রেম-প্রীতির চেয়েও গভীর। নানা কারণে 'রাগ' শব্দের মূল অর্থ উল্টে গেলেও 'রাগ' শব্দের সঙ্গে নানা শব্দগুচ্ছ যুক্ত হয়ে যে সকল শব্দ গঠিত হয়েছে সেগুলোর অর্থ এখনও মূল অর্থের মতো অবিকল রয়ে গেছে। এ জন্য 'রাগ' যতই অনাকাঙ্ক্ষিত হোক না কেন, অনুরাগ বড়ই মধুর, নিঃসন্দেহে পরমভাবে কাঙ্ক্ষিত। কীভাবে 'রাগ' শব্দটির অর্থের এমন পরিবর্তন হলো? সংস্কৃত হতে বাংলায় আসার প্রাক্কালে 'রাগ' শব্দটি তার মূল অর্থ 'ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতি' নিয়েই এসেছিল। কিন্তু হুজুগে বাঙালিরা সংস্কৃত 'রাগ' অর্থাৎ ভালবাসাকে তার মূল অর্থে ধরে রাখতে পারেনি। বাঙালিরা যেমন চঞ্চল তেমনি অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ। রাগতে রাগতে অর্থাৎ ভালবাসতে-বাসতে হয়তো ফতুর হয়ে যাওয়া বাঙালিরা সংস্কৃত 'রাগ'-এর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই সংস্কৃত 'রাগ' তার আদি অর্থ হারিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ ধারণ করে।

কিন্তু তার উপজাত শব্দগুলোর অর্থ পরিবর্তন করার মতো বুদ্ধি বা বোধ কোনোটাই তাদের ছিল না। তাই বাংলায় এখন 'রাগ' অর্থ ক্রোধ হলেও 'অনুরাগ' অর্থ—প্রেম-প্রীতি।

রাজনীতি

'রাজনীতি' শব্দের উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Polis থেকে। Polis শব্দের অর্থ হলো শহর বা রাজ্য। রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতির আলোকে জনগণকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল নগররাষ্ট্র ও সভ্যদের সম্পর্কে Politics নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। Politics-এর শাব্দিক অর্থ হলো The science or art of government or governing, specially the governing of a political entity, such as a nation, and the administration and control of its internal and external affairs. সাধারণ অর্থে 'রাজনীতি' হলো—রাজশাসন বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। উপরিউক্ত বর্ণনামতে, রাজনীতি বলতে খারাপ বা নেতিবাচক কিছু বোঝায় না। কিন্তু তত্ত্ব কথা আর বাস্তব সবসময় এক হয় না। বাস্তবে রাজনীতি কথাটা আমাদের দেশে খারাপ কিছু ইঙ্গিত করে। 'ছেলেটি রাজনীতির শিকার' কিংবা 'এখানে ভালো কিছু হবে না, রাজনীতি ঢুকে গেছে' বা 'তার সবকিছুতেই রাজনীতি আছে'—এ ধরনের কথা বা শব্দ চয়নের সঙ্গে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, রাজনীতির যে কদর্য রূপ আমাদের কাছে দৃশ্যমান, তা থেকে উপরিউক্ত বাক্যে রাজনীতিকে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ কথাও সত্য, সমাজের কোনো অংশ থেকেই ভালো মানুষ বা ভালো দিক সম্পূর্ণ উবে যায়নি। গুণগত পরিমাণ বা সংখ্যায় মাত্রাতিরিক্ত কম হলে খারাপটি নিয়েই বেশি আলোচনা হয়। সাধারণভাবে জনবান্ধব নেতার সংখ্যা কমে আসায় খারাপ নেতৃত্ব নিয়েই বেশি আলোচনা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি জনকল্যাণের জন্যই নিবেদিত থাকার জন্যই সৃষ্টি।

রামচন্দ্র

অযোধ্যার সূর্যবংশীয় রাজা দশরথের অশ্বমেধযজ্ঞ-লব্ধ জ্যেষ্ঠপুত্র। মিথিলায় গেলে রাম মিথিলার জনকরাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বিশ্বামিত্রের পরামর্শে জনকের হরধনু ভঙ্গ করে জনকের বীর্যশুল্কা কন্যা সীতাকে বিয়ে করেন। দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করেন। এ সংবাদে দাসী মন্থরার প্ররোচনায় দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী ভরত-জননী কৈকেয়ী ঈর্ষান্বিতা হয়ে পড়েন। আশৈশব রামকে স্নেহ করলেও মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী দশরথের পূর্বপ্রতিজ্ঞার সুযোগে এক বরে ভরতের যৌবরাজ্য লাভ ও অন্য বরে রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাসের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অনুসরণ করেন। রামের বনগমনের পর দশরথ পুত্রশোকে মারা যান। বনবাসের একপর্যায়ে রাম গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটী বনে কুটীর নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন। তখন এ বন রাক্ষসে পরিপূর্ণ ছিল। রাবণের বিধবা বোন শূর্পণখা এ বনে বাস করতেন। তিনি রামের নিকট প্রণয় নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত ও বিতাড়িত হলে সীতাকে গ্রাস করার চেষ্টা করেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ এ রাক্ষসীর নাক ও কান কেটে দেন। শূর্পণখার দুই ভাই খর ও দূষণ রামকে আক্রমণ করলে রাম তাঁদের দুজনকে এবং তাঁদের সকল সৈন্যকে বধ করে পঞ্চবটী বন রাক্ষসমুক্ত করেন। রাবণ সীতার রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে ও বোনের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে রাবণ সুকৌশলে সীতাকে হরণ করেন।

রামচন্দ্র পুত্ররূপে, মিত্ররূপে, প্রভুরূপে, স্বামীরূপে, প্রজাপালক রাজারূপে ও মহাশূররূপে অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। মর্ত্যলোকে তিনিই প্রথম স্বর্গরাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সে স্বর্গরাজ্যের নাম ছিল রামরাজ্য। এ রামরাজ্যে রাজত্ব করতেন রাম। সে রাজ্যের লোকজনের কোনো অভাব, অশান্তি ও দুঃখ-কষ্ট ছিল না। সবাই ইচ্ছেমতো মহাসুখে দিনাতিপাত করত। রামরাজ্যের সে সীমাহীন সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্যের তুলনা টানতে এখন কোনো শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ রাজ্যের জনগণের জীবন-যাপনের তুলনা টানতে বলা হয় 'রামরাজ্য'।

রামবাগ

রাম হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। হিন্দুধর্মে তিনি একজন জনপ্রিয় দেবতা। ভারতীয় পুরাণে রামকে অযোধ্যার রাজা বলা হয়েছে। রাজা ও দেবতা রাম-এর বড়ত্ব হতে নিচের শব্দ ও বাগভঙ্গিগুলো বৃহৎ-বাচক শব্দে পরিণত হয়েছে

রামকুঁড়ে—অতিশয় কুঁড়ে; রামকলা—বড় কলা; রামখিলি—বড় পানের খিলি; রামঘুঘু—বড় ঘুঘু; রামছাগল—বড় ছাগল; রামঝিঙ্গা— বড় ঝিঙ্গা; রামঢাক—বড় করতাল (বাদ্য); রামদা—বড়দা; রামধনু— ইন্দ্রধনু, বড় ধনু; রামপটল—বড় পটল; রামবেণী—বৃহৎবেণী; রামবোকা—অতিমাত্রায় বোকা; রামশালিক—বড় শালিক; রামধোলাই—সাংঘাতিক পিটুনি; রামকাড়া—কাড়া (শ্রবণ কাড়ে এমন বাদ্যযন্ত্র) সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় (ধরনের) যে কাড়া; রামচকা—চকাসমূহের (চক্রবাক পাখি) মধ্যে সবচেয়ে বড় (জাতের) যে চকা; রামচন্দ্র—চন্দ্র (চাঁদি, কাঁচা টাকা, লক্ষ্মীমন্ত বিনিয়োগ পুঁজি, যে টাকা খেলে সেই ক্রিয়াকারী পুঁজি), সবচেয় বড় (পরিমাণের) যে চন্দ্র; রামরাজত্ব—সবচেয়ে বড় যে রাজত্ব; রামরাজ্য—সবচেয়ে বড় বা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কাম্য যে রাজ্য; রামশিঙা—শিঙাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে শিঙা; রামায়ণ—রাম-এর অয়ন বোধে পরিণত যাতে; অথবা, যে মহাকাব্যে রাম-এর বিষয়ে সব কথা লিখিত বা গীত হয়েছে। এরূপ রামসাগর, রামকেলি, রামখড়ি, রামজামা, রামটেপা, রামঠেলা, রামদৌড়, রামপাখি, রামলীলা, রামডলা প্রভৃতি।

রামায়ণ

'রামায়ণ' একটি প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, ঋষি বাল্মীকি 'রামায়ণে'র রচয়িতা। এই গ্রন্থটি হিন্দুশাস্ত্রের স্মৃতি বর্গের অন্তর্গত। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুটি প্রধান মহাকাব্য। এই কাব্যে বিভিন্ন সম্পর্কের পারস্পরিক কর্তব্য বর্ণনার পাশাপাশি আদর্শ ভৃত্য, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ রাজার চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে মানবসমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রামায়ণ নামটি 'রাম' ও 'অয়ন' শব্দ নিয়ে গঠিত একটি তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ, যার অর্থ—রামের যাত্রা। রামায়ণ ৭টি কাণ্ড ও ৫০০টি সর্গে বিভক্ত ২৪,০০০ শ্লোকের সমষ্টি। এ কাব্যের মূল উপজীব্য হলো বিষ্ণুর অবতার রামের জীবন-কাহিনি। রামায়ণের শ্লোকগুলো ৩২-অক্ষরযুক্ত 'অনুষ্টুপ' ছন্দে রচিত। রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের নামগুলো হচ্ছে আদি বা বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড।

রাহাজানি

ফারসি 'রাহজান' শব্দ থেকে বাংলা 'রাহাজানি' শব্দটির উৎপত্তি। মূলত ফারসি 'রাহ' শব্দ থেকে 'রাহা' শব্দ এসেছে। 'রাহা' শব্দের অর্থ—রাস্তা, পথ, উপায় প্রভৃতি। যেমন—রাহাখরচ মানে পথখরচ, ভ্রমণকালে প্রয়োজনীয় ব্যয়। এখন 'রাহাজানি' শব্দের অর্থ প্রকাশ্য রাজপথে ছিনতাই বা ডাকাতি। এছাড়া অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার অর্থেও ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'রাহাজানি' হচ্ছে এমন একটি কর্ম, যার মাধ্যমে পথিকের সঙ্গে থাকা মূল্যবান দ্রব্যাদি কেড়ে নেওয়া হয়। ফলে পথিকের যাত্রা হয় বিঘ্নিত, জীবন হয় বিপন্ন। যে কর্ম পথিকের 'রাহাজানি' বা পথের খরচকে লুটে নিয়ে যায় সেটিই বাংলার 'রাহাজানি'। ফারসি হতে বাংলায় এসে 'রাহাজানি' তার বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তন ঘটালেও অন্তর্নিহিত অর্থ অভিন্ন রয়ে গেছে। এখানেই বাংলা ভাষার মাধুর্য।

রাহু

ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত এক দানব। তিনি বিপ্রচিত্তি দানবের ঔরসে ও দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধারণ করে যখন দেবগণের সুধা ভাগ করে দিচ্ছিলেন

তখন এ রাহু দেবরূপ ধারণ করে দেবতাদের সঙ্গে অমৃত পান করার জন্য একসঙ্গে উপবিষ্ট হন। তাঁর কণ্ঠ পর্যন্ত অমৃত প্রবেশ করলে চন্দ্র ও সূর্য রাহুকে চিনতে পেরে বিষ্ণু ও দেবতাদের কাছে তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেন। তখন বিষ্ণু নিজের সুদর্শনচক্রের মাধ্যমে রাহুর মস্তক ছেদন করেন। তবে অমৃত পান করার ফলে রাহুর মৃত্যু হলো না। তার মস্তকভাগ 'রাহু' এবং দেহভাগ 'কেতু' নামে খ্যাত হয়। এ ঘটনার পর হতে চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে রাহুর চিরশত্রুতার সূত্রপাত। তাই রাহু তাদের গ্রাস করে ফেলেন। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করলে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং সূর্যকে গ্রাস করলে হয় সূর্যগ্রহণ।

রিকশা

সম্পূর্ণ শব্দ 'জিন-রিকি-শা'। জিন অর্থ মানুষ, রিকি অর্থ শক্তি ও শা অর্থ গাড়ি। সুতরাং জিন-রিকি-শা বাগভঙ্গির অর্থ মানুষ-শক্তি-গাড়ি। অর্থাৎ মানুষ নিজ শক্তি দিয়ে যে গাড়ি চালায়। রিকশা মানুষ নিজ শক্তি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যায়। তাই এর নাম জিন-রিকি-শা; বাংলায় 'রিকশা'।

রুমা

বানর-রাজ সুগ্রীবের স্ত্রী। বানর-রাজ বালী সুগ্রীবকে বিতাড়িত করলে রুমা বহুকাল বালীর আশ্রমে ছিলেন। পরে রাম বালীকে বধ করলে রুমা সুগ্রীবকে ফিরে পান। বান্দরবানে রুমা নামের একটি উপজেলা আছে। কথিত হয় বানর-রাজ সুগ্রীবের স্ত্রীর নামে এ উপজেলার নামকরণ হয়েছে—রুমা।

রুমাল

'রুমাল' একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। কাপড়ের তৈরি এ বস্তুটি দিয়ে মুখ মোছা হয়। রুমাল ফারসি শব্দ। ফারসি 'রু' ও 'মাল' এর মিলনে হয়েছে 'রুমাল। ফারসি 'রু' শব্দের অর্থ—মুখ। 'মাল' শব্দের অর্থ—'যা মুছে দেয়'। তবে 'মাল' শব্দের প্রকৃত মৌলিক অর্থ— 'মুছে দাও'। শব্দটা 'রু'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এর অর্থ হয় 'যা মুছে দেয়'। সুতরাং 'রু + মাল' শব্দের অর্থ দাঁড়ায়— মুখ মুছে দাও। এটি অনুজ্ঞা পদ। সমাসে শেষ পদ হওয়ায় 'মুছে দাও' অর্থ দাঁড়িয়েছে 'মুছে দেয় যা'। সে হিসেবে রুমাল অর্থ 'যা মুখ মুছে দেয়'।

রোজনামচা

'রোজ' ও 'নামচা' শব্দের সমন্বয়ে 'রোজনামচা' শব্দের উৎপত্তি। 'রোজ' শব্দের অর্থ—প্রতিদিন এবং 'নামচা' শব্দের অর্থ—লেখা, লিখন, অঙ্কন প্রভৃতি। সুতরাং 'রোজনামচা' শব্দের অর্থ প্রতিদিনের লেখা। স্মৃতি হতে হারিয়ে যাওয়ার শঙ্কায় মানুষ প্রাত্যহিক কিছু ঘটনা লিখে রাখে। যেখানে ওই প্রাত্যহিক ঘটনাগুলো লিখে রাখা হয় সেটাই হচ্ছে 'রোজনামচা'। যার অর্থ 'দিনলিপি'।

রোমহর্ষক/লোমহর্ষক

'রোম' ও 'লোম' শব্দ থেকে রোমহর্ষক বা লোমহর্ষক শব্দের উৎপত্তি। 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' মতে, লোম বা রোম অর্থ শরীরজাত সূক্ষ্ম কেশ, পশম ইত্যাদি। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ আছে 'রোমহর্ষণ (লোমহর্ষণ) হচ্ছে রোম-এর হর্ষণ (লোম-এর) হর্ষ অন যাহাতে।' ভারতীয় পুরাণ মতে, রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণ বেদব্যাসের একজন প্রধান শিষ্য। বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করে প্রথম চারজন শিষ্যকে তা শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি সূত-জাতীয় পণ্ডিত রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ পাঠের জন্য শিক্ষা দান করেন। গুরুর আদেশে রোমহর্ষণ সমবেত ঋষিদের মধ্যে পুরাণাদি কীর্তন করতেন। ব্যাসদেবের মুখে শাস্ত্রাদি শিক্ষা করতে গিয়ে তাঁর রোমাদি বা পশমসমূহ বা কেশসমূহ হর্ষিত হয়েছিল বলে তাঁর নাম হয় 'রোমহর্ষণ'। এ রোমহর্ষণ থেকে রোমহর্ষক বা লোমহর্ষক শব্দের উৎপত্তি। রোমহর্ষক ও লোমহর্ষক শব্দদ্বয়

উভয়ে অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রোমাঞ্চ

যাতে রোম অঞ্চিত হয় তা-ই রোমাঞ্চ। যা ঘটলে রোম খাড়া হয়ে ওঠে বা রোমের অন চয়িত হয় বা রোম নিজের অজান্তে চঞ্চল হয়ে তার পরিধিতে পৌঁছায়, সেটিই রোমাঞ্চ। 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' ১ম খণ্ডে কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী বলেছেন, 'Romance রোম (Rome) শহর ও Roman (সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা) নাম থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। Rome নামক কেন্দ্রের অঞ্চ যতদূর বিস্তৃত সেটিই Rome + অঞ্চ বা Romance-এর এলাকা।

রৌরব

একটি নরকের নাম। কূটসাক্ষী ও মিথ্যাবাদীরা এ নরকে যাবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ মতে, এ রৌরবভূমি অতি তপ্ত অঙ্গারে আচ্ছন্ন। পাপিষ্ঠরা এ নরকে বিচরণ করে পদে পদে দগ্ধ হয়। একসময় যারা বাংলা ভাষায় কথা বলত, ব্রাহ্মণরা তাদের এ নরকে দগ্ধ হওয়ার ভয় দেখাত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ল

লক্ষ্মী

ঋক্বেদে শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী হিসাবে লক্ষ্মীর নাম পাওয়া যায়। রামায়ণ অনুসারে, সমুদ্র মন্থনকালে 'লক্ষ্মী' পদ্মফুল হস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হয়েছেন। পুরাণ অনুসারে, মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মী শব্দের আভিধানিক অর্থ—সৌভাগ্য, শ্রী, শোভা, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, সুবোধ, শান্তস্বভাব। হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ধন, ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর নাম, আচরণ, স্বভাব ও ব্যবহার থেকে 'লক্ষ্মী' শব্দটির উৎপত্তি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে অতি প্রিয় দেবী লক্ষ্মী যেমন সম্পদশালী, তেমনি সুন্দর এবং তেমনি আকর্ষণীয় তাঁর স্বভাব ও আচরণ। তিনি সর্বসম্পদে পূর্ণ এবং সকল শ্রী ও ঐশ্বর্যে ভরপুর অনন্যা এক দেবী। দেবতা ও অসুরগণের সমুদ্রমন্থনকালে দেবী লক্ষ্মী সমুদ্র হতে উত্থিত হয়েছিলেন।

দেবী লক্ষ্মীর চরিত্র ও আচরণ যাঁর মধ্যে দেখা যায়, যিনি সম্পদ, ঐশ্বর্য ও মোহনীয় আচরণে ঋদ্ধ তিনিই লক্ষ্মী। মা-বাবা তাঁদের ছেলেমেয়েকে 'লক্ষ্মী' বলে আদর করে ডাকেন। আবার অনেকে আরও এক পা এগিয়ে ডাকেন—লক্ষ্মীসোনা। লক্ষ্মীর মতো চরিত্র হোক বা না হোক, প্রত্যেক সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকের পিতা-মাতার কাছে আসলেই লক্ষ্মী—সর্বসম্পদ, ঐশ্বর্য ও সুন্দরের বিমূর্ত অনিবার্যতা।

লাগাতার

'লাগতার' শব্দের অর্থ—ধারাবাহিক, অবিচ্ছিন্ন প্রভৃতি। 'লাগা' ও 'তার' শব্দ হতে 'লাগাতার' শব্দের উৎপত্তি। তার মানে 'ধারা'। 'তার বাঁধনা' বা 'তার লগানা' হিন্দি বাগভঙ্গি। বস্তুত 'লগাতার' হতে 'লাগাতার' শব্দের উৎপত্তি। 'লগা' একটি বিশেষণ পদ। লগাতার অর্থ—লগ্নধার, অর্থাৎ ধারাবাহিক। এ 'লগাতার' শব্দ থেকে লাগাতার শব্দের উৎপত্তি।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

আমরা এই প্রবাদের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু আমরা কি জানি কে এই গৌরী সেন? এ নামে কি আসলে কেউ ছিলেন? গৌরীকান্ত সেন সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের লোক। তাঁর আদি নিবাস সম্পর্কে দুটি ভিন্ন মত আছে। অধিক গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তিনি পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার বালী শহরের (বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত) অধিবাসী। অন্য মত অনুযায়ী তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরের মানুষ। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের এক ব্যবসায়ী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম ছিল নন্দরাম সেন। আমদানি-রপ্তানির পারিবারিক ব্যবসায় গৌরী সেন অনেক টাকা উপার্জন করে বণিকসমাজে প্রসিদ্ধ হন। দুহাতে টাকা বিলিয়ে অনেক লোককে ঋণমুক্ত করেন অথবা বকেয়া রাজকর মেটাতে সাহায্য করেন। কেউ চাইলেই তিনি টাকা দিতেন। এ থেকেই 'লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন' প্রবাদের উৎপত্তি। অনেকে মনে করেন, হুগলীর গৌরীশঙ্কর শিবমন্দির তাঁর অর্থে নির্মিত। কলকাতা শহরে আহিরীটোলায় গৌরী সেনের বিশাল বাড়ি ছিল।

লাট

অত্যন্ত দাপুটে, ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, মস্ত বড় লোক প্রভৃতি। ইংরেজি 'লর্ড' শব্দ হতে বাংলা 'লাট' শব্দের উৎপত্তি। ব্রিটিশ আমলে বড়লাট, ছোটলাট, জঙ্গিলাট প্রমুখ পদবির মানুষরা মহাদাপটে ভারত শাসন করতেন। তাঁদের দাপটের কাছে সাধারণ মানুষ ছিল অসহায়। স্থানীয় জমিদার ও রাজারা পর্যন্ত এদের সমীহ করতেন। লাটগণ সবাই ছিলেন ইংরেজ। গভর্নর জেনারেল ছিলেন বড়লাট, লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ছোটলাট ও

জেনারেল ছিলেন জঙ্গীলাট। ইংরেজি লর্ড শব্দ বাংলায় প্রথমে লার্ড এবং পরবর্তীকালে আরও পরিবর্তনের মাধ্যমে 'লাট' শব্দে স্থিতি পায়। ভারতবর্ষ শাসনকারী সব গভর্নর জেনারেলই লর্ড উপাধিধারী ছিলেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও জেনারেলগণের অধিকাংশই ছিলেন লর্ড। ইংরেজি শাসকদের মধ্যমণি লর্ড উপাধির কারণে বাংলায় 'লাট' শব্দটি ক্ষমতা ও জৌলুসজ্ঞাপক শব্দ হিসাবে বাংলায় স্থান করে নেয়।

লাটে ওঠা

নিলামে ওঠা, নিলামে একসঙ্গে বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত, লটারির মাধ্যমে নিলামে ওঠা। ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে যাঁরা শাসন পরিচালনা করতেন তাঁদেরকে দেশীয়রা ডাকতেন 'লর্ড'। এ লর্ড থেকে 'লাট' শব্দের উৎপত্তি। তবে এ লাট কিন্তু লর্ড থেকে আসা 'লাট' নয়, এ লাট ইংরেজি লট শব্দ থেকে আগত। ইংরেজি লট শব্দের অর্থ—গুচ্ছ, স্তূপ, সকল প্রভৃতি। কোনো জমিদারি নিলামে তোলার সিদ্ধান্ত হলে প্রথমে তা 'লাটবন্দি' তথা বিক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্ত করা হতো। লাটবন্দি করার পর তা নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হতো। এখন যেমন হাজার হাজার জিনিস নিলামে তোলা হয় তখন তেমন ছিল না। নিলামে তোলার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় ছিল জমিদারি। লাট সাহেবরা বাকি খাজনাসহ নানা কারণে জমিদারি লাটে উঠিয়ে নিলামে বিক্রি করে দিতেন। রাতারাতি জমিদার হয়ে যেতেন সাধারণ প্রজা। সে লাট থেকে লাটে ওটা বাগভঙ্গির উৎপত্তি। এখন সে ব্রিটিশ যেমন নেই, তেমনি নেই জমিদারিও। কিন্তু 'লাটে ওঠা' থেমে নেই। তবে এ লাটে ওঠা কিন্তু শুধু নিলামে তোলা নয়। এ 'লাটে ওঠা' বলতে সর্বস্বান্ত হওয়া বোঝায়।

লাঠিসোটা

বিভিন্ন ধরনের লাঠি। 'লাঠি' ও 'সোটা' দুটো শব্দ নিয়ে 'লাঠিসোটা' বাগভঙ্গিটি গঠিত। লাঠি শব্দের অর্থ আমরা সবাই জানি। তবে সোটা শব্দের অর্থ অনেকের জানা নেই। কারণ শব্দটি এখন আর ব্যবহৃত হয় না। তবে অষ্টাদশ শতকেও শব্দটির ব্যবহার ছিল। 'সোটা' শব্দের অর্থ—ছোট লাঠি। সুতরাং 'লাঠিসোটা' শব্দের অর্থ বিভিন্ন ধরনের বা ছোট ও বড় লাঠি। ব্যাকরণগত অর্থ ও আভিধানিক অর্থ একদম পরিষ্কার।

লাবণ্য

'লাবণ্য' একটি আবেগময় শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সৌন্দর্য, মাধুর্য, কান্তি, শোভা, চাকচিক্য প্রভৃতি। প্রাচীন এক কথাসাহিত্যিক লাবণ্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'মুক্তার ভেতর মোহময় সুন্দরে আবিষ্ট যে তরল-নির্বাণ প্রতিফলন পরিস্ফুট, সে প্রতিফলন অঙ্গে বিদ্যমান থাকলে তাকে লাবণ্য বলা যায়।' তিনি যা-ই বলুন না কেন, 'লাবণ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি কিন্তু আবেগময় নয়, নিতান্তই সাধারণ ও রসকষহীন। 'লাবণ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— লবণত্ব বা নোনতা ভাব। এ বিবেচনায় 'লবণাক্ত' শব্দের অর্থ হওয়া উচিত 'শরীরের নোনতা ভাব'। কিন্তু 'নোনতা ভাব' জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণের জিনিস, চোখ দিয়ে দেখার নয়। শরীরের ঘাম শুকিয়ে গেলে চামড়ার উপর লবণের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়—এমন শরীরই কি তা হলে লাবণ্যময়? না, কেউ যদি অমন ভাবেন তা হবে নির্ঘাৎ পাগলামি।

লবণ স্বাদ বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান, এর মধ্যে একপ্রকার আর্দ্রতা রয়েছে, যা দেহ লাবণ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। আধুনিককালেও প্রসাধন-সামগ্রীর মাধ্যমে লাবণ্য বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল আর্দ্রতা রক্ষা। অধিকন্তু, লবণের মধ্যেও মুক্তাময় প্রতিচ্ছায়ার বিচ্ছুরণ ঘটে। হয়তো এ জন্য 'লাবণ্য' শব্দকে বাংলাভাষীরা 'দেহের নোনতা ভাব'-এর পরিবর্তে 'দেহের সৌন্দর্য' রচনার ইঙ্গিত হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছিলেন। লবণ শুকনো হলেও ভেজা ভাব। চট্টগ্রামের ভাষায় 'লাবণ্য' শব্দটি আরেকটু উন্নত ও সম্প্রসারিত হয়ে 'ননাই' রূপ ধারণ করেছে। অর্থাৎ ননীর মতো মাখোমাখো। উদাহরণ—"কইলজার ভেতর বাঁধি রাইক্খুম তোঁয়ারে ও নানাই রে...।"

লালা

'লালা' শব্দের অর্থ মুখ থেকে নিঃসৃত জল, মুখজাত রস প্রভৃতি। লালা কিন্তু থুথু নয়। যেটি মুখ থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝরে সেটি লালা। শিশুদের মধ্যে এমন প্রবণতা বেশি দেখা যায়। লালা সংস্কৃত শব্দ। এর মূল অর্থ হচ্ছে—যা খাদ্য পেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু লালা কি তাহলে খাদ্য পেতে ইচ্ছে করে? না, কিন্তু যার লালা ঝরে তার নিশ্চয় খাদ্য পেতে ইচ্ছে করে। লালা হয়তো তার এ ইচ্ছেকে প্রকাশ করে। প্রকাশ্য লালা ছাড়াও আর একপ্রকার লালা আছে। এটি লোভের লালা। এমন লালা যাদের ঝরে তাদের বলে 'লালায়িত'। তেঁতুল বা টকজাতীয় কোনো কিছুর গন্ধ নাকে এলে জিভে লালা আসে, হয়তো ঝরে না কিন্তু আসে। এ আসাটাই হচ্ছে খাওয়ার ইচ্ছা। নতুন ও উপাদেয় কোনো খাদ্য দেখলেও মুখে লালা আসে। এটা প্রত্যেকে জানে।

লিঙ্গ

'লিঙ্গ' শব্দের প্রথম অর্থ—'জ্ঞানসাধন'। অর্থাৎ, যার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়, তাকে লিঙ্গ বলে। আজকের সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির কাছে কথাটা বেশ অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতেরা জানেন কথাটা শতকরা একশ ভাগ নির্ভুল। বহু প্রাচীনকাল থেকেই 'লিঙ্গ' শব্দের ওইরূপ অর্থ প্রচলিত হয়ে আসছে। প্রায় সমস্ত পুরনো অভিধান ও শব্দকোষে ওইরকমই উল্লেখ রয়েছে। তাহলে কেন সে কথা ভাষাবিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের শেখালেন না? কেন আজকের শিক্ষিত বাঙালি ছেলেমেয়েরা এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বাবা-মায়েরাও, লিঙ্গ শব্দের কেবল gender ও penis এই দুটি অর্থই জানলেন?

একটি কারণ হলো, কেন যে 'লিঙ্গ'কে 'জ্ঞানসাধন' বলা হতো, কিংবা 'জ্ঞানসাধন'কে 'লিঙ্গ' বলা হতো, সে কথা ভাষাবিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের অনেকে জানেন না। আর যা জানা নেই, অভিধানে লেখা আছে বলেই সে কথা ছাত্রকে শেখাতে যাওয়া বিপজ্জনক। তার চেয়ে বরং ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই মঙ্গল। সে জন্য এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা সমীচীন মনে করেননি তাঁরা। কিন্তু একটি শব্দের দশটি অর্থের ভেতর থেকে মাত্র দুটিকে এইভাবে উত্তরসূরিদের শেখানোর ফলে বাংলা ভাষার শতকরা আশি ভাগ যে বাদ পড়ে যেতে পারে, সেকথা তাঁরা খেয়াল করেননি।

আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, বাংলা ভাষায়, ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হলে পর, বাংলা শব্দের 'আত্মাবদল' সাঙ্গ হয় এবং তার ফলে লিঙ্গ, যোনি প্রভৃতি শব্দগুলোর ভেতর থেকে তাদের পুরনো ও বহুকালক্রমে আগত অর্থগুলোকে বের করে ফেলে দিয়ে কেবল একটি বা কদাচিৎ দুটি করে অর্থকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যেমন লিঙ্গ শব্দের ভেতরে penis এবং যোনি শব্দের ভেতরে vagina প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। যেহেতু প্রভু ইংরেজের ভাষায় একটি শব্দে একটি বিষয় বা বস্তুকে প্রকাশের একরৈখিক নিয়ম প্রচলিত, বাংলা ভাষার ভেতরেও সে নিয়ম প্রচলিত হয়ে যায়। আক্ষেপের কথা এই যে, রাজনীতিকভাবে আজ ব্রিটিশ চলে গেছে বটে, কিন্তু বাংলা ভাষার ভেতর আজও সে উপনিবেশ চালিয়ে যাচ্ছে বহাল তবিয়তে।

লুনুলা

মানুষের নখের সাদা অংশের নাম 'লুনুলা' (Lunula)। এটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ—চাঁদ।

লেজেগোবরে

'লেজেগোবরে' শব্দটির অর্থ—নাকাল, নাজেহাল। সাংঘাতিক বিপদে বা বিপাকে পড়লে মানুষের 'লেজেগোবরে' অবস্থা হয়। আবার আকস্মিক ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হলেও মানুষ নিজের অবস্থা 'লেজেগোবরে' করে ফেলে। 'লেজেগোবরে' বাগভঙ্গিটি এসেছে ভয়ে-ভীত গরুর নিরুপায় আচরণ থেকে। গরু ভীষণ ভয় পেয়ে গেলে লেজ উপরে তোলার কথা ভুলে যায় এবং লেজ উপরে না-তুলে গোবর ত্যাগ করে। গোবরমাখা লেজের তখন যে অবস্থা

হয় সেটাই 'লেজেগোবরে'। অনেকে শব্দের ও বানানের প্রকৃত প্রয়োগ বা বানান না-জানলে অর্থেও এমন লেজেগোবরে অবস্থার সৃষ্টি করে বসে থাকে।

লেডিকেনি

এটি এক প্রকার মিষ্টির নাম। ভারতের বড়লাট (Governor-General) লর্ড ক্যানিং (১৪ই ডিসে. ১৮১২—১৭ই জুন, ১৮৬২)-এর স্ত্রী লেডি ক্যানিং-এর নামানুসারে পান্তুয়ার আদলে তৈরি তাঁর প্রিয় বাঙালি মিঠাই। লেডি ক্যানিং এ মিষ্টিটি খুব পছন্দ করতেন। তাই এটির নাম হয়ে যায় লেডিকেনি। উল্লেখ্য, লর্ড ক্যানিং ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ২১শে মার্চ, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বড়লাট ছিলেন। 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে' বলা হয়েছে—'লেডিকেনি' অর্থ ছানা দ্বারা প্রস্তুত প্রসিদ্ধ রসালো মিঠাইবিশেষ।

লেফাফাদুরস্ত

'লেফাফাদুরস্ত' শব্দের অর্থ—পরিপাটি, সাজসজ্জা ও আচার-আচরণে নিখুঁত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কপট ও ফাঁকিবাজ। 'লেফাফা' ও 'দুরস্ত' শব্দের সমন্বয়ে লেফাফাদুরস্ত শব্দের উৎপত্তি। ফারসি 'লেফাফে' ও 'দুরস্ত' শব্দ দুটোর সংযোগেই বাংলা—লেফাফাদুরস্ত। ফারসি লেফাফে শব্দের অর্থ আবরণ, ছদ্মবেশ, আড়াল, আচ্ছাদন, ওপরের বেশ প্রভৃতি। অন্যদিকে দুরস্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে ত্রুটিহীন। সুতরাং 'লেফাফাদুরস্ত' শব্দের অর্থ দাঁড়ায়—বাইরের আবরণ ত্রুটিহীন। তবে বাংলা বাগভঙ্গিতে শব্দটির অর্থে বাইরের আবরণ ত্রুটিহীন এমন বোঝায় না। বাইরের আবরণ ত্রুটিহীন হলে যে ভেতরের আবরণ ভালো হবে না তা নয়। কিন্তু 'লেফাফাদুরস্ত' এমন অর্থ প্রকাশ করে যার বাইরের আবরণটিই ভালো কিন্তু ভেতরেরটা নয়।

ল্যাংবোট

'ল্যাংবোট' শব্দের অর্থ—চামচা, অনুচর, পার্শ্বচর প্রভৃতি। এটি ইংরেজি হতে আগত। ইংরেজি লংবোট (long boat) বাংলায় বিকৃত হয়ে 'ল্যাংবোট' হয়েছে। পালতোলা বড় জাহাজের সঙ্গে যুক্ত লম্বা নৌকাকে লংবোট বলা হতো। লংবোটে কোনো নাবিক থাকত না। খালি নৌকা মূল জাহাজের সঙ্গে বাঁধা থাকত এবং জাহাজ যেদিকে যেত নৌকাগুলোও জাহাজের সঙ্গে যেত। জাহাজকে অনুসরণ করাই ছিল নৌকার একমাত্র কাজ। লংবোট প্রয়োজন না-হলেও সবসময় জাহাজের সঙ্গে বাঁধা থাকত। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মূল জাহাজের সঙ্গে সবসময় লেগে থাকা ও অনুসরণ করার চরিত্র থেকে 'ল্যাংবোট' বাগভঙ্গিটির উৎপত্তি। চামচা, অনুচর, তোষামুদে প্রভৃতি ব্যক্তিরাও ল্যাংবোটের ন্যায় বড় কারও সঙ্গে লেপ্টে থেকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাকে অনুসরণ করে।

ষড়বিংশ অধ্যায়

শ ষ
শ

শনি

সূর্যের ঔরসে ও স্ত্রী ছায়ার গর্ভে দুই পুত্র যথাক্রমে শনি ও সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। যথাসময়ে চিত্ররথের কন্যার সঙ্গে শনির বিয়ে হয়। শনি ধ্যানমগ্ন ও পূজারত ছিলেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী ঋতুস্নাতা হয়ে সুন্দর বেশভূষা পরিধান করে স্বামীর কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু ধ্যানমগ্ন শনি স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না এবং তার ঋতুও রক্ষা করলেন না। এতে স্ত্রী ক্রুদ্ধা হয়ে স্বামীকে অভিশাপ দেন তুমি যার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে সে-ই ধ্বংস হয়ে যাবে। বাংলায় ব্যবহৃত 'শনির দৃষ্টি' বাগধারাটি এ ঘটনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। গণেশ জন্মগ্রহণ করলে শনি তাকে দেখতে যান। গণেশের মাতা পার্বতীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না-পেরে শনি শিশু গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করামাত্র গণেশের মুন্ড গলা হতে ছিন্ন হয়ে মাটিতে পাড়ে যায়। শনি যার দিকে তাকাতেন তারই মহা ক্ষতি হয়ে যেত।

শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোল পালায়

'শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোল পালায়' কথার অর্থ—'কপাল মন্দ হলে অঘটন ঘটে এবং আরও কঠিন বিপত্তির উদ্ভব ঘটে।' ভারতীয় পুরাণের একটি গল্প থেকে প্রবাদটির উৎপত্তি। শ্রীবৎস রাজা শনির কোপানলে পড়ে রাজ্যপাট হারিয়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ভীষণ কষ্টে দিনযাপন করছিলেন। এ দুঃসহ অবস্থায় তিনি একটি শোল মাছ পেয়ে সেটি পুড়িয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা নিলেন। শোল মাছটি কেটে আগুনে পুড়িয়ে ছাই দিয়ে ধোয়ার জন্য নদীতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু শনির কৌশলে পোড়া শোল মাছটি জীবন্ত হয়ে নদীতে পালিয়ে গেল। জলের নিচে পোড়া শোল মাছের তোলপাড় করা লাফানি দেখে বেচারা শ্রীবৎস রাজার পেটে যেন আগুন ধরে যায়। আক্ষেপ করে তিনি আপন মনে বলে ওঠেন 'শনির দৃষ্টি হলে পোড়া শোলও পালায়।'

শরশয্যা

শরশয্যা শব্দের আভিধানিক অর্থ—মৃত্যুশয্যা, মুমূর্ষু অবস্থা প্রভৃতি। 'শর' ও 'শয্যা' এ দুটো শব্দের মিলনে 'শরশয্যা' শব্দের উৎপত্তি। মহাভারতে অর্জুন ভীষ্মকে অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করলে ভীষ্ম সেসব বাণের উপর ভর দিয়ে শায়িত হন। বাণ বা শর দিয়ে নির্মিত কাঠামোর উপর শায়িত হয়েছেন বলে ওই শয্যা 'শরশয্যা' নামে পরিচিতি পায়। ইচ্ছামৃত্যুর বর থাকায় শরশয্যায় শায়িত থাকার পরও মৃত্যুবরণ না-করে ভীষ্ম দীর্ঘদিন জীবিতাবস্থায় শরশয্যায় শুয়ে থাকেন। কিন্তু নড়াচড়া বা কাজ করার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। মহাভারতের এ ঘটনা থেকে বাংলায় 'শরশয্যা' শব্দটি 'মৃতপ্রায় ব্যক্তির শুয়ে থাকা' প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় 'শরশয্যা' শব্দটি মৃত্যুশয্যা বা অন্তিমকাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

শশব্যস্ত

'শশব্যস্ত' অর্থ—অতিব্যস্ত, ব্যস্তসমস্ত, চঞ্চল প্রভৃতি। এটি একটি প্রাণিবাচক শব্দ। 'যা শশকের ন্যায় ব্যস্ত' তাই শশব্যস্ত। শশক অর্থাৎ খরগোশ অতি চঞ্চল প্রাণী। সবসময় ব্যস্ত থাকে, সামান্য কারণেও তার ব্যস্ততার অন্ত নেই। প্রাণিকুলে ব্যস্ত ও চঞ্চল চরিত্রের অধিকারী এ প্রাণীটিকে মানুষ ভাষার মাধ্যমে ওই রকম চরিত্র প্রকাশের যোগ্য হিসাবে স্থাপন করেছে। তবে মানুষ শশকের ন্যায় সবসময় ব্যস্ততা না-দেখালেও নানা কারণে অতিব্যস্ত হয়ে

পড়ে। আবার কোনো কোনো মানুষ স্বভাবগতভাবে চঞ্চল। তাদের ব্যস্ততা 'শশব্যস্ত' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

শাক

'শাক' রান্না করে খাওয়ার উপযুক্ত লতাপাতা। পালং শাক, পুঁইশাক, কলমি শাক, ডাঁটা শাক, লাউ শাক, মুলা শাক, লাল শাক। তবে 'শাক' শব্দের আদি অর্থ—মানুষ যদ্দবারা ভোজন কার্য সম্পাদন করতে পারে। আমরা বলি ভাত খাচ্ছি, ভাত খেয়েছি—কথাটা আসলে পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ শুধু ভাত সাধারণত কেউ খায় না। খাওয়াও সহজ নয়। ভাতের সঙ্গে নানা তরকারি ও বিভিন্ন ব্যঞ্জনের অনুষঙ্গ প্রয়োজন। এ বিবেচনায় সকল প্রকার সবজিই শাক। আরও ব্যাপক অর্থে মাছ-মাংসও কিন্তু শাক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে শাক ছয় প্রকার। যথা : পত্র শাক, পুষ্প শাক, ফল শাক, নাল শাক, কন্দ শাক ও সংস্বেদন শাক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী পালং, পুঁই, কলমি, লাল প্রভৃতি পত্র শাক; ফুলকপি, কলার মোচা, বকফুল, কুমড়ো ফুল প্রভৃতি ফুল শাক; লাউ-কুমড়োর লতা, পুষ্প শাক; কচুর লতি ইত্যাদি নাল শাক; বেগুন, ঢেঁড়শ, পটোল, চিচিঙ্গা ইত্যাদি ফল শাক; আলু, ওলকচু, মুলা, গাজর প্রভৃতি কন্দ শাক এবং মাশরুম, পাতাল কোঁড় প্রভৃতি সংস্বেদন শাক। তবে বর্তমানে বাংলার শাক কিন্তু সে অর্থে প্রয়োগ করা হয় না। বাংলায় 'শাক' শব্দ দিয়ে শুধু মূলত পত্র শাক বা পাতা শাককে বোঝানো হয়।

শিকেয় তোলা

'শিকেয় তোলা' বাগভঙ্গিটির আভিধানিক অর্থ—ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া। আপাতত নিষ্ফল বা অপ্রয়োজনীয় মনে করে কোনো বিষয় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা অর্থে বাগধারাটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। 'শিকে' ও 'তোলা' শব্দ দুটির সংযোগে 'শিকেয় তোলা' কথাটির সৃষ্টি। 'শিকে' হলো পাটের বিনুনি দ্বারা প্রস্তুত একটি ঝুলন্ত আধার। একসময় এ দেশের প্রায় প্রত্যেক ঘরে জিনিসপত্র রাখার জন্য 'শিকে' ছিল অনিবার্য বস্তু। রান্নাবান্না বা খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর হাঁড়িকুড়ি বা অবশিষ্ট খাদ্য শিকেয় তুলে রাখা হতো। প্রয়োজনবোধে এগুলো আবার নামানো হতো। সাময়িকভাবে কোনো দ্রব্যাদি তুলে রাখা কার্যক্রম হতে বাগধারাটির উৎপত্তি।

শিখণ্ডী

'শিখণ্ডী' বাংলা ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনি আছে। মহাভারত মহাকাব্যের এক বিখ্যাত চরিত্র শিখণ্ডী। তিনি ছিলেন নপংসুক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডী পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেন। নপংসুক বলে কুরুবীর ভীষ্ম শিখণ্ডীর উপর কোনো শর নিক্ষেপ করবেন না ঘোষণা করেছিলেন। যুদ্ধের দশম দিনে ভীষ্মের শরনিক্ষেপে পাণ্ডবগণ চরম বিপর্যস্ত। কিছুতেই ভীষ্মকে রোধ করা যাচ্ছিল না। তাঁর শরাঘাতে হাজার হাজার পাণ্ডব বীর নিহত। পরাজয় অতি নিকটে। এ অবস্থায় অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ শুরু করেন। শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্ম শরবর্ষণে ক্ষান্ত হন। এ সুযোগে অর্জুন ভীষ্মকে ভূপাতিত করেন। শিখণ্ডী-বিষয়ক এ কাহিনি হতে বাংলার 'শিখণ্ডী' শব্দের উৎপত্তি। এখন শিখণ্ডী বলতে কেউ মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্র শিখণ্ডীকে বোঝেন না। এখন এর অর্থ—যাকে সামনে রেখে অন্যায় কাজ করা হয়।

শিরোপা

পারিতোষিক, পুরস্কার, খেতাব। 'শিরোপা' ফারসি শব্দ। এর মূল ও আদি অর্থ—রাজা বা সম্রাট দ্বারা প্রদেয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরিধেয় পোশাক। তবে বাংলা বাগভঙ্গিতে 'শিরোপা' বলতে এভাবে প্রদত্ত পরিধেয় পোশাক বোঝায় না। এর দ্বারা যেকোনো সম্মান, পুরস্কার, খেতাব প্রভৃতি বোঝায়। প্রতিযোগিতায় প্রদত্ত পুরস্কার বোঝাতে 'শিরোপা'র ব্যবহার করা হয়।

শুশ্রূষা

'শুশ্রূষা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—সেবা, পরিচর্যা বা দেখাশোনা। তবে শুশ্রূষা শব্দের মূল অর্থ হলো 'শোনার ইচ্ছা'। 'শোনার ইচ্ছা' সেবার অনিবার্য অনুষঙ্গ। অসুস্থ ব্যক্তির কখন কী-রকম বোধ হচ্ছে সেটা শোনা না-হলে সেবা করা সম্ভব নয়। এ কারণে 'শোনা' কর্মটি 'শুশ্রূষা' শব্দটিকে 'সেবা'কর্মের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছে।

শোভাযাত্রা

'শোভাযাত্রা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—মিছিল। 'শোভা' ও 'যাত্রা' এ শব্দদ্বয়ের সংযোগে 'শোভাযাত্রা' শব্দের উৎপত্তি। এর দ্বারা শোভা বা সমারোহের সঙ্গে জনতার সম্মিলিত যাত্রা বোঝায়। যে যাত্রায় শোভাবর্ধনকারী উপকরণসহ যাত্রী থাকে মূলত সেটিই শোভাযাত্রা। একসময় রাজা ও জমিদারগণের যাত্রাকে 'শোভাযাত্রা' বলা হতো। এখন শোভাযাত্রার ধরন ও অর্থ দুটোই পাল্টে গেছে। শোভাযাত্রায় এখন শোভার প্রয়োজন হয় না। বহুলোক একত্রে কোনো উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাতে শোভা থাকুক বা না থাকুক সেটাই শোভাযাত্রা। এখন মিছিলের প্রতিশব্দ হিসাবেও 'শোভাযাত্রা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত

অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত অষ্টাদশ খণ্ড শ্লোকযুক্ত মহাপুরাণ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এ গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি সমস্ত বেদ বেদান্ত ও পুরাণাদির সারমর্ম নিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা সমন্বিত এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভগবতের দ্বাদশ খণ্ড শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যলীলা নিয়ে রচিত।

শ্রুতি

যা শ্রুত হয় তা-ই 'শ্রুতি'। কিন্তু পুরাণে শ্রুতির একটি বিশেষ অর্থ আছে। সেটি হচ্ছে যা ভগবান কর্তৃক উদ্ঘাটিত হয় তা-ই 'শ্রুতি'। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে 'শ্রুতি' বলা হয়। উপনিষদকেও এ পর্যায়ে ফেলা যায়।

শ্বাপদ

'শ্বাপদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ—মাংসাশী হিংস্র প্রাণী। যে প্রাণী একই সঙ্গে হিংস্র ও মাংসাশী সেটিই শ্বাপদ। কিন্তু 'শ্বাপদ' শব্দের মূল অর্থ—কুকুরের পদ বা কুকুরের পা। 'শ্বা' সংস্কৃত শব্দ, এর অর্থ কুকুর; পদ মানে পা। এর বাহ্যিক অর্থ—কুকুরের পায়ের মতো। সুতরাং শ্বাপদ বলতে যে সকল জীবজন্তুর পদ বা পা কুকুরের মতো তারাই শ্বাপদ। কিন্তু বাংলা ভাষায় শ্বাপদ বলতে হিংস্র জীবজন্তুই বোঝায়। এ অর্থে বাঘ, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতিও শ্বাপদ। শ্বাপদ বহুব্রীহি সমাসের একটি উদাহরণ।

শ্বেতহস্তী

প্রচুর ব্যয়বহুল বিষয়, যা পরিপালন করতে বা পরিচালনা করতে সর্বস্বান্ত হতে হয়। 'শ্বেত' ও 'হস্তী' শব্দ মিলে শ্বেতহস্তী। শ্বেত মানে সাদা আর হস্তী মানে হাতি। সুতরাং 'শ্বেতহস্তী' মানে—সাদা হাতি। আসলে এর বাহ্যিক অর্থ সাদা হাতি হলেও অন্তর্নিহিত অর্থ—যা লালন করতে প্রচুর ব্যয় হয় তা। থাইল্যান্ডের প্রাচীন নাম শ্যামদেশ বা শ্বেতহস্তীর দেশ। শ্যামদেশে শ্বেতহস্তী ছিল রাজকীয় সম্মান ও ঈশ্বরের অলৌকিক মহাশক্তি ও পবিত্রতার প্রতীক। দেশের সকল শ্বেতহস্তীর মালিক থাকতেন রাজা। রাজা রাজকীয় কোষাগার বা জনগণের অর্থ দিয়ে শ্বেতহস্তী লালন করতেন। এ হস্তী লালন-পালন করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো। ভারতবর্ষের ধর্মের ষাঁড়ের মতো শ্বেতহস্তীরা ইচ্ছেমতো বিচরণ করত। রাজার প্রতিনিধি ও পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে শ্বেতহস্তীকে প্রতিরোধ বা প্রতিহত করার

ক্ষমতা কারও ছিল না। শ্বেতহস্তী শুধু খেত, কিন্তু কোনো কাজ করত না। শুধু ব্যয় হতো, আয় হতো না। রাজা কোনো কারণে যদি কোনো মন্ত্রী বা অমাত্যের ওপর অসন্তুষ্ট হতেন তাহলে সে মন্ত্রী বা অমাত্যকে রাজা শ্বেতহস্তী উপহার দিতেন। এ উপহার ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত শ্বেতহস্তীকে রাজকীয়ভাবে পরিপালন করতে হতো। এবং তা করতে গিয়ে ওই উপহারধারী অল্পসময়ের মধ্যে ফতুর হয়ে যেত। শ্বেতহস্তী পালন ছিল শুধু ব্যয়, আয়-রোজগারের কোনো বালাই ছিল না। এ অনুষঙ্গে প্রচুর ব্যয়বহুল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়বিহীন কোনো কাজ প্রকাশে 'শ্বেতহস্তী' শব্দটা ব্যবহার করা হয়।

ষ

ষটকর্ম

স্মৃতি মতে যটকর্ম হচ্ছে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। তন্ত্র মতে মারণ (প্রাণহারী ক্রিয়া—দেবতা কালী); উচ্চাটন (স্বস্থান হতে উচ্ছেদ করবার ক্রিয়া—দেবতা দুর্গা); স্তম্ভন (সকলের প্রবৃত্তিরোধক অর্থাৎ কার্যকারিতা শক্তি অবরোধকারী ক্রিয়া—দেবতা রমা); বিদ্বেষণ (প্রণয়ীদের মধ্যে পরস্পর দ্বেষজনক ক্রিয়া—দেবতা জ্যেষ্ঠা); বশীকরণ (যে ক্রিয়ায় লোক বশীভূত হয়—দেবতা বাণী) ও শান্তি (যে ক্রিয়া দ্বারা রোগ, খারাপ কাজ, গ্রহদোষ নিবারিত হয়—দেবতা রবি)। যোগশাস্ত্রে যোগের ছয়টি ক্রিয়া রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে—দৃঢ়তা (আসনের দ্বারা), ধৈর্য (প্রত্যাহার দ্বারা), স্থৈর্য (মুদ্রা দ্বারা), লাঘব (প্রাণায়াম দ্বারা), প্রত্যক্ষ (ধ্যানের দ্বারা), নির্লিপ্ত (সমাধির দ্বারা), শোধন (ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকা, ত্রাটক ও কপালভাতি) প্রভৃতি।

ষড়যন্ত্র

তান্ত্রিকদের তন্ত্রসাধনার ছয় রকম আভিচারিক প্রক্রিয়া থেকে 'ষড়যন্ত্র' শব্দের উদ্ভব। আভিচারিক প্রক্রিয়া মানে নিজের ইষ্ট কিন্তু অন্যের অনিষ্ট সাধনের জন্য করা তান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তাই ষড়যন্ত্র শব্দের মূল অর্থ হলো ছয়টি বন্ধন। এ ছয় বন্ধনে যাকে বাঁধা যাবে তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। ছয়টি বন্ধনের সাধনাই হলো 'ষড়যন্ত্র'। এ ছয়টি বন্ধন হলো (১) মারণ বা প্রাণ হরণ করা; (২) মোহন বা চিত্তবিভ্রম ঘটানো; (৩) স্তম্ভন বা যাবতীয় প্রবৃত্তি নষ্ট করা; (৪) বিদ্বেষণ বা অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা; (৫) উচ্চাটন বা স্বদেশবিভ্রম ঘটানো এবং (৬) বশীকরণ বা ইচ্ছাশক্তি রোধ করে বশে আনা। বর্তমানে তান্ত্রিকতা না থাকলেও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ছয় প্রকার আভিচারিক প্রক্রিয়ায় নিজের ইষ্ট ও অন্যের ক্ষতিসাধন অব্যাহত আছে।

ষণ্ড

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামের দুই পুত্র ছিল। দুই ভাই একযোগে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। বরাহকল্পে দেবাসুরের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে দেবপক্ষে থেকে এঁরা যুদ্ধ করেন। প্রথমে এরা অসুরদের সেনাপতি ছিল এবং যুদ্ধে দেবতাদের পরাজিত করে। দেবতারা মন্ত্রণা করে এক বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ষণ্ডমার্ককে অমৃত পান করিয়ে দেবতারা তাদের অসুর পক্ষ ত্যাগ করার অনুরোধ করেন। অমৃতপানে মত্ত দুই অসুর-সেনাপতি অসুরপক্ষ ত্যাগ করে। ফলে পরবর্তী যুদ্ধে অসুরপক্ষ পরাজিত হয়।

ষোলোকলা

'ষোলোকলা' শব্দের অর্থ—পূর্ণাবয়ব, সম্পূর্ণ, পুরোপুরি, চাঁদের ১৬ অংশ প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে 'চাঁদের ষোলোকলা' থেকে বাংলা বাগভঙ্গি 'ষোলোকলার' উৎপত্তি। কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের পরিণতি বা পূর্ণতা প্রকাশে

বাংলা ভাষায় ‘ষোলোকলা’ মনোরম কাব্যময় শব্দ। তবে এগুলো কিন্তু চম্পাকলা সাগরকলার মতো কলা নয়, ষোলোটি চন্দ্রকলা। চন্দ্রকলা বলতে বোঝায়—পৃথিবী হতে দৃশ্যমান চন্দ্রে ক্ষয় এবং বৃদ্ধির সময়কাল। চন্দ্রকলাকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। চন্দ্রের বিভিন্ন আলোকিত অংশ বিভিন্ন সময়ে দেখা যায়। শুক্লপক্ষে চন্দ্র প্রতিদিন একটু একটু করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তার ষোড়শকলা সম্পূর্ণ করে। চন্দ্রের এ ষোড়শবিধ কলা হলো অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অক্ষদা, পূর্ণা এবং পূর্ণামৃতা। বাংলা বাগ্রীতিতে সোজা কথায়, মানুষের কোনো ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক পূর্ণতায় পৌঁছানোর নামই ‘ষোলোকলা পূর্ণ হওয়া’। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনের বাসনা পূর্ণ হওয়াই ‘ষোলোকলা পূর্ণ হওয়া’। আবার কারও কারও বেলায় পাপেরও ষোলোকলা পূর্ণ হয়, মানে—তার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের ষোলোকলা পূর্ণ হওয়া মানে পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে জীবনের সফল পরিসমাপ্তি। অবশ্য ‘পরিপূর্ণ’ অর্থেও ষোলোকলার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন শরৎচন্দ্র লিখেছেন ‘বাপের স্বভাব একেবারে ষোলকলায় পেয়েছে।’

সপ্তবিংশ অধ্যায়

স

সই

'সই' শব্দের আভিধানিক অর্থ—স্বাক্ষর, দস্তখত। বাংলায় 'সই' শব্দের পাঁচটি অর্থ রয়েছে। আলোচ্য 'সই' অর্থ স্বাক্ষর। এ 'সই' শব্দটি আরবি 'সহিহ' শব্দ থেকে এসেছে। আরবি 'সহিহ' বাংলায় 'সহি' হিসাবে এসে 'সই' শব্দে স্থিত হয়েছে। আরবি 'সহি' শব্দের অর্থ—ঠিক, বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য, যথার্থ প্রভৃতি। 'সই'-এর মাধ্যমে কোনো জিনিসের নির্ভুলতা, যথার্থতা, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়। কেউ কোনো দলিলে সই দিলে ধরে নেওয়া হয় যে, সইদাতার পক্ষে দলিলটিকে সত্য বলে প্রত্যয়ন করা হয়েছে। আর এক 'সই' হলো মেয়ে বন্ধু; যেমন—খুখু আমার ছেলেবেলার সই।

সংকীর্ণ

'সংকীর্ণ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—সংকুচিত, সরু, অনুদার, হীন প্রভৃতি। যেমন—'সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা' কথায় 'সংকীর্ণ' অর্থ হয়— হীন বা অনুদার। সংস্কৃত হতে আগত এ শব্দটির মূল অর্থ ছিল—বহুলোক সমাকীর্ণ, অর্থাৎ বহুলোকে পূর্ণ, ব্যাপ্ত, মিশ্রিত ইত্যাদি। তাহলে কীভাবে এবং কেন বাংলায় এসে শব্দটি তার অর্থ পরিবর্তন করে ফেলল? যেখানে বহুলোক বাস করে, বহুলোক মিলিত হয় সেখানে ব্যাপ্ত বা বিস্তৃত পদ বা এলাকাও যোগাযোগ, যাতায়াত বা বসবাসের জন্য সংকুচিত হয়ে পড়ে। সরু হয়ে পড়ে বিশাল যাতায়াতের পথ এবং আয়-রোজগারের পথ। হয়তো সে অর্থে সংস্কৃত 'বিস্তৃত জনপদ' বাংলায় এসে 'সংকীর্ণ' অর্থ ধারণ করেছে।

সংগ্রাম

'সংগ্রাম' শব্দটির আধুনিক ও প্রচলিত অর্থ—'সমর/যুদ্ধ'। সমর বা যুদ্ধ থেকে নয়, মূলত 'গ্রাম' থেকে 'সংগ্রাম' শব্দের উৎপত্তি। সংগ্রাম শব্দের মূল অর্থ—'যে বিবাদে গ্রামবাসী সম্মিলিত'। আদি অর্থটি অভিন্ন থেকে বর্তমানে 'সংগ্রাম' শব্দটি গ্রাম ছেড়ে দেশ বা জাতির জন্যও সম্মিলিত সমর বা যুদ্ধ প্রকাশে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রামবাসীর 'সম্মিলিত বিবাদ' শব্দটিকে বাঙালিরা বেশ চালাকির সঙ্গে 'সংগ্রাম' বানিয়ে দিয়েছে।

সংবাদ

'সংবাদ' শব্দের প্রচলিত অর্থ খবর। তবে এর মূল অর্থ—পরস্পর কথাবার্তা, সম্ভাষণ, সাদৃশ্য প্রভৃতি। মূলত 'সন্দেশ' থেকে 'সংবাদ'। 'সন্দেশ' শব্দের মূল অর্থ—যা সম্যকরূপে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে বা যা যথার্থ বিষয় বা বস্তুকে জানায়। একসময় সংবাদকে 'সন্দেশ' বলা হতো। সেকালে কোনো আত্মীয়কে সুখবর দিতে হলে খবরদাতা বা খবরদাতার পক্ষ থেকে আত্মীয় বাড়িতে মিষ্টান্ন নিয়ে যাওয়া হতো। এ অনুষঙ্গের সূত্রে 'সন্দেশ' শব্দের অর্থ 'মিষ্টান্ন' হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এর অর্থ আরও পরিবর্তিত হয়। এখন 'সন্দেশ' বলতে কেবল বিশেষ ধরনের মিষ্টান্নকে নির্দেশ করে। 'সন্দেশ' শব্দের পরে আসে 'সংবাদ' এবং মুসলমান আমলে আসে 'খবর'। 'খবর' ফারসি শব্দ কিন্তু 'সন্দেশ' ও 'সংবাদ' দুটোই সংস্কৃত শব্দ। এখনও গ্রামগঞ্জে নিমন্ত্রণের সংবাদ দিতে অনেকে গুরুত্বানুসারে পান-মিষ্টি নিয়ে আসেন।

সংহিতা

যাতে বিষয়সমূহ সংহিতা বা একত্রিত করা হয়েছে তাকে সংহিতা বলে। যেমন—ঋগ্বেদসংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি। অন্যকথায়, মনু, অত্রি প্রমুখ ঋষিরা যে ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তা 'সংহিতা' নামে পরিচিত। মনু, অত্রি,

বিষ্ণু, হারীত, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, দক্ষ, গৌতম, শীতাতপ ও বশিষ্ঠ প্রমুখ প্রণীত ঊনবিংশ সংহিতা রয়েছে।

সগর

ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা। 'স' অর্থ সহ এবং 'গর' অর্থ বিষ। 'বিষের সঙ্গে জাত' বলে তাঁর নাম সগর। রাজা রাহুর ঔরসে ও স্ত্রী যাদবীর গর্ভে সগর জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে সগর নামের একটি জেলা ও শহর রয়েছে।

সঞ্জীবনী

যে বিদ্যার ফলে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা যায়, তাকে 'সঞ্জীবনী বিদ্যা' বলা হয়। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এ বিদ্যা জানতেন।

সৎমা

'সৎ' অর্থ ভালো, সুতরাং 'সৎমা' অর্থ ভালো যে মা। কিন্তু সৎমায়ের মতো নিষ্ঠুর আর কেউ কি আছে? সৎমায়ের নৃশংসতার কতো করুণ কাহিনি প্রত্যহ আমাদের শুনতে হয়, অনেককে দেখতে হয়, কাউকে কাউকে ভুগতেও হয়। তো এমন নিষ্ঠুর ও নৃশংস মায়ের নাম কীভাবে 'সৎমা' হলো? সংস্কৃত 'সপত্নী' থেকে সতিন এবং সতিন থেকে 'সৎ' এসেছে। এ সৎ-এর সঙ্গে মা যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে—'সৎমা'। মূলত সতীনের 'সৎ' থেকে 'সৎমা' শব্দের উৎপত্তি। তাই সৎমা শব্দের 'সৎ' ভালো 'সৎ' নয়; সতিন সৎ। মঞ্জুভাষণ হিসেবেও অনেকে 'সৎমা' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করে থাকেন। জনৈক পণ্ডিতের কয়েকজন শিশুসন্তান ছিল। হঠাৎ তাদের মা মারা যায়। সন্তানের লালন-পালনের জন্য পণ্ডিত নতুন বউ ঘরে তুলতে বাধ্য হন। বিয়ের পূর্বে নতুন বউকে কথা দিতে হয়েছিল তিনি সততার সঙ্গে এবং সৎ থেকে পণ্ডিতের সন্তানদের লালন-পালন করবেন। পণ্ডিতের বাড়ি আসে নতুন বউ। অনেকে জানতে চাইতেন 'এ কোন ধরনের মা?' পণ্ডিত বলতেন 'সৎমা'। খুশি হতেন পণ্ডিতের নতুন বউ। এখনও এরূপ কথা দিয়ে ও কথা নিয়ে অনেকে নিজের নতুন বউ এবং সন্তানের 'সৎমা'কে বিয়ে করে।

সন/সাল

'১৯৪৩ সালে/সনে সাহিত্যিক আহমদ ছফা জন্মগ্রহণ করেন।'—এ বাক্যটিতে ব্যবহৃত 'সাল' শব্দটি যদি খ্রিস্টাব্দ বোঝানোর জন্য লেখা হয় তাহলে সাল কিংবা সন লেখা ভুল, বাংলা সন প্রকাশের জন্য লেখা হয়ে থাকলেও ভুল। AD (Anno Domini = in the year of our Lord) শব্দের অর্থ খ্রিস্টাব্দ, কখনো সাল বা সন নয়। এখানে লর্ড শব্দটি দ্বারা যিশু খ্রিস্টকে এবং বছর বলতে তাঁর মৃত্যুবর্ষকে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই সাল বা সন শব্দটি ইংরেজি খ্রিস্টাব্দের বিকল্প হতে পারে না। যেমন হতে পারে না 'হিজরি'-র বিকল্প সন বা সাল। বস্তুত ইংরেজি (Year) শব্দের অর্থ সন বা সাল। খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, হিজরি, মঘি কিংবা অন্য কোনো বছর-পরিমাপক পদ্ধতির নাম বোঝাতে সাল/সন ব্যবহার করা অশুদ্ধ। এগুলো ফুট, মিটার, পাউন্ড, কেজি প্রভৃতির ন্যায় এক প্রকার একক। অতএব ইংরেজি সন লিখতে খ্রিস্টাব্দ, বাংলা সনে বঙ্গাব্দ, হিজরি সনে হিজরি লিখুন—সন বা সাল নয়।

সনদ

'সনদ' শব্দটি বিশেষ্য এবং আরবি শব্দ। সনদ শব্দটি মূলত আরবি 'সানাদুন' শব্দের বাংলা ও উর্দু প্রতিরূপ, যার বহুবচন 'সানাদাত'। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়—স্বীকৃতিপত্র, প্রতিশ্রুতিপত্র, প্রমাণপত্র, দস্তাবেজ, রশিদ, সনদ। এর আরও অর্থ হতে পারে উপাধিপত্র বা প্রজ্ঞাপত্র—ইংরেজিতে যাকে বলে 'সার্টিফিকেট'। শুধু 'সনদ'

শব্দ দ্বারাই উপাধিপত্র বা সার্টিফিকেট অর্থ প্রকাশ পায়। অনুরূপ শব্দ যেমন 'ফরমান' এটি বিশেষ্য এবং ফারসি শব্দ। এর অর্থ—হুকুমনামা বা আদেশপত্র। আমরা যেমন আদেশপত্রের অনুকরণে ফরমানপত্র বলতে পারি না, তেমনি উপাধিপত্র বা প্রশংসাপত্রের অনুকরণে সনদপত্রও লিখতে পারি না। শুধু 'সনদ' লিখলেই ঠিক হবে।

সন্দেশ

'সন্দেশ' নামটি এসেছে ফারসি ভাষা থেকে। এর মূল অর্থ—সংবাদ। পূর্বে কারও বাড়িতে সুখবর নিয়ে যাবার সময় হাতে করে কিছু মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। এখনও তা দেখা যায়। সুসংবাদ স্বভাবতই সুখের, মিষ্টিময়। তাই ফারসি সন্দেশ তথা সংবাদ বাংলায় সুসংবাদ বিতরণের অন্যতম সঙ্গী মিষ্টির সাথে একাকার হয়ে 'সন্দেশ' নাম ধারণ করে। উল্লেখ্য, পূর্বে সন্দেশ বলতে যেকোনো মিষ্টান্নকে বোঝাত। এখন অবশ্য 'সন্দেশ' একটি বিশেষ ধরনের মিষ্টি।

সপ্তসমুদ্র

ভারতীয় পুরাণে পৃথিবীর সমুদ্রসমূহকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ সাতটি সমুদ্র হচ্ছে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল। ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত এ সাত সমুদ্রকে একত্রে 'সপ্তসমুদ্র' বলা হয়।

সব্যসাচী

'সব্যসাচী' শব্দের মূল অর্থ—ডান ও বাম উভয় হাতে যিনি অসামান্য দক্ষতায় শর নিক্ষেপ করতে সক্ষম। মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এমন দক্ষতার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে সব্যসাচী বলা হতো। তবে সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসে 'সব্যসাচী' শব্দের অর্থের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। এখন 'সব্যসাচী' বলতে নানাবিধ কর্মসম্পাদনে সক্ষম ব্যক্তিকে প্রকাশ করা হয়। যিনি একধারে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, ছড়া, প্রবন্ধ প্রভৃতি সৃষ্টিতে সক্ষম তিনি সব্যসাচী লেখক। সৈয়দ শামসুল হক এ অভিধায় ভূষিত।

সমস্যা

শব্দটির আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ—জটিল, সংকট, দুরূহ প্রশ্ন, জটিল পরিস্থিতি, প্রতিকূল অবস্থা প্রভৃতি। শব্দটির আদি অর্থ ছিল সংক্ষেপ করা, শ্লোক সম্পন্ন করার জন্য সংক্ষিপ্ত বাক্য, মিশ্রণ প্রভৃতি। মধ্যযুগের বাংলায় শব্দটির অন্য একটি অর্থ ধারণ করতে দেখা যায়। সেটি হচ্ছে কূট বা জটিল প্রশ্ন। পরবর্তীকালে শব্দটি তার পূর্বের অর্থ পরিবর্তন করে প্রচলিত জটিল, সংকট, দুরূহ প্রশ্ন, জটিল পরিস্থিতি, প্রতিকূল অবস্থা প্রভৃতি অর্থ ধারণ করে। তো, এ পরিবর্তনের কি যৌক্তিক কোনো কারণ আছে? কারণ তো আছে, সঙ্গে অকাট্য যুক্তিও। সংক্ষেপ করা, সহজ করা বা শ্লোক সম্পূর্ণ করার জন্য বাক্যকে সংক্ষেপ করা প্রকৃত অর্থে অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ কাজ। এর চেয়ে কঠিন কাজ খুব কম আছে। সে হিসাবে সমস্যার পূর্ব অর্থের চেয়ে বর্তমান প্রচলিত অর্থ আরও যৌক্তিক।

সম্ভ্রান্ত

'সম্ভ্রান্ত' সংস্কৃত হতে আগত একটি শব্দ। বাংলা অভিধানে শব্দটির অর্থ দেওয়া হয়েছে অভিজাত, কুলীন, আশরাফ, মান্য, মর্যাদাশীল, সমাদরযোগ্য ইত্যাদি। কিন্তু শব্দটির মূল ও আদি অর্থ 'আবর্তিত, ভীত, উৎকণ্ঠিত, হতবুদ্ধি' প্রভৃতি। 'সম্ভ্রান্ত' ব্যক্তির দাপটে সাধারণ মানুষ ভীত, উৎকণ্ঠিত বা হতবুদ্ধি হয়ে যায় বলেই হয়তো শব্দটি বাংলায় আদি অর্থের পরিবর্তে বর্তমান অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। এতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরও নাখোশ হওয়ার কারণ নেই।

সসেমিরা

'সসেমিরা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—'বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতভম্ব, প্রায় প্রতিকারহীন অবস্থা'। এটি সংস্কৃত কবি কালিদাসের 'দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা' নাটকে বর্ণিত চারটি রহস্যময় শ্লোকের প্রত্যেকটির আদ্যাক্ষরের সমষ্টি। রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন এবং ভোজরাজাকে নিয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান 'দ্বাত্রিংশপুত্তলিকা'য় অভিশাপগ্রস্ত রাজপুত্র জয়পালের পিশাচ অবস্থা প্রাপ্তির পর হতবুদ্ধি অবস্থায় আপন মনে বলে ওঠেন, 'সসেমিরা'। এ স্বগতোক্তি থেকে 'সসেমিরা' শব্দটির উৎপত্তি। যা আধুনিক বাংলায় 'বাহ্যজ্ঞানশূন্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতভম্ব, প্রায় প্রতিকারহীন অবস্থা—প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে প্রয়োগ করা হয়।

সহজ

সহজ শব্দের অর্থ—সরল, সোজা, অকঠিন, শান্ত, অকপট, সহজাত, স্বাভাবিক। এর বিপরীত শব্দ হতে পারে—কঠিন, জটিল প্রভৃতি। তবে সহজ কথাটির আদি ও মূল অর্থ ছিল জন্মের সঙ্গে জাত, বংশগত ও স্বাভাবিক। মূলত, শব্দটি সহোদর বা একই মায়ের গর্ভজাত, যমজ প্রভৃতি বোঝানোর জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। এখন কিন্তু 'সহজ' শব্দটি যমজ বা সহোদর অর্থে প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকে পাগল না-বলে কারও উপায় থাকবে না। যিনি সহজ তিনি অকপট, সরল, প্যাঁচগোঁজহীন, স্বাভাবিক হন। সহজ জিনিসকে বিনাকষ্টে আয়ত্তে আনা যায়। যা সহজ তা অর্জনে তেমন শ্রম দিতে হয় না। অর্থাৎ সহজ জিনিস সবসময় অনায়াসলব্ধ ও সহজগম্য। সহোদর, যমজ প্রভৃতির সম্পর্কের মতোই 'সহজ' বিষয়টি সরল ও অনাবিল বলেই হয়তো সংস্কৃত 'সহোদর' বাংলায় এসে সহজ হয়ে গেছে।

সহানুভূতি

'অবলাবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ) Sympathy শব্দের বাংলা করেছিলেন সহানুভূতি। 'সহানুভূতি' শব্দ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সহানুভূতির উপর আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।" ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২৬ মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয় যা ভাষাকে চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে, যেমন সহানুভূতি।" স + অনুভূতি = সহানুভূতি। 'সহানুভূতি' শব্দের সঙ্গে 'সহ, সঙ্গে বা সাথে' বিদ্যমান। সহানুভূতির অর্থ হলো 'অন্যের দুঃখ-বেদনা তার সঙ্গে সমান অনুভূতি'। তাহলে সহানুভূতির সঙ্গে বাগভঙ্গির অর্থ হয় 'অন্যের দুঃখ-বেদনায় তার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি'। সংগতকারণে সহানভূতি শব্দের সঙ্গে পুনরায় সঙ্গে সাথে বা সহিত যুক্ত করলে শব্দটির অর্থ অনর্থকভাবে হাস্যকর হয়ে ওঠে। অতএব সহানুভূতি শব্দের সঙ্গে পুনরায় সঙ্গে/সাথে যোগ করা সমীচীন নয়।

স্তম্ভিত

'স্তম্ভিত' শব্দের আভিধানিক অর্থ—হতবাক, হতভম্ব, আবিষ্ট, মুগ্ধ ইত্যাদি। ঘরের 'স্তম্ভ' বা থাম হতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি। ঘরের স্তম্ভ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, নড়েও না চড়েও না। মানুষ 'স্তম্ভিত' হলে স্তম্ভের ন্যায় কিছু মহূর্তের জন্য হলেও নিশ্চল হয়ে যায়। শুধু মানুষ কেন, প্রাণীর ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। ঘরের স্তম্ভ যেমন নড়ে না, নিশ্চল হয়ে থাকে তেমনি হতবাক হয়ে গেলে মানুষও স্তম্ভের মতো নিশ্চল হয়ে যায়। অবশ্য মানুষ স্তম্ভিত হলে স্তম্ভ হয়ে যায় না, স্তম্ভবৎ হয়ে যায়। এজন্য মানুষ বা প্রাণীর হতবাক/হতভম্ব বোঝাতে স্তম্ভকে এনে স্তম্ভিত করা হয়েছে। 'সম্ভ্রান্ত' ব্যক্তির দাপটে সাধারণ মানুষ ভীত, উৎকণ্ঠিত বা হতবুদ্ধি হয়ে যায় বলেই হয়তো শব্দটি বাংলায় আদি অর্থের পরিবর্তে বর্তমান অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

সাঙ্গোপাঙ্গ

দলবল, অনুচর, চেলা, পরিষদ, বন্ধুদল প্রভৃতি। 'সাঙ্গোপাঙ্গ' একটি সংস্কৃত শব্দ। 'বেদ' ও তার বিভাজন অংশসমূহ 'সাঙ্গোপাঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। যেমন—'বেদ' পুরো শরীর কিন্তু শিক্ষা, কল্প, পুরাণ, ব্যাকরণ প্রভৃতি তার উপাঙ্গ। অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ বলতে 'বেদ'-এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য অঙ্গ, উপাঙ্গ, খণ্ড, কাণ্ড প্রভৃতিকে প্রকাশ করা হতো। সাঙ্গোপাঙ্গ ছাড়া 'বেদ' পরিপূর্ণ কার্যনির্বাহে সফল হতো না। সাধারণভাবে প্রাত্যহিক জীবনের অনেক কাজ অনেকের পক্ষে 'সাঙ্গোপাঙ্গ' ছাড়া যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় না। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বিষয়টি আরও কঠিনভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। এজন্য সংস্কৃত 'বেদ-সংশ্লিষ্ট' শব্দ 'সাঙ্গোপাঙ্গ' বাংলায় এসে দলবল, অনুচর, চেলা বা পরিষদ অর্থ ধারণ করেছে। আসলে শব্দটির বাহ্যিক অর্থ পরিবর্তন হলেও মূল অর্থ ঠিকই আছে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা অনুচর বা চেলা ছাড়া চলতে পারে না। রাষ্ট্রীয় কার্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিষদ ও পরিষদ অনিবার্য অঙ্গ।

সাতসতেরো

'সাত-পাঁচ না ভাবা' কিংবা 'সাত সকাল' ছাড়াও 'সাত' নিয়ে বাংলা ভাষায় আরও বেশ কয়েকটি বাগধারার প্রচলন আছে। যেমন—সাত জন্মে (কখনো), সাত-পাঁচ ভাবা (নানা চিন্তা), সাতঘাটের কানাকড়ি (অকিঞ্চিৎকর সংগ্রহ), সাতেও নেই পাঁচেও নেই (সংশ্রবশূন্য), সাতচড়ে রা করে না (অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক), সাত পুরুষে না শোনা (বংশানুক্রমে অশ্রুত), সাতরাজার ধন মানিক (কষ্টার্জিত মহা-মূল্যবান সম্পদ), সাত ঘাটের জল খাওয়া/খাওয়ানো (বহু বিপদে পড়া বা ফেলা), সাত তাড়াতাড়ি (অতি শীঘ্র), সাত দিক (সর্বত্র) প্রভৃতি। এ সকল 'সাত'-যুক্ত বাগধারায় 'সাত' সংখ্যাটি মূলত 'সপ্তাহ' বা 'সাত দিন' বর্ণনার মাধ্যমে সময়ের পরিধি (অতিরিক্ত বা কম) প্রকাশ করেছে। সাত হচ্ছে সপ্তাহের সাত বারের প্রতীক। যা দিয়ে 'বার' শুরু এবং শেষ। তাই সাত দিয়ে বিস্তৃত, আদি-অন্ত, গভীর, নিবিড়, সময়, বৃদ্ধি, হ্রাস, কম প্রভৃতি গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হতো। শুধু তাই নয়, 'সাত আসমান', 'সাত স্বর্গ', 'সাত নরক', 'সাত সাগর', 'সপ্তরথী', 'সপ্তর্ষি', 'সপ্তলোক', 'সপ্তশতী', 'সপ্তানক' 'সৌভাগ্যের সাত' প্রভৃতির আদি-অন্ত, পরিধিও সপ্তাহের সাতদিনের সঙ্গে অভিন্ন অর্থ প্রকাশে বাগধারাগুলোকে প্রভাবিত করেছে। তাই 'সাত' শব্দটি যেমন অতিরিক্তি প্রকাশে ব্যবহার করা হতো তেমনি অতি-কম প্রকাশেও ব্যবহার করা হতো। কারণ সাত ছিল আদি-অন্ত বা কম-বেশির এবং ভালো-মন্দ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির পরম ও চরম পরিধি।

'সাত পুরুষে না শোনা' বাগধারায় 'সাত' দ্বারা দীর্ঘ সময় প্রকাশ করা হয়েছে। আবার 'সাত তাড়াতাড়ি' বাগধারার বর্ণিত 'সাত প্রকাশ করছে 'স্বল্পতা'। তেমনি 'সাত সকাল' বাগধারার 'সাত' দ্বারা অতি সকাল প্রকাশ করা হচ্ছে। এমন আরও কয়েকটি উদাহরণ : সাত সন্ধ্যা, সাত জনম, সাত যুগ ইত্যাদি।

সাবেক ও প্রাক্তন

'সাবেক' আর 'প্রাক্তন' 'সাবেক' শব্দটি বাংলায় এসেছে আরবি সাবিক থেকে, কাজেই সাবেক বিদেশি শব্দ। 'প্রাক্তন' এসেছে সংস্কৃত থেকে, কাজেই প্রাক্তন তৎসম শব্দ। সাধারণভাবে, চলিত ভাষায় 'সাবেক' এবং সাধু ভাষায় 'প্রাক্তন' শব্দটি ব্যবহার করা যুতসই ও যথাযথ হবে বলে মনে হয়। 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী' ও 'সাবেক সচিব'—এই দুটি বাগভঙ্গিতে প্রাক্তন ও সাবেক এ বিশেষণ পদ দুটো পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হলে আমরা পাই 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী' ও 'প্রাক্তন সচিব'। প্রথম দুটি শব্দবন্ধের তুলনায় পরবর্তী দুটি শব্দবন্ধ শৈলীর দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও অর্থের দিক দিয়ে অভিন্ন। তবে, প্রাক্তন শব্দের কিছু অর্থগত ও প্রায়োগিক অনুপমতা রয়েছে। 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে'র 'প্রাক্তন' ভুক্তিতে 'হিন্দু বিশ্বাস মতে জন্মান্তরের; পূর্বজন্মে করা হয়েছে এমন (প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে; প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে)।" উদ্ধৃতির উদাহরণে 'প্রাক্তন'

শব্দটি 'সাবেক' শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সমীচীন হবে না। নিচের দুটো বাক্য লক্ষ করুন
(১) সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
(২) প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মে সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। প্রথম বাক্যে 'সাবেক' প্রয়োগ ও দ্বিতীয় বাক্যে 'প্রাক্তন' প্রয়োগ সর্বোত্তম।

সামান্য

'সামান্য' শব্দের আভিধানিক অর্থ—তুচ্ছ, নগণ্য, অগ্রাহ্য, হেলাফেলা, অল্প, সাধারণ প্রভৃতি। তবে এর মূল ও আদি অর্থ বর্তমান প্রচলিত অর্থ হতে অনেক দূরে ছিল। 'সামান্য' শব্দটির মূল অর্থ ছিল—সমান ভাব, সমান সমান, সমানতা প্রভৃতি। এ সমান ভাব বা সমানতা কীভাবে তুচ্ছ বা নগণ্য হয়ে গেল তা নিয়ে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কোনো জিনিস ভাগ করার সময় প্রাচীনকালে বর্তমানকালের মতো যথার্থ পরিমাপক যন্ত্রের এত প্রাচুর্য ছিল না। থাকলেও সময় বা নানা অসুবিধা বিবেচনায় চোখের আন্দাজে পণ্যাদি ভাগ বা বিভাজন করা হতো। এখনও বাজারে মাছ, শস্য, সবজি প্রভৃতি দাঁড়িপাল্লা ছাড়া চোখের আন্দাজে ভাগ করে বিক্রি হতে দেখা যায়। ভাগসমূহ আপাতদৃষ্টিতে ওজন, গুণ ও পরিমাণে পুরোপুরি সমান হতো না, যেভাবে করা হোক না কেন, চোখের আন্দাজে করা হতো বলে সামান্য হেরফের থেকেই যেত। এ পার্থক্য তুচ্ছ, নগণ্য বা খুব অল্প হলে ধরে নেওয়া হতো বিভাজনগুলো সমান হয়েছে। এ জন্য সংস্কৃত 'সামান্য' শব্দের সমানতা বাংলায় এসে তুচ্ছ হয়ে গেছে। এছাড়া মানুষ কোনো ভাগে স্বাভাবিকভাবে যা পায় তা সবসময় কমই মনে করে থাকে। অর্থ পরিবর্তনে এ বিষয়টাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সাম্পান

চট্টগ্রাম অঞ্চলে, বিশেষ করে কর্ণফুলী নদীতে 'সাম্পান' নামের এক বিশেষ ধরনের নৌকা চলাচল করে। প্রবল স্রোতেও এটি সহজে চালিয়ে নেওয়া যায়। চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্পান গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের বিখ্যাত শিল্পী শেফালী ঘোষের—'ওরে সাম্পানওয়ালা, তুই আমারে করলি দিওয়ানা...' গানটি এখনও চট্টগ্রামের পথে-প্রান্তরে ঢেউ তোলে। 'সাম্পান' চীনা শব্দ। চীনে হালকা নৌকা বোঝাতে 'সাম্পান' শব্দ ব্যবহার করা হয়। চীনা 'সান' ও 'পান' শব্দের সমন্বয়ে 'সাম্পান' শব্দটি গঠিত হয়েছে। চীনা ভাষায় 'সান' শব্দের অর্থ তিন ও 'পান' শব্দের অর্থ পাটাতন। সুতরাং 'সাম্পান' শব্দের অর্থ তিন পাটাতনবিশিষ্ট। সাম্পান নামের নৌকাটি তিন পাটাতনের।

সালিশ

'সালিশ' শব্দের অর্থ—বিচার, মধ্যস্থ, নিষ্পত্তিকারী মধ্যস্থ ব্যক্তি প্রভৃতি। আরবি থেকে শব্দটি বাংলায় এসেছে। সোজা কথায়— 'সালিশ' অর্থ কোনো বিরোধ বা অন্য কোনো বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসার জন্য ওই বিরোধ বা বিতর্কের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় এমন মধ্যস্থ ব্যক্তি বা মাধ্যম। আর 'সালিশি' হলো মধ্যস্থতা। আরবি ভাষায় শব্দটির অর্থ ছিল—তৃতীয়, তৃতীয় ব্যক্তি, তৃতীয় মাধ্যম। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ঝগড়া হলে তা মীমাংসা বা নিষ্পত্তি ওই দুই ব্যক্তি করতে পারে না। তা করার জন্য তৃতীয় ব্যক্তি বা তৃতীয় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রেও এমন তৃতীয় রাষ্ট্রের উপস্থিতি দেখা যায়। রাজনীতিক বিরোধেও তৃতীয় রাজনীতিক শক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন।

সাহস

'সাহস' শব্দের অর্থ—ভয়হীনতা, ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রভৃতি। 'সাহস' সংস্কৃত শব্দ।

সংস্কৃত ভাষায় 'সাহস' শব্দের অর্থ—অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা, অনৌচিত্য, জোরপূর্বক অপরাধ সংঘটন, খুন, নরহত্যা, চৌর্য, পরদারগমন, কলহে লিপ্ত হওয়া, অসততা, ঝগড়া করা প্রভৃতি। সংস্কৃত হতে বাংলায় এসে শব্দটি পুরো নেতিবাচক অর্থ পাল্টে পুরো ইতিবাচক অর্থ ধারণ করেছে। আসলে বাঙালিরা শুধু বিচক্ষণ নয়, মহাবিচক্ষণও বটে। সংস্কৃত ভাষায় 'সাহস' শব্দের যে অর্থ সে সকল অনৌচিত্য কাজ তথা খুন, বলপূর্বক অপরাধ, ঝগড়া, নরহত্যা, পরদারগমন প্রভৃতি যে কেউ করতে পারে না। এমন কাজ করতে হলে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ভয়হীনতা, নির্ভীকতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রভৃতি। বাংলার সাহস শব্দে এগুলো আছে বলে হয়তো 'সাহস' শব্দটা পূর্বের অর্থ বাদ দিয়ে ইতিবাচকতার ছদ্মাবরণে নেতিবাচক কাজ চালিয়ে যেতে পারছে। তাই সাহস সবসময় যে ভালো করে তাই নয়, মাঝে মাঝে অঘটনও ঘটিয়ে বসে সংস্কৃত 'সাহস'-এর ন্যায়।

সাহেব

'সাহেব' শব্দটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মহাশয়, কর্তা, প্রভু, ইউরোপীয়, ইংরেজ, ক্ষমতাবান প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সাহেব' মূলত আরবি 'সাহব' থেকে এসেছে। তবে আরব থেকে শব্দটি সরাসরি বাংলায় আসেনি। ইরান হয়ে এবং ইরানের ভাষা-নাগরিকত্ব গ্রহণ করে ইরানিদের মাধ্যমে বাংলায় এসেছে। আরবি 'সাহব' শব্দের অর্থ হলো—সহচর, সঙ্গী বা সাথি। আরবিতে এ 'সাহব' শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে 'সাহাবি'। বাংলা 'সাহেব' ও আরবি 'সাহব/সাহাবি' শব্দ সম্পর্কের দিক থেকে অভিন্ন হলেও দেশভেদে দুটোর অর্থের বিশাল ব্যবধান লক্ষ করা যায়। বাংলার 'সাহেব' কখনো আরবি 'সাহবে'র মতো মানুষের সঙ্গী বা সাথি হতে পারেনি। ইরানি কায়দায় বাংলা 'সাহেব' প্রথমে হয়েছে প্রভু, তারপর হয়েছে সম্ভ্রান্ত মুসলমান বা মুসলমান ভদ্রলোক এবং আরও পরে হয়েছে ইউরোপ বা আমেরিকান সাদা চামড়ার অভিজাত। বর্তমানে যেকোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তিই 'সাহেব'। এত পরিবর্তনের পরও 'সাহেব' কিন্তু তার পুরো চরিত্র অবিকল রেখে দিয়েছে—হয়তো প্রভাবের জোরে।

স্নাতক

ব্যাচেলরস ডিগ্রির বাংলা—স্নাতক। গ্র্যাজুয়েট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডিগ্রি বোঝাতেও শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কেন এটি স্নাতক হলো? প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্তিসূচক আনুষ্ঠানিক স্নান করার রেওয়াজ ছিল। এটি ছিল সনদ প্রদানের মতো বাধ্যতামূলক। তাই বিদ্যাশিক্ষা সম্পন্নকারীদের বলা হতো স্নাতক। প্রাচীন গুরুগৃহের সে স্নান থেকে আধুনিক গর্বিত ডিগ্রি স্নাতকের ব্যুৎপত্তি। ইংরেজি ব্যাচেলরস ডিগ্রির 'ব্যাচেলর' শব্দটির উৎপত্তিও কৌতূহলোদ্দীপক। ইংরেজি 'ব্যাচেলরস' শব্দটির উৎস ল্যাটিন Baccalaureus. এর অর্থ—রাখাল। তবে আধুনিক ব্যাচেলরস কিন্তু রাখাল নন। তারা রাখাল-নামীয় ডিগ্রি পাওয়ার পর আর রাখাল হতে চান না। এখানেই কাগুজে ডিগ্রির ব্যর্থতা।

স্থাণু

নীল-লোহিত রুদ্রকে ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে নিষেধ করে দেন। এ নিষেধাজ্ঞার পর রুদ্র 'স্থিতোস্মি' বা 'আমি বিরত হলাম'—বাক্য উচ্চারণপূর্বক প্রজাসৃষ্টি কার্য ত্যাগ করেন। এই 'স্থিতোহস্মি' উচ্চারণ করায় ইনি 'স্থাণু' নামে অভিহিত হন। পুরাণের আর একটি কাহিনি মতে, মহাদেবের এক নাম স্থাণু। তিনি স্থির, স্থিরলিঙ্গ এবং নিজে ঊর্ধ্বে অবস্থান করে প্রাণীদের বিনাশ সাধন করেন। এ জন্য তিনি স্থাণু নামে পরিচিত। বাংলায় ব্যবহৃত 'স্থাণু' শব্দটিও এ ঘটনা হতে এসেছে।

সিংহভাগ

'সিংহভাগ' বাংলা ভাষায় পরিচিত একটি শব্দ। এর অর্থ—অধিকাংশ কিংবা প্রায় সবটা। শব্দটি ইংরেজি

Lion's Share বাগভঙ্গির অনুবাদ। ইংরেজগণ ঈশপের গল্প থেকে বাগভঙ্গিটা গ্রহণ করেছে, যা কালক্রমে বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। ঈশপের গল্পটা অনেকের জানা। তবু প্রসঙ্গ বিবেচনায় আবার বলি। এক সিংহ এবং শেয়াল একত্রে একটা হরিণ শিকার করল। ভাগ করার সময় শেয়াল কিছু বলতে চাইলে সিংহ ধমক দেয় সারাক্ষণ খাই-খাই কেন। চুপ করে বসে দেখ। আমি রাজা, অন্যায্য কিছু করব না। সিংহ হরিণটাকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে শেয়ালকে বলল পণ্ডিত, ঠিক আছে তো!

শেয়াল আমরা তো দুইজন, ভাগ তিনটা কেন?

সিংহ তোমাকে তো আমরা পণ্ডিত বলে জানি। এখন বুঝলাম, তোমার জ্ঞান আছে কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান নেই। শোন, প্রথম ভাগটা আমার, কারণ আমি পশুরাজ। দ্বিতীয় ভাগটা শিকারে আমি যে শ্রম দিয়েছি তার পারিশ্রমিক। তৃতীয় ভাগটা নিশ্চয় তুমি আশা করে আছ? সেটাই উচিত। তৃতীয় ভাগ তোমার কিন্তু ভাগটা তুমি আমার সামনে থেকে নেবে কীভাবে? রাজা হিসেবে তো কমপক্ষে চার-পঞ্চমাংশ নজরানা দিয়ে দিতে হবে, নাকি!

অতএব সিংহ পুরোটাই নিয়ে নিল। শেয়াল পড়ে থাকা রক্ত আর হাড় খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে বাধ্য হয়।

সুচরিতাসু বনাম সুচরিতেষু

চিঠিতে বা কবিতায় বা গদ্যসাহিত্যে আমরা মেয়ে বন্ধুকে সম্বোধন করে লিখি বা বলি সুচরিতাসু; ছেলে বন্ধুকে— সুচরিতেষু। 'সুচরিত, সুচরিত্র [সুচোরিত,—

ত্ত্রা] বি উত্তম চরিত্র; সৎস্বভাব। বিণ সচ্চরিত্র। {স. সু + চরিত, সুপ্সুপা; সু + চরিত্র; বহু.}' 'সুচরিতা, সুচরিত্রা [সুচোরিতা, -ত্ত্রা] বি স্ত্রী. সৎস্বভাবা। বিণ সচ্চরিত্র। {স. সুচরিত + আ, সুচরিত্র + আ}' 'সুচরিতেষু [সুচোরিতেশু] সুচরিত্রের নিকট চিঠি লেখায় প্রথাসম্মত পাঠ। সুচরিতাসু স্ত্রী.। {স. সু + চরিত, ৭মী বহুব}' সুচরিত থেকে স্ত্রীলিঙ্গে সুচরিতা— এটুকু বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। সুচরিতাকে সম্বোধন করে বলছি সুচরিতাসু—বলা চলে, এটাও সহজভাবে বোঝা যায় এবং মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু সুচরিতকে সম্বোধন করতে গিয়ে বলতে হয় সুচরিতেষু।

কেন? সুচরিত শব্দটির সাথে ৭মী বিভক্তি 'এ' যোগ হয়ে সুচরিতে হয়েছে, তারপর সুচরিতাসু-র মতো -সু যুক্ত না-হয়ে যুক্ত হয়েছে '-ষু', আমরা পেলাম সুচরিতেষু। কেন -ষু? এবং কেন নয় -সু? আসলে এটি সন্ধির নিয়ম। "সন্ধিবদ্ধ, সমাসবদ্ধ কিংবা উপসর্গজাত শব্দের পরপদে কখনো /স/ এবং কখনো /ষ/ হয়। সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর /ষ/ হয়। যেমন—কল্যাণবরেষু কল্যাণীয়েষু প্রীতিভাজনেষু, প্রিয়বরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, সুচরিতেষু, সুহৃদবরেষু, কল্যাণীয়বরেষু, প্রিয়ভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, স্নেহাস্পদেষু প্রভৃতি। সম্ভাষণসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর স হয়। যেমন—কল্যাণীয়াসু। আ-কারের পর স্ত্রীবাচক সম্ভাষণে সু হয়। যেমন—কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, পূজণীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু ইত্যাদি। উল্লেখ্য, পুরুষবাচক সম্ভাষণে 'ষু' হয়।

ব্যাকরণের নিয়ম জানার পরও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সুচরিতেষু ও সুচরিতাসু জাতীয় পদের প্রয়োগে শুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য আমার একটি কৌশল মনে রাখুন 'পুরুষ' শব্দে মূর্ধন্য-ষ আছে, 'মহিলা' শব্দে মূর্ধন্য-ষ নেই। সুতরাং পুরুষকে সম্বোধন করতে মূর্ধন্য-ষ দিয়ে -ষু লিখুন, -সু নয়। সুচরিতেষু; মহিলা-য় আ-কার আছে, পুরুষ-এ আ-কার নাই; সুতরাং মহিলাকে সম্বোধন করতে আ-কারসহ -তা লিখুন, -তে নয় : সুচরিতাসু।

সুতরাং

'সুতরাং' শব্দটি বহুল প্রচলিত এবং উপসংহারে অনেকে ব্যবহার করেন। এর আভিধানিক অর্থ—অতএব, কাজেই, অগত্যা, এ হেতু প্রভৃতি। সংস্কৃত হতে শব্দটি বাংলায় এসেছে। সংস্কৃতে শব্দটির অর্থ অধিকতরভাবে, অতিশয়, প্রচুর, অত্যন্ত প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় এসে শব্দটি অর্থ পরিবর্তন করেছে। এ অর্থ পরিবর্তনের হেতু

আছে। অতএব দিয়ে বাক্য, চিন্তা বা কর্মের সমাপ্তির ইঙ্গিত টানা হয়। আর এ সমাপ্তির মূল হচ্ছে প্রচুর, অত্যন্ত বা পূর্ণ হওয়া। এটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যবস্তু অর্জনের বিষয়। লক্ষ্য অর্জিত হলে বিশ্রামের বা কর্ম ত্যাগের ইচ্ছা কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রবল হয়ে ওঠে। তাই বলা যায়, 'সুতরাং' শব্দটি সংস্কৃত হতে বাংলায় এসে ব্যাকরণগত অর্থ হারালেও অন্তর্নিহিত অর্থ তাকে হারাতে হয়নি।

সুধী

'সুধী' খুব পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। সংস্কৃত হতে আগত এ শব্দটি যার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় তিনি 'সু' হোন বা না হোন শব্দটা শুনেই 'সু' হওয়ার ক্ষণিক আনন্দে হলেও মোহিত হয়ে ওঠেন। 'সু' মানে—ভালো, উত্তম, সুন্দর এবং 'ধী' মানে বুদ্ধি, বোধশক্তি, জ্ঞান, মেধা প্রভৃতি। সুতরাং 'সুধী' মানে—উত্তম বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি, সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। অনেককে সূধী/সূধি/সুধি ইত্যাদি লিখতে দেখা যায়। এটি ভুল। সুধী সম্মানিত শব্দ। এতে হ্রস্ব ই-কার নয়, দীর্ঘ ঈ-কার দিতে হয় এবং হ্রস্ব উ-কার। অন্যদিকে 'সুধি' শব্দের অর্থ—শুদ্ধবুদ্ধি, সহজ, ভালো বুদ্ধি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্বিতীয় খণ্ড' (অষ্টম মুদ্রণ ২০১১) গ্রন্থে লেখা হয়েছে 'সুধি' বি [সং সুধী] শুদ্ধবুদ্ধি, সহজ ভাল বুদ্ধি। "দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি। যত তত করি না হয়ে সুধি।" সুধি মতি = শুদ্ধ মতি, বুদ্ধিপ্রকর্ষ। অতএব 'সুধী' অর্থে 'সুধি' লিখবেন না।

সুরা

সমুদ্র মন্থন হতে 'সুরা' দেবীর উদ্ভব হয়। সুরা দেবী তাঁকে গ্রহণের মিনতি নিয়ে দেব ও দানবদের কাছে যান। দানবগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু দেবগণ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। সুরাগ্রাহী নন বলে দানবরা 'অসুর' নামে অভিহিত হন।

সূত্রপাত

সূত্র পাতা থেকে 'সূত্রপাত'। শব্দটির অর্থ—ভূমিকা, সূচনা বা আরম্ভ। বাংলা সূতা বা সুতো শব্দের সংস্কৃত রূপ হলো 'সূত্র'। এ সূত্রকে পাতা বা স্থাপন করার প্রক্রিয়াটাই হলো ব্যাকরণসিদ্ধ 'সূত্রপাত'। সূত্রপাতের কাজটি করতে হয় সূত্রধর বা ছুতোর মিস্ত্রি বা রাজমিস্ত্রিকে। সুতো পেতে বা ফেলে তাঁরা সোজা লাইন টানেন বা লাইন সোজা করেন। ছুতোর মিস্ত্রি কাঠ চেরাই করার পূর্বে কালি-মাখা সুতো ফেলে লাইন টেনে নেন। ছুতোর মিস্ত্রির সূত্র পাতার কাজটা 'সূত্রপাত' শব্দে প্রকাশ পায়। ধীরে ধীরে শব্দটির ব্যাপক অর্থ—সম্প্রসারণ ঘটে এবং যেকোনো কাজ শুরু করার ব্যাপারটাই হয়ে পড়ে 'সূত্রপাত করা' বা 'সূত্রপাত ঘটানো'।

সেতুবন্ধ

লঙ্কা গমনের জন্য রাম সমুদ্রের উপর একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেলে, সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের পরামর্শে রাম সমুদ্রের ওপর এ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুগ্রীব বিশ্বকর্মার পুত্র নলের ওপর সেতু নির্মাণের ভার দেন। নল প্রথম দিনে ২৪ যোজন, দ্বিতীয় দিনে ২০ যোজন, তৃতীয় দিনে ২২ যোজন, চতুর্থ দিনে ২২ যোজন, পঞ্চম দিনে ২২ যোজন সেতু নির্মাণ করে লঙ্কার বেলাভূমি পর্যন্ত সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। একশত দশ যোজন দীর্ঘ এ সেতু যেখান থেকে নির্মাণ শুরু হয়েছিল, সে স্থান 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর' নামে খ্যাত। ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত এ 'সেতুবন্ধ' হতে বাংলা 'সেতুবন্ধ' শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ সম্প্রীতি, নৈকট্য, সহমর্মিতা প্রভৃতি।

সোম

ঋগ্বেদ অনুযায়ী 'সোম' এক প্রকার গুল্ম বা লতা। এ লতার রস আর্যদের অতি প্রিয় পানীয় ছিল। এ রস হতে

উত্তেজক পানীয় প্রস্তুত হতো। পূজার সময় দেবতারা সোমরস দ্বারা পূজিত হতেন। সোমরস যজ্ঞের প্রধান আহূতি। ঋগ্বেদের সকল নবম মণ্ডল সোমের স্তবে পরিপূর্ণ। সোমবন্দনার সূক্তসংখ্যা ১২০। অপর ছয়টি সূক্তে সোমকে ইন্দ্র, অগ্নি, পূষা ও রুদ্রের সাথে অভিন্নভাবে স্তুতি করা হয়েছে। স্বর্গ হতে শ্যেনপক্ষী সোম আহরণ করেছিল। এ রস পান করলে অমর হওয়া যায়। এটি রোগ ও অঙ্গের বিকলতা দূর করে এবং সর্বরোগহর।

স্বয়ম্ভু

'স্বয়ম্ভু' শব্দের আভিধানিক অর্থ যিনি নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারেন। জীব সৃষ্টির লক্ষ্যে ভগবান বিষ্ণু জল সৃষ্টি করে তার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বীজ নিক্ষেপ করেন। জলে নিহিত এ বীজ হতে সুবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হয়ে জলের উপর ভাসতে থাকে। সে অণ্ডে ব্রহ্মা স্বয়ং উৎপন্ন হন। সেজন্য তাকে 'স্বয়ম্ভু' বলা হয়।

স্বর্ণযুগ

সমৃদ্ধির কাল বোঝাতে 'স্বর্ণযুগ' বাগভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি 'গোল্ডেন এজ' থেকে 'স্বর্ণযুগ' শব্দের উদ্ভব। তবে স্বর্ণযুগের ধারণাটি ইংরেজদের নিজস্ব নয়। এটি ইংরেজরা প্রাচীন রোমকদের কাছ থেকে নিয়েছে। আবার রোমকরা নিয়েছে প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকে। প্রাচীন গ্রিসের কবি হেসিওদ পৃথিবীর কালকে চারটি যুগে বিভক্ত করেছিলেন। যথা স্বর্ণযুগ, রৌপ্যযুগ, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগ। গ্রিক পুরাণ মতে, স্বর্ণযুগ ছিল আদি-দেবতা ক্রনাসের যুগ। সে যুগে মানুষ পরম শান্তিতে বসবাস করত। কোনো ঝগড়া, হিংসা বা দ্বেষ ছিল না। চাষবাস ছাড়াই ফসল ও ফলমূল পাওয়া যেত। মূলত সমৃদ্ধির এমন উৎকর্ষকে প্রকাশের জন্য 'স্বর্ণযুগ' বাগভঙ্গিটি ব্যবহার করা হয়।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

হ

হঠকারিতা

'হঠকারিতা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—গোয়ার্তুমি, অবিমৃষ্যকারিতা, জবরদস্তি প্রভৃতি। কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে হঠাৎ করে যে কার্য করা হয় সেটি 'হঠকারী'। হঠকারী থেকে হঠকারিতা। হঠকারিতা শব্দের মূল —'বলাৎকার'। দৈহিক মিলন একটি সুকুমার কার্য। মানুষ সাধারণত অতি আনন্দে অনেক বিষয়াদি চিন্তা করে ধীরে ধীরে দৈহিক মিলনে অগ্রসর হয়। কিন্তু বলাৎকার চরম জঘন্য, এখানে কোনো প্রেম-ভালবাসা বা সুকুমার ভাবনার স্ফুটন নেই। তারা প্রচণ্ড হিংস্র ভাব নিয়ে কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে হঠাৎ বলাৎকার করে বসে। বলাৎকারের এ জঘন্য চরিত্র ও প্রতিক্রিয়া হতে 'হঠকারিতা' শব্দের উৎপত্তি।

হঠাৎ

শব্দটি বহুল প্রচলিত। এর আভিধানিক অর্থ—অকস্মাৎ, সহসা, দৈবাৎ, কোনোরূপ পূর্ব-সতর্কতা ব্যতীত প্রভৃতি। শব্দটির মূল অর্থ— অবিমৃশ্যকারিতাবশত। আসলে যা হঠাৎ আসে তা সাধারণত ভালো হয় না। যা অপ্রত্যাশিত তা সাধারণত অবাঞ্ছিত হয়। এ অবাঞ্ছিত জিনিসই 'হঠাৎ'। যেমন—হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে যাওয়া, হঠাৎ ভূমিকম্প, হঠাৎ গোলাগুলি, হঠাৎ বজ্রপাত প্রভৃতি। হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠাও কিন্তু কাঙ্ক্ষিত নয়। তবে মাঝে মাঝে হঠাৎ কিছু প্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটে। যেমন—এক যুগ পর হঠাৎ অতি প্রিয় কোনো বন্ধুর দেখা পাওয়া।

হদিস

শব্দটির আভিধানিক অর্থ—সন্ধান, উপায়, পথ, দিশা প্রভৃতি। আরবি 'হাদিস' শব্দ থেকে 'হদিস' শব্দের উৎপত্তি। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, আচরণ, কর্ম ও নির্দেশাবিলকে 'হাদিস' বলা হয়। এককথায় বলা যায়, তাঁর অনুমোদিত বাক্য ও কর্মই 'হাদিস'। মুসলমানগণ নিজেদের জীবন ও ধর্মীয় আচরণকে শুদ্ধরূপে পরিচালিত করার বিষয়ে কোনো কিছু জানার জন্য 'হাদিস' খোঁজেন। হাদিস অনুসন্ধান করে তাঁরা যথার্থ উত্তর পেতে চেষ্টা করেন। কোরানের পর এ হাদিস তাঁদের পথনির্দেশক বা দিশা। এ কার্যকারণই আরবি 'হাদিস' শব্দকে বাংলায় 'হদিস' শব্দে পরিণত করেছে। অন্তর্নিহিত কার্যকারণ বিশ্লেষণ করলে বাংলা হদিস এখন যে অর্থ ধারণ করেছে তা যেকোনো বিবেচনায় যথার্থ। সূচনাটা ধর্মীয় শব্দ হতে হলেও 'হদিস' এখন একটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ। 'হদিস' অর্থ—অনুসন্ধান, খোঁজ।

হন্যে

'হন্যে' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—ক্ষিপ্ত, হিতাহিতজ্ঞানহীন, পাগলা প্রভৃতি। হন্যে শব্দটি সংস্কৃত 'হন্য' শব্দ হতে বাংলায় এসেছে। এর আদি ও মূল অর্থ—হননীয় বা বধযোগ্য প্রাণী। যে প্রাণী বধযোগ্য ছিল সে প্রাণীকে বলা হতো 'হন্য'। পশুদের মধ্যে জনপদে পাগলা কুকুর ছিল ভয়ঙ্কর প্রাণী এবং বধযোগ্য। তাই বাংলায় 'হন্যে' শব্দ দ্বারা প্রথমে শুধু পাগলা কুকুর প্রকাশ করা হতো। পরবর্তীকালে শব্দটির অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে এবং কুকুরের ক্ষিপ্ততা বা পাগলামি পশু ছাড়িয়ে ক্ষিপ্ত, পাগলা, হিতাহিতজ্ঞাশূন্য, বিকৃতমস্তিষ্ক প্রভৃতি নেতিবাচক বিশেষণকে নির্দেশ করে। তবে এখন হন্যে শব্দের ক্ষিপ্ততা বা পাগলামি আর নেই। এখন 'হন্যে' শব্দের অর্থ—প্রবল আগ্রহে কোনো কিছু খোঁজা। যেমন—সে হন্যে হয়ে তার হারানো ছেলেকে খুঁজছে। বেকার যুবকটি হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে। আসলে ছেলে হারালে এবং বেকার থাকলে ছেলে ও কাজ দুটোই খুঁজতে খুঁজতে ব্যক্তি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়।

হ য ব র ল

এটি একটি বহুল প্রচলিত বাগধারা। যার আভিধানিক অর্থ বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খলা, গোঁজামিল, অব্যবস্থা প্রভৃতি। বাংলায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত থাকে। যেমন—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ; ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি। শিশুদের যখন বর্ণপরিচয় শুরু হয়, তখন বর্ণগুলো শিশুরা শুধু মুখস্থ করেছে নাকি চিনে চিনে ভালোভাবে রপ্ত করেছে তা পরীক্ষা করার জন্য বর্ণগুলো পর পর না-দেখিয়ে এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলভাবে দেখানো হয়। এটাই ছিল বর্ণমালা পরিচয় পরীক্ষার রেওয়াজ। যেমন— 'য র ল ব শ হ' এ নির্ধারিত ক্রম ভেঙে হয়তো শিশুদের দেখানো হতে পরে 'হ য ব র ল'। বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার জন্য বর্ণসমূহের ক্রমবিন্যাসের চ্যুতি, গোঁজামিল বা বিশৃঙ্খলা থেকে 'হ য ব র ল' বাগধারাটির উৎপত্তি।

হরতাল

'হরতাল' গুজরাটি শব্দ। তবে বর্তমানে বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত। এর আভিধানিক বাংলা অর্থ—বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য যানবাহন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অফিস-আদালত প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখা। মহাত্মা গান্ধী প্রথম 'হরতাল' শব্দটি অহিংস আন্দোলন প্রকাশে ব্যবহার করেন। 'হরতাল' শব্দটি কিন্তু পুরোপুরি গুজরাটি নয়। ফারসি 'হর' ও গুজরাটি 'তালু' মিলে নতুন গুজরাটি শব্দ 'হরতাল' গঠিত। ফারসি 'হর' শব্দের অর্থ প্রত্যেক ও গুজরাটি 'তালু' শব্দের অর্থ তালা বা কুলুপ। প্রত্যেক দোকান বা প্রতিষ্ঠান বা যানবাহনে তালা দেওয়া হলো কিংবা বন্ধ করা হলো—এটিই ছিল গুজরাটি 'হরতাল' শব্দের আদি অর্থ। এখন শব্দটির অর্থের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে আচরণেরও। এটি ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে মানুষের চরিত্রের পাশব অংশের ন্যায়।

হরিচন্দন

স্বর্গের নন্দনকাননের পাঁচটি অমূল্য বৃক্ষের অন্যতম। এর কাঠ অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত।

হরিহর

বিষ্ণু ও শিবের নামের সমন্বয়। যারা এক দেবতারূপে পরিগণিত। 'হরিহর আত্মা' বাকভঙ্গিটি হরিহর অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের সমন্বয় থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে।

হস্তীবিভ্রাট

বাংলায় 'হস্তী' মানে 'হাতি' এবং 'বড় হস্তী' মানে 'বিরাট হাতি'। হিন্দিতে 'হস্তী' মানে অস্তিত্ব; তার থেকে অর্থ দাঁড়িয়েছে 'গণ্যমান্য ব্যক্তি'। একটি হিন্দি সংস্কৃতি সংস্থা খ্যাতিমান এক বাঙালি ব্যক্তিকে একটি সভায় সভাপতি পদে বরণ করেছিল। ঘোষক বললেন 'এক বড়ি হস্তী আজ হমারে বিচ মেঁ হাজির হৈঁ।' ঘোষকের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সভাপতি ও বাঙালি দর্শকগণ সভা-ত্যাগ করার জন্য উঠে দাঁড়ান। তাঁদের কথা একজন বিখ্যাত বাঙালিকে ডেকে অপমান করা হয়েছে, এটি কখনো মেনে নেওয়া যায় না। এ পর্যায়ে একজন হিন্দি-অভিজ্ঞ বাঙালি জোড়হাত করে বোঝালেন, 'বড়ি হস্তী' মানে—বড়মাপের এক জন গুণী।

হাজত

বিচারের পূর্বে আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আসামিকে আদালতে হাজির করার জন্য পুলিশের জিম্মায় রাখার স্থান। 'হাজত' আরবি শব্দ। এর আদি ও মূল অর্থ ছিল—প্রয়োজন, চাহিদা, প্রাপ্যতা প্রভৃতি। বাংলায় আসার পর শব্দটি তার মূল অর্থ হারিয়ে কেবল আদালতের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে আসামিদের রাখার স্থানে

সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলায় 'হাজত' শব্দটি এখন আরবির মতো আর সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয় না। এটি এখন আইনগত শব্দ। 'হাজত' শব্দটিকে সাধারণ মানুষ এখন আর চাহিদা মনে করে না। এটি একটি ভয়ঙ্কর স্থান।

হাত ও হাতি

বাংলায় হাত ও হাতি শব্দদ্বয় সংস্কৃত 'হস্ত' থেকে এসেছে। হস্ত শব্দের বাংলা—হাত। আবার এ 'হস্ত' থেকে প্রত্যয়যোগে 'হস্তী' শব্দ গঠিত হয়েছে। মূলত সংস্কৃত শব্দ হস্ত থেকে বাংলা 'হাত, হস্ত' ও 'হাতি, হস্তী' শব্দের উৎপত্তি। হস্ত শব্দের বাংলা রূপান্তর হাত (hand)। এ 'হস্ত' থেকে প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়েছে হস্তী (elephant)। হস্তী শব্দের অর্থ হস্তযুক্ত বা যার হাত রয়েছে। ব্যাকরণের এ সূত্র মানতে গেলে মানুষেরই 'হস্তী' নাম হওয়া উচিত ছিল। কারণ মানুষই কেবল উত্তম হস্ত-সমৃদ্ধ প্রাণী। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির সেরা প্রাণীর উপাধিটা আরও ভালোভাবে প্রকাশের জন্য খুব ভেবেচিন্তে 'হস্তী' হয়নি। বিশাল পশু ঐরাবতকে 'হস্তী' বানিয়ে সে নিজে মানুষ থেকে গেছে। মানুষ হয়তো হাতির শুঁড়ের অসাধারণ কলাকৌশল দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। এ জন্য সে নিজেদের হস্তটি হাতির মাথায় তুলে দেয়। হস্ত তুলে দিলেও কিন্তু নামটি হস্তী ধারণ করেনি, মানুষ রেখে দিয়েছে। প্রাণিকুলে একমাত্র হস্তীরই দেহের সম্মুখাংশে শুঁড় নামের একটি সঞ্চরণশীল অঙ্গ রয়েছে। এটি অনেকটা মানুষের হাতের মতো কাজ করে। এ সুযোগে মানুষ নিজে হস্তী না হয়ে ঐরাবতকে হস্তী বানিয়ে ছেড়ে দেয়।

হাতের পাঁচ

'হাতের পাঁচ' বাগভঙ্গিটির আভিধানিক অর্থ—শেষ সম্বল, একমাত্র উপায়। তাসখেলা থেকে 'হাতের পাঁচ' বাগধারাটির উৎপত্তি। বিন্তি খেলায় যে শেষ পিঠ পায় তার প্রাপ্য পাঁচ হচ্ছে 'হাতের পাঁচ'। এ অনুষঙ্গ থেকে 'হাতের পাঁচ'কে বলা হয় শেষ সম্বল। কারণ এর পর আর কোনো উপায় থাকে না।

হাবভাব

'হাবভাব' শব্দের বর্তমান আভিধানিক অর্থ হলো—চালচলন, ছলাকলা, আকার-ইঙ্গিত প্রভৃতি। 'হাব' ও 'ভাব' এ দুটো পৃথক শব্দের মিলনে 'হাবভাব' শব্দটির সৃষ্টি। তবে 'হাব' পৃথক শব্দ হলেও 'ভাব' এর সঙ্গ ছাড়া এর ব্যবহার লেখা বা মুখের ভাষায় একেবারেই নেই। বলা যায়—'ভাব' ছাড়া 'হাব' অর্থহীন। 'হাব' শব্দের অর্থ নারীর মনোহর লাস্য বা বিলাসভঙ্গি। অন্যদিকে 'ভাব' শব্দের অর্থ হলো অভিপ্রায়, অবস্থা, চিন্তা, মানসিক অনুভব, ধরন, প্রণয় প্রভৃতি। 'হাব' ও 'ভাব' জোড়া লাগার পর প্রাথমিক পর্যায়ে 'হাবভাব' শব্দটি কেবল নারীদের বেলায় ব্যবহার করা হতো। তখন শব্দটির মধ্যে ছিল রোমাঞ্চ, যদিও তা কিছুটা কামস্বভাবের বা কিছুটা অশালীন, তবে ফুরফুরে। বর্তমানে 'হাবভাব' সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ শব্দ। এটি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, প্রাণীদের বেলাতেও ব্যবহৃত হয়। হাবভাব এখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপক অর্থ প্রকাশে ব্যবহার করা হয়। যেমন—দেশের রাজনীতির হাবভাব ভালো মনে হচ্ছে না। রোগীর হাবভাব দেখে মনে হয় সময় ঘনিয়ে আসছে। কুকুরটির হাবভাব বেশ আক্রমণাত্মক।

হাবুডুবু

'হাবুডুবু' শব্দের অর্থ—একান্ত বিহ্বল, নিমজ্জিত প্রায়, অস্থিরভাবে মগ্ন প্রভৃতি। হাঁপ ও ডুব শব্দের মিলনে গঠিত হয় হাঁপডুব। শব্দটি ক্রমান্বয়ে হাবুডুবু বাগভঙ্গিতে এসে স্থিত হয়েছে। গঠনানুসারে শব্দটির মূল ও আদি অর্থ ছিল—পানিতে বারবার ডোবা ও ভাসার কারণে শ্বাসকষ্ট। সাঁতার না-জানলে কেউ পানিতে পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার পূর্বে ভেসে ওঠার এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেটি 'হাবুডুবু'। হাবুডুবু খাওয়া মানুষ বাঁচার

জন্য একাগ্রচিত্তে প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। তবে বর্তমান বাংলা বাগভঙ্গির হাবুডুবু কেবল ডুবন্ত মানুষের বেলায় প্রযোজ্য নয়। মানুষ জীবনের নানা ক্ষেত্রে বহু সমস্যায় নিপতিত থাকে। সমস্যাহীন কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাই মানুষকে প্রতিনিয়ত জীবনসংগ্রামের মহাঢেউয়ে হাবুডুবু খেতে হয়।
প্রয়োগ কিছুদিন আগেও তার দুটি কারখানা ছিল। আগুন লেগে দুটোই এখন ছাইভস্ম। ঋণের বোঝায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত তোরাব সাহেবের সংসার চালাতে এখন হাবুডুবু অবস্থা। এ হাবুডুবু জলে না-হলেও তার কষ্ট জলে ডুবে যাওয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

হাম ছোড়া লেকিন কমলি তো নেহি ছোড়তা

হিন্দি হলেও প্রবাদটি বাংলা ভাষায়ও প্রচলিত। 'বিরক্তিকর বিষয় ত্যাগ করলেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়'— এমন অর্থ প্রকাশে প্রবাদটি প্রচলিত। একটি গল্প থেকে প্রবাদটির জন্ম। দুই বন্ধু নদীর তীরে বসে গল্প করছিল। এ সময় জলে একটা ভাল্লুক ভেসে আসে। এক বন্ধু কম্বল মনে করে নদীতে নেমে ভাল্লুকটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। তীরের বন্ধু নদীর জলে ভাসমান বন্ধুর ভুল বুঝতে পেরে ডাক দিয়ে বলল কমলি (কম্বল) ছেড়ে নদী থেকে তীরে চলে আস। উত্তরে জলের বন্ধু বলল হাম ছোড়া লেকিন কমলি তো নেহি ছোড়তা। অর্থাৎ আমি তো কমলি ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু কমলি তো আমাকে ছাড়ছে না।

হারিকেন

'হারিকেন' আমাদের অনেকের পরিচিত একপ্রকার বাতি বা দীপাধার। কাচের ঘেরাটোপ দেওয়া বিশেষ ধরনের এ দীপাধারটি বিদ্যুৎবিহীন এলাকায় এখনও বেশ জনপ্রিয়। এছাড়া আর এক হ্যারিকেন (Hurricane) আছে, যা প্রবল-ঘূর্ণিঝড় হিসাবে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর এটি উপকূলীয় এলাকায় কম-বেশি আঘাত হানে। মূলত প্রবল ঘূর্ণিঝড় নামে পরিচিত 'হারিকেন' হতে আমাদের দীপাধার 'হারিকেন' নামের উৎপত্তি। কিন্তু কেন? কাচের ঘেরাটোপে ঘেরা থাকে বলে Hurricane তথা প্রবল ঘূর্ণিঝড়েও 'হারিকেন' নামে পরিচিত দীপাধারের আলো সহজে নেভে না। তাই এ বাতি বা দীপাধারটির নাম হয়ে যায় হারিকেন। এ নাম যিনিই দিয়ে থাকুন না কেন, তিনি যে বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হালছাড়া

চেষ্টা-পরিত্যাগ, সংকল্পে-শিথিলতা, কাজকর্মে-অনীহা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে 'হালছাড়া' শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। নৌকার হাল থেকে 'হালছাড়া' শব্দটির উৎপত্তি। হাল ধরে, হাল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মাঝি নদীর জলে নৌকাকে নিজের ইচ্ছেমতো পরিচালনা করে। নৌকার গতিপথ নিয়ন্ত্রণের একমাত্র মাধ্যম হাল। হাল চালনা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে নৌকা গতিপথ হারিয়ে ফেলে। তখন মহা বিপত্তি ঘটে। জলে নৌকার হালের এ কার্যক্রমই বাংলায় 'হালছাড়া' বাগভঙ্গিতে ওঠে এসেছে। মানুষ যখন জীবনযুদ্ধের হাল ছেড়ে দেয় তখন সংসার-জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। তবে মানুষ কি সহজে হাল ছাড়ে? নানা কারণে বাধ্য হয় হাল ছেড়ে দিত।

হুজুর

বাংলায় 'হুজুর' একটি সম্মানসূচক সম্বোধন। এর আভিধানিক অর্থ—সম্মানিত ব্যক্তি, মনিব, প্রভু ইত্যাদি। হুজুর 'আরবি' শব্দ। শব্দটির সঙ্গে আরবি 'হাজির' শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আরবি ভাষায় 'হাজির' অর্থ 'উপস্থিত' এবং হুজুর অর্থ 'উপস্থিতি'। আরবি 'হাজির' ও বাংলা 'হাজির' অভিন্ন অর্থ বহন করলেও আরবি 'হুজুর' আর বাংলা 'হুজুর' অভিন্ন অর্থ বহন করে না। বাংলায় এসে আরবি 'হুজুর' তার মূল অর্থ সম্পূর্ণ হারিয়ে নতুন অর্থ ধারণ করে। যার ডাকে হাজির হওয়া বাধ্যতামূলক তিনি 'হুজুর'— এভাবে হয়তো আরবি

‘হুজুর’ বাংলায় এসে অর্থের পরিবর্তন করে নিয়েছে।

হুলিয়া

হুলিয়া হলো কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য চেহারার বিবরণ বা ছবিসহ বিজ্ঞাপন। ‘হুলিয়া’ বাংলা শব্দ নয়। এটি আরবি ভাষা হতে ফারসি ভাষা হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বাংলায় এসেছে। আরবি ভাষায় ‘হুলিয়া’ শব্দের অর্থ হলো মানুষের বাহ্যিক ও চেহারার বিবরণ। ইসলাম ধর্মে মানুষের ছবি আঁকা একসময় নিষিদ্ধ ছিল বলে যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে মানুষের হুলিয়া লেখা হতো। এ লেখা এত নিখুঁত ছিল যে, বিবরণ পড়লে মানুষের পূর্ণ অবয়ব ভেসে উঠত। হুলিয়া পড়লে সহজে বোঝা যেত কার কথা বলা হচ্ছে এবং যার কথা বলা হচ্ছে সে কে এবং কেমন। বাংলা ভাষায় ‘হুলিয়া’ শব্দটি সাধারণ কোনো শব্দ নয়। এটি মূলত আদালতের কাজকর্মে পলাতক আসামিকে গ্রেফতারের সুবিধার জন্য জারি করা হয়। ‘হুলিয়া জারি’র মাধ্যমে আসামিকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

হৃদ্রোগবৈরী

অর্জুনবৃক্ষকে বলা হতো হৃদরোগবোইরি বা হৃদ্রোগবৈরী। অর্জুনবৃক্ষের ছাল হৃদ্রোগ নিবারণের কাজ করে। তাই এর অপর নাম হৃদ্রোগবৈরী। যা হৃদরোগের বৈরী বা যা হৃদরোগকে তাড়িয়ে দেয় বা হরণ করে সেটাই হৃদ্রোগবৈরী। হৃদ + রোগ + বৈরী = হৃদ্রোগবৈরী।

হৃষ্টপুষ্ট

‘হৃষ্টপুষ্ট’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ—মোটাসোটা, নাদুসনুদুস, গোলগাল, সুন্দর প্রভৃতি। ‘হৃষ্ট’ ও ‘পুষ্ট’ শব্দদ্বয়ের মিলনে ‘হৃষ্টপুষ্ট’ শব্দের উৎপত্তি। হৃষ্ট শব্দের অর্থ—হর্ষোৎফুল্ল, প্রফুল্ল, প্রীত, মনোরম প্রভৃতি। পুষ্ট শব্দের অর্থ—নিটোল, পরিপক্ব, পরিণত, পাকা প্রভৃতি। সুতরাং ‘হৃষ্টপুষ্ট’ শব্দের আদি গঠনগত অর্থ হলো হাসিখুশি ও নিটোল। তবে বর্তমানে এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার নেই। মূলত নাদুসনুদুস ও গোলগাল ব্যক্তি বা পশু বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মানুষ হোক বা পশু হোক তা যদি মোটাসোটা ও সুন্দর দেখায় সেটাকে ‘হৃষ্টপুষ্ট’ বলে। কোরবানির হাটে কোরবানির পশুর ক্ষেত্রে শব্দটি বেশ মজার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়। গৃহপালিত পশুর মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের নাম ‘হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প’ হলে নামটি নিঃসন্দেহে আরও কাব্যিক হতো।

হেয়

‘হেয়’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—নীচ, ঘৃণ্য, অবেহিলত, তুচ্ছ, অবজ্ঞাযোগ্য প্রভৃতি। ‘হেয়’ সংস্কৃত শব্দ। এর মূল অর্থ—ত্যাগের যোগ্য, পরিহারযোগ্য, প্রত্যাখ্যানের যোগ্য, অবহেলার যোগ্য বা অপাঙক্তেয়। সংস্কৃত ভাষায় যে হেয় পরিহারযোগ্য সেটিই বাংলায় নীচ বা ঘৃণ্য। যে ব্যক্তি, বস্তু বা প্রতিষ্ঠান পরিহারযোগ্য বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য সেটিই বাংলা ভাষায় নীচ, ঘৃণ্য, অবহেলিত, তুচ্ছ বা অবজ্ঞার যোগ্য হিসেবে চিহ্নিত।

হেস্তনেস্ত

‘হেস্তনেস্ত’ শব্দের আভিধানিক অর্থ—চরম বোঝাপড়া, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, এস্পারওস্পার প্রভৃতি। ফারসি ‘হস্ত ওয় নিস্ত’ বাগভঙ্গি থেকে বাংলা শব্দ ‘হেস্তনেস্ত’-এর উৎপত্তি। ‘হস্ত ওয় নিস্ত’ বাগভঙ্গির অর্থ ‘আছে বা নেই’ > থাকা বা না-থাকা > যা হোক একটা কিন্তু। ফারসি ভাষায় শব্দটি ছিল অনিশ্চয়তাজ্ঞাপক কিন্তু বাংলায় এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তজ্ঞাপক।

হোতা

হোতা শব্দের অর্থ—নায়ক, নেতা, মূল ব্যক্তি প্রভৃতি। তবে এটি সাধারণত নেতিবাচক অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন—সব গণ্ডগোলের হোতা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। সংস্কৃত হতে আগত শব্দটির মূল ও প্রাচীন অর্থ ছিল—পুরোহিত কিংবা যজ্ঞকর্তা। সেকালে বস্তুত পুরোহিতই ছিলেন যজ্ঞকর্মের মূল রূপকার। পুরোহিতের আদেশ-নির্দেশ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যজ্ঞকর্ম পরিচালিত হতো। বাঙালিরা সে যজ্ঞকর্মের পুরোহিতকে অপকর্মের পুরোহিত হিসেবে বাংলায় নিয়ে এসেছে। এখন বাংলায় সকল অপকর্মের নায়ককে 'হোতা' বলে প্রকাশ না-করলে যেন বাক্যের মজাই থাকে না।

হ্যাংলা

হীন-লোভী, হীনভাবে লোভ প্রকাশকারী, লঘুচিত্ত, নিচুমনের অধিকারী, ব্যক্তিত্বহীন প্রভৃতি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এটি একটি দেশীয় শব্দ। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে কুকুরকে হেঙ্গল, হ্যাঙ্গল, হেঙ্গুল প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। মানুষ মনে করে, হীনভাবে ও লঘুচিত্তে লোভ প্রকাশ হেঙ্গলের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হেঙ্গলের এ চরিত্রকে বলা হয় হ্যাংলা স্বভাব। বস্তুত এ হ্যাংলা স্বভাব হতে 'হ্যাংলা' শব্দের উৎপত্তি। আঞ্চলিক ভাষায় শব্দটির বহুল প্রচলন দেখা গেলেও সাহিত্যকর্মেও শব্দটির প্রচলন কম নয়। আসলে কিছু কিছু বিষয় আছে যা জুতসই কিছু নির্দিষ্ট শব্দ ছাড়া পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। 'হ্যাংলা' তেমন একটি শব্দ। এর দ্বারা কোনো ব্যক্তির শুধু ব্যক্তিত্বহীনতাই বোঝায় না, সঙ্গে তার লোভী মন-মানসিকতার উদগ্র প্রকাশ ও অস্থির আচরণকেও নির্দেশ করে। তাই 'হ্যাংলা' শব্দটি দ্বারা যা প্রকাশ করা সম্ভব তা অন্য কোনো বাক্য দিয়ে পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সন্তোষজনকভাবে সম্ভব না-ও হতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বাল্মীকি রামায়ণ, রাজশেখর বসু অনূদিত, নবযুগ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৪।
৩. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালা ভাষা প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা এজেন্সিস লিমিটেড, কলিকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।
৪. সুভাষ ভট্টাচার্য, বাংলা লেখক ও সম্পাদকের অভিধান, আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহারবিধি গ্রন্থমালা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৯৭।
৫. হায়াৎ মামুদ, বাঙালির বাংলা ভাষা ইদানীং, চারুলিপি প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, জুলাই ২০০৯।
৬. হায়াৎ মামুদ ও ড. মোহাম্মদ আমীন, শুদ্ধ বানান চর্চা, শুবাচ ফাউন্ডেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, জুন ২০১৫।
৭. রবিশঙ্কর মৈত্রী, বিদেশী বাংলা শব্দের অভিধান, অনুপম প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯।
৮. ড. মোহাম্মদ আমীন, বাংলা সাহিত্যের অ আ ক খ, জাগৃতি প্রকাশনী, ৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।
৯. ড. মোহাম্মদ আমীন, হাসতে হাসতে বাংলা শেখা, আগামী প্রকাশনী, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা, জুন ২০০৬।
১০. ড. মোহাম্মদ আমীন, রঙ্গরসে বাংলা বানান, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৫।
১১. ড. মোহাম্মদ আমীন, বাংলা বানান ও শব্দচয়ন, জাগৃতি প্রকাশনী, ৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
১২. সুদেষ্ণা বসাক, বাংলার প্রবাদ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০৮।
১৩. দিলীপ দেবনাথ, শব্দচিন্তা চমৎকারা, দিব্যপ্রকাশ, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, নভেম্বর ২০১১।
১৪. ফরহাদ খান, বাংলা শব্দের উৎস অভিধান, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১২।
১৫. পি আচার্য, বাংলা বানান চিন্তা, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, ৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, ১৯৯৬।
১৬. জ্যোতিভূষণ চাকী, বাগর্থকৌতুকী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২।
১৭. জ্যোতিভূষণ চাকী, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৩।
১৮. হাকিম আরিফ, নজরুল-শব্দপঞ্জি, নজরুল ইনস্টিটিউট, কবিভবন, ধানমন্ডি, ঢাকা, জুন ১৯৯৭।
১৯. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষ, প্রথম খণ্ড, ভাষাবিন্যাস, কলকাতা, চৈত্র ১৪১৭।
২০. কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ভাষাবিন্যাস, কলকাতা, চৈত্র ১৪১৭।
২১. বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৪।
২২. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক, বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০০।
২৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খণ্ড। অ-ন, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১১।
২৪. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড। প-হ, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ ২০১১।

২৫. অশোক মুখোপাধ্যায়, সংসদ ব্যাকরণ অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৫।
২৬. সুবলচন্দ্র মিত্র, সরল ছাত্রবোধ অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লি. কলকাতা, দশম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬।
২৭. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, যথাশব্দ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৪।
২৮. সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, বৈশাখ ১৪১৬।
২৯. সুধীরচন্দ্র সরকার, বিবিধার্থ অভিধান, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কো. প্রাইভেট লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৮৮৪ শকাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।
৩০. রাজশেখর বসু (সংকলিত), চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি., কলিকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ : পুনর্মুদ্রণ ১৪০৩।
৩১. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্দসঞ্চয়িতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রা. লিমিটেড, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।
৩২. কলিম খান, দিশা থেকে বিদিশায় 'যোজনগন্ধবিকার 'সিস্টেম ডিজাইনিং'-এর একটি সমস্যা।